www.Educationblog24.Com

লাল-সবুজে দাগানো

TEXT BOOK

প্রাণিবিজ্ঞান

উন্মেষ

মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল এডমিশন কেয়ার

www.Educationblog24.Com

১ প্রাণীর বিভিন্নতা ও শ্রেণিবিন্যাস
Animal Diversity & Classification

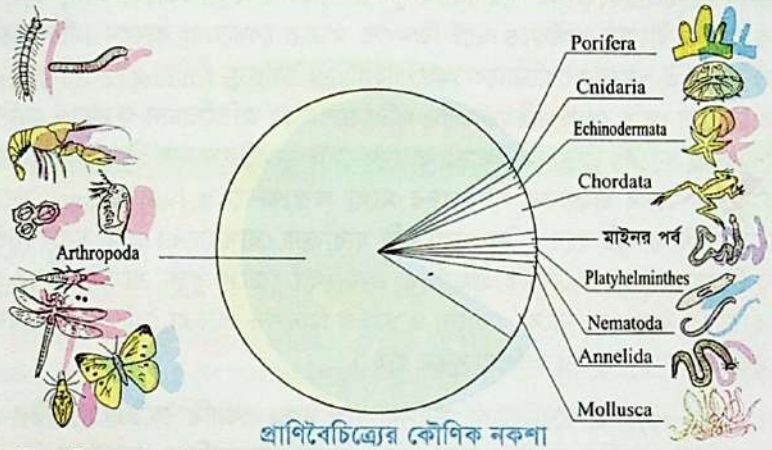

প্রাণিবৈচিত্র্যের কৌণিক নকশা

প্রধান শব্দাবলি (Key words)
- প্রাণিবৈচিত্র্য
- শ্রেণিবিন্যাস
- ট্যাক্সন
- প্রজাতি
- প্রতিসম
- হিমোসিল
- ননকর্ডাটা
- কর্ডাটা

জীববিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত ২,৭০,০০০ ভাস্কুলার উদ্ভিদ এবং ১৫ লক্ষেরও বেশি প্রাণী-প্রজাতি শনাক্ত করেছেন। এসব প্রজাতির মধ্যে নানা কারণে ভিন্নতা দেখা যায়। ভিন্নতা সত্ত্বেও সহজভাবে অধ্যয়নের জন্য প্রাণিবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী এদের শ্রেণিবিন্যস্ত করেছেন। এ অধ্যায়ে প্রাণীর বিভিন্নতা ও শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

পিরিয়ড সংখ্যা–৭ : এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে (শিখনফল)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. প্রাণিজগতের বিভিন্নতা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. প্রাণীকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করার ভিত্তি ও নীতি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. বিভিন্ন ধরনের প্রাণীকে শ্রেণিতে বিন্যস্ত করার প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৪. নন-কর্ডাটা প্রাণীকে পর্ব (Phylum) পর্যন্ত বিন্যস্ত করতে পারবে। ৫. কর্ডাটা প্রাণীকে শ্রেণি (Class) পর্যন্ত বিন্যস্ত করতে পারবে। ৬. **ব্যবহারিক–** বিভিন্ন প্রাণী শনাক্ত ও চিত্র অংকন করতে পারবে।	● প্রাণিজগতের ○ বিভিন্নতা ○ শ্রেণিকরণের ভিত্তি ও নীতি ● নন-কর্ডাটা (প্রধান পর্ব পর্যন্ত শ্রেণিবিন্যাস) ● কর্ডাটা (শ্রেণি পর্যন্ত বিন্যাস) ● ব্যবহারিক ○ নন-কর্ডাটার বিভিন্ন পর্বের (যেকোনো পাঁচটি) এবং ভার্টিব্রাটার বিভিন্ন শ্রেণির (যেকোনো পাঁচটি) নমুনা পর্যবেক্ষণ।

প্রাণীর বিভিন্নতা বা প্রাণিবৈচিত্র্য (Animal Diversity)

পৃথিবীর সমস্ত জলচর, স্থলচর ও খেচর প্রাণীর মধ্যে যে জিনগত, প্রজাতিগত ও বাস্তুসংস্থানগত বিভিন্নতা দেখা যায় সেটিই হচ্ছে প্রাণীর বিভিন্নতা বা **প্রাণিবৈচিত্র্য**। দেহের গঠন, বসতি নির্বাচন প্রভৃতি থেকে শুরু করে চলন, খাদ্যগ্রহণ, প্রজনন, পরিযান (migration) সহ আরও অনেক বিষয়ে প্রাণিদের বৈচিত্র্য সুস্পষ্ট। প্রত্যেক প্রাণী নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে মন্ডিত হয়ে অন্য প্রাণী থেকে ভিন্ন। পৃথিবীর বিচিত্র পরিবেশে দৃশ্য ও অদৃশ্যমান অসংখ্য প্রাণীর বিচরণ রয়েছে। কেউ দল বেঁধে অতল সমুদ্রে, মাঝ সমুদ্রে বা সমুদ্রপৃষ্ঠে সাঁতার কেটে চলছে, কেউ দ্রুত, কেউ-বা মন্থর লয়ে মাটির উপর হেঁটে বেড়াচ্ছে, কোনো প্রাণী হয়তো গাছের ডালে দোল খাচ্ছে, কেউ ঝাঁকে ঝাঁকে পরিযায়ী হচ্ছে, আবার কেউ এত ছোট যে অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্য ছাড়া দেখাই যায় না। এদের কেউ তৃণভোজী, অন্যরা মাংসাশী বা সর্বভোজী কিংবা পরজীবী।

প্রাণিবৈচিত্র্যের প্রকারভেদ

প্রাণিবৈচিত্র্য তিন প্রকার : ১. জিনগত বৈচিত্র্য, ২. প্রজাতি বৈচিত্র্য এবং ৩. বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য।

১. জিনগত বৈচিত্র্য (Genetic diversity) : জিনগত বৈচিত্র্য বলতে নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে কোনো নির্দিষ্ট প্রজাতির

www.Educationblog24.Com

সদস্যদের মধ্যে জিনগত উপাদানে বৈষম্যের মাত্রাকে বোঝায়। একটি জীব-প্রজাতির প্রত্যেক সদস্য জিনগতভাবে অন্য সদস্য থেকে পৃথক। জিনগত সাধারণ গঠন বা **কোড** (code)-এর কারণে একটি প্রজাতির প্রত্যেক সদস্যের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকে। জীবদেহে অবস্থিত জিনগুলোর মধ্যে সীমাহীন সম্মিলনের ফলে জিনগত বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। এ কারণে সকল মানুষ *Homo sapiens* নামক প্রজাতির সদস্য হলেও একজন আফ্রিকান **কৃষ্ণাঙ্গ** ও অস্ট্রেলিয়ান **শ্বেতাঙ্গ** মানুষ দেহের আকৃতি, গায়ের ও চুলের রং ইত্যাদিতে পরস্পর থেকে সুস্পষ্ট পৃথক। অনুরূপভাবে, আম, ধান, আপেল, গম ইত্যাদির আকার, স্বাদ, ফুলের বর্ণ ও বীজের পার্থক্যও ঘটে জিনগত মাত্রায় বৈষম্যের কারণে। জিনগত বৈচিত্র্য নির্দিষ্ট এক প্রজাতির সদস্যভিত্তিক হওয়ায় এ ধরনের বৈচিত্র্যকে **অন্তঃপ্রজাতিক বৈচিত্র্য** (intraspecific diversity)-ও বলা হয়। কোনো প্রজাতির জিনগত বৈচিত্র্য বেশি হলে পরিবর্তনশীল পরিবেশে তার অভিযোজন ক্ষমতাও বেশি থাকে। কোনো প্রজাতির সকল সদস্যের যদি একই ধরনের জিন বেশি থাকে তাহলে সেই প্রজাতিকে কম জিনগত বৈচিত্র্যসম্পন্ন (low genetic diversity) প্রজাতি বলে। এসব প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে **অন্তঃজননের** (inbreeding) ফলে একই ধরনের কম জিনগত বৈচিত্র্যসম্পন্ন জনসংখ্যার সৃষ্টি হবে। জিনগুলো যদি মারাত্মক রোগব্যাধির প্রতি সংবেদনশীল হয়ে থাকে তাহলে বংশপরম্পরায় এসব জিনের সঞ্চারণে নির্দিষ্ট প্রজাতির জনসংখ্যা রোগে ভুগে সামগ্রিকভাবে প্রজাতির অস্তিত্ব সংকট বাড়িয়ে তুলবে। এ কারণেই বলা হয়ে থাকে, কোনো প্রজাতির জিনগত বৈচিত্র্য বেশি হলে পরিবর্তনশীল পরিবেশে তার অভিযোজন ক্ষমতা বেশি থাকে, বিলুপ্তির আশঙ্কা কমে যায়।

২. প্রজাতি বৈচিত্র্য (Species diversity) : জীববৈচিত্র্যের মৌলিক ধাপ হচ্ছে প্রজাতি বৈচিত্র্য। বিভিন্ন প্রজাতির সংখ্যা যা একটি নির্দিষ্ট সময়ে ও অঞ্চলে একসঙ্গে বসবাস করে এবং একটি **বাস্তুতান্ত্রিক সম্প্রদায়** (ecological community) গড়ে তোলে তাকে **প্রজাতি বৈচিত্র্য** বলে। প্রজাতি বৈচিত্র্যে ভাইরাসসহ পৃথিবীর সকল প্রজাতির জীব অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর সবখানে একই ধরনের জীব বাস করে না বরং কিছু অঞ্চলে নির্দিষ্ট প্রজাতির জনগোষ্ঠী (population) অন্যান্য জনগোষ্ঠী অপেক্ষা বেশি দেখা যায়। যেসব অঞ্চল পুষ্টি এবং আবহাওয়াগত উপাদানসমৃদ্ধ (যেমন মাঝারি তাপমাত্রা, পর্যাপ্ত আলো ও বৃষ্টিপাত ইত্যাদি) সেসব অঞ্চলে জীববৈচিত্র্যের সমাহার থাকে অনেক বেশি। এ কারণে মরু ও মেরু অঞ্চলের চেয়ে গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলে জীববৈচিত্র্যের মাত্রা বেশি। যে অঞ্চলে প্রজাতি বৈচিত্র্য বেশি সে অঞ্চল সাধারণভাবে **জীববৈচিত্র্যের হটস্পট** (biodiversity hotspot) হিসেবে পরিচিত।

৩. বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য (Ecosystem diversity) : বাস্তুতন্ত্র হচ্ছে একটি জীবসম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রজাতি ও তাদের অজীবীয় ভৌত পরিবেশের মিথস্ক্রিয়ায় গড়ে উঠা টেকসই পরিবেশ। প্রত্যেক বাস্তুতন্ত্র শক্তি ও পুষ্টি প্রবাহের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে। কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে এক বা একাধিক বাস্তুতন্ত্র থাকতে পারে। অতএব, **বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য বলতে বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রে শক্তিপ্রবাহ ও পুষ্টিচক্রের মাধ্যমে সংযুক্ত বিভিন্ন জীবসম্প্রদায়ভুক্ত প্রজাতির মধ্যে ভিন্নতাকে (জিনগত ও প্রজাতি বৈচিত্র্য) বোঝায়**। পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের বাস্তুতন্ত্র রয়েছে, যেমন–তৃণভূমি, বনভূমি, মরুভূমি, জলাভূমি ইত্যাদি। প্রত্যেক বাস্তুতন্ত্রে রয়েছে নির্দিষ্ট ধরনের উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীবের সমাবেশ। স্থানীয় বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন প্রজাতির উপস্থিতি এবং এদের মধ্যে গতিশীল মিথস্ক্রিয়ার এক জটিল নেটওয়ার্কের প্রতিনিধিত্ব করে বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য। এভাবে লক্ষ বছর ধরে একেকটি বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন প্রজাতির পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে গড়ে উঠে বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য।

গ্রিক দার্শনিক **অ্যারিস্টটল** (Aristotle, খৃষ্টপূর্ব ৩৮৪–৩২২) সর্বপ্রথম প্রাণিদের এ ভিন্নতাকে লক্ষ করে প্রাণিবিদ্যাকে বিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন। এ জন্য তাঁকে **'প্রাণিবিদ্যার জনক'** বলা হয়। তিনিই প্রথম প্রাণীর বৈশিষ্ট্যগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিবেচনা করে প্রাণিকূলকে শ্রেণিবিন্যস্ত করতে উদ্যোগী হন। যেমন: তিনি লাল রক্তযুক্ত মেরুদণ্ডী প্রাণিদের Enaima ও লাল রক্তবিহীন অমেরুদণ্ডী প্রাণিদের Anaima নামে দুটি দলে ভাগ করেন। পরবর্তীতে Enaima-কে প্রজনন প্রক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে ডিম্বজ (যারা ডিম পাড়ে, যেমন: মাছ, উভচর, সরীসৃপ ও পাখি) এবং জরায়ুজ (যারা সন্তান প্রসব করে, যেমন: স্তন্যপায়ী) এ রকম দুটি দলে ভাগ করা হয়। আবার অমেরুদণ্ডী Anaima দলভুক্ত প্রাণিদেরকেও কোষের সংখ্যা, বাহ্যিক আকার, সিলোম ও পরিপাকতন্ত্রের উপস্থিতিসহ আরো নানান বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করা হয়। প্রথম দিকে প্রাণীর এ ভিন্নতাকে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে দেখা হলেও পরবর্তীতে আরো নানা বিষয়, যেমন–প্রাণীর বাসস্থান, জিনতত্ত্ব, কোষ ও টিস্যুতন্ত্র, ভ্রূণতত্ত্ব, অভ্যন্তরীণ অঙ্গসংস্থান ইত্যাদিও প্রাণীর ভিন্নতার কারণ হিসেবে পরিগণিত হয়।

www.Educationblog24.Com

প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি (Basis of Animal Classification)

প্রত্যেক প্রাণীরই নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ থাকে। এসব বৈশিষ্ট্য আকার, গঠন, দৈহিক প্রতিসাম্য, দেহের খণ্ডকায়ন, দেহগহ্বর, লিঙ্গ, জীবনচক্র প্রভৃতির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনে প্রাণিদেহের এসব বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দেয়া হয়। প্রাণী শ্রেণিবিন্যাসের প্রধান ভিত্তিগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো–

১. দেহের আকার (Body shape)

ক. **আণুবীক্ষণিক প্রাণী** (Micro-animal): এসব প্রাণী এত ক্ষুদ্র যে অণুবীক্ষণযন্ত্র ছাড়া এদের দেখা যায় না। যেমন– মাছের ফুলকার প্রোটিস্টান জীবাণু *Trichodina anabasi*।

খ. **বৃহত্তর প্রাণী** (Macro-animal) : এসব প্রাণী আকারে বড় এবং খালি চোখে ভালোভাবে দেখা যায়। যেমন– *Cavia porcellus* (গিনিপিগ)।

২. সংগঠন ক্রমমাত্রা (Grades of organization)

প্রাণীর কোষীয় সংগঠন ক্রমমাত্রার উপর ভিত্তি করে প্রাণিজগতকে চার ধরনের প্রাণিগোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়–

ক. **কোষীয় মাত্রার গঠন** (Cellular grade of organization): যে দেহগঠনে কিছু কোষ সম্মিলিত হয়ে নির্দিষ্ট কাজের জন্য বিশেষিত হয় সে ধরনের দেহগঠনকে কোষীয় মাত্রার গঠন বলে। এক্ষেত্রে এক ধরনের শ্রম বিভাজন দেখা যায়, যেমন কিছু কোষ জনন কাজে, অন্য কোষগুলো পুষ্টি সংক্রান্ত কাজে ব্যস্ত থাকে। Porifera পর্বভুক্ত প্রাণী এ ধরনের গঠন সম্বলিত সদস্য।

খ. **কোষ-টিস্যু মাত্রার গঠন** (Cell-tissue grade of organization) : সদৃশ কোষগুলো যখন একটি অভিন্ন কাজ সম্পন্নের জন্য সুনির্দিষ্ট প্যাটার্ণ বা স্তরে গোষ্ঠীবদ্ধ বিন্যস্ত হয়ে টিস্যু নির্মাণ করে সে ধরনের গড়নকে কোষ-টিস্যু মাত্রার গঠন বলে। Cnidaria পর্বভুক্ত প্রাণীতে এধরনের গঠন মাত্রা দেখা যায়।

গ. **টিস্যু-অঙ্গ মাত্রার গঠন** (Tissue-organ grade of organization): স্বাচ্ছন্দ্য জীবন যাপনের জন্য যখন একাধিক টিস্যু-নির্মিত বিভিন্ন অঙ্গের সমাহার ঘটে তখন সেই গঠনকে টিস্যু-অঙ্গ মাত্রার গঠন বলে। Platyhelminthes পর্বভুক্ত প্রাণিদেহে এ গঠন মাত্রা সর্বপ্রথম আবির্ভূত হয়েছে। এক্ষেত্রে চক্ষুবিন্দু, প্রোবোসিস, জননাঙ্গ ইত্যাদি টিস্যু-অঙ্গ মাত্রার গঠনের উদাহরণ।

ঘ. **অঙ্গ-তন্ত্র মাত্রার গঠন** (Organ-system grade of organization) : উচ্চতর প্রাণিগোষ্ঠীতে এ ধরনের গঠন দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে অঙ্গগুলো একত্রে কিছু কাজ সম্পাদনের জন্য অঙ্গ-তন্ত্র (organ system) সৃষ্টির মাধ্যমে দেহকে সর্বোচ্চ মাত্রার গঠনে উন্নত করেছে। তন্ত্রগুলো (systems) দেহে শ্বসন, সংবহন, পরিপাক প্রভৃতি মৌলিক কাজের সঙ্গে জড়িত থাকে। অধিকাংশ পর্বে (Phyla) এ ধরনের গঠন মাত্রা দেখা যায়। এ মাত্রার গঠন সর্বপ্রথম আবির্ভূত হয়েছে নিমারটিয়ান (Nemartean) নামক এক সামুদ্রিক প্রাণিগোষ্ঠীতে।

৩. জীবন পদ্ধতি (Way of living)

জীবন পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে প্রাণিকূলকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়–

ক. **মুক্তজীবী** (Free living) : এসব প্রাণী স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায় এবং এরা পারস্পরিক সহযোগিতা বা সাহচর্যে বাস করে না। যেমন– কবুতর (*Columba livia*)।

খ. **পরজীবী** (Parasite) : এসব প্রাণী খাদ্যের জন্য অন্য প্রাণীর দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং আশ্রয়দাতার দেহ থেকে খাদ্য শোষণ করে বেঁচে থাকে। যেমন– যকৃত কৃমি (*Fasciola hepatica*)।

৪. ক্লিভেজ ও ভ্রূণীয় বিকাশ (Cleavage and development)

যে পদ্ধতিতে যৌন জননকারী প্রাণীর এককোষী জাইগোট মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে বিভাজিত হয়ে অসংখ্য বহুকোষী ভ্রূণ সৃষ্টি করে তাকে ক্লিভেজ বা সম্ভেদ বলে। ডিমে কুসুমের পরিমাণের ভিত্তিতে ক্লিভেজ সম্পূর্ণ বা হলোব্লাস্টিক (holoblastic) কিংবা আংশিক বা মেরোব্লাস্টিক (meroblastic) হতে পারে। ক্লিভেজের সময় ডিমের যে প্রান্তে কুসুম থাকে তাকে ভেজিটাল পোল (vegetal pole) এবং যে প্রান্তে নিউক্লিয়াস থাকে তাকে অ্যানিমেল পোল (animal pole) বলে।

www.Educationblog24.Com

বিভাজন তলের উপর ভিত্তি করে ক্লিভেজ তিন প্রকার, যথা–

ক. অরীয় ক্লিভেজ (Radial cleavage) : এক্ষেত্রে বিভাজন তলগুলো জাইগোটকে সর্বদা অরীয় ও সুষমভাবে বিভক্ত করে। Arthropoda পর্বের প্রাণীতে ক্লিভেজ অরীয় ধরনের।

খ. দ্বিপার্শ্বীয় ক্লিভেজ (Bilateral cleavage) : এক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিভাজন পর্যন্ত অরীয় ক্লিভেজের মতো কিন্তু পরবর্তী বিভাজন মধ্যরেখা বরাবর অনুপ্রস্থভাবে ঘটে বলে চারটি করে দুই সারি কোষের সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্যতা দেখা যায়। Chordata পর্বের প্রাণীতে এ ধরনের ক্লিভেজ দেখা যায়।

গ. সর্পিল ক্লিভেজ (Spiral cleavage) : Annelida ও Mollusca পর্বের প্রাণিদের ক্ষেত্রে ঠিক তৃতীয় বিভাজনের সময় অ্যানিমেল পোলের ব্লাস্টোমিয়ারসমূহ ভেজিটাল পোলের ব্লাস্টোমিয়ারগুলোর সাথে চক্রাকারে সামান্য স্থান পরিবর্তন করে। এ ধরনের ক্লিভেজকে সর্পিল ক্লিভেজ বলে। পাখি, সরিসৃপ ও মাছে এধরনের ক্লিভেজ পাওয়া যায়।

৫. ভ্রূণস্তর (Germ layers)

যেসব প্রাণীর যৌন প্রজনন ঘটে সেগুলোর জাইগোট ক্লিভেজ (cleavage) প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে **ব্লাস্টোমিয়ার** (blastomere) নামক কোষ সৃষ্টি করে। কোষগুলো সজ্জিত হয়ে প্রথমে নিরেট **মরুলা** (morula) ও পরে ফাঁপা **ব্লাস্টুলা** (blastula) দশা অতিক্রম করে দ্বিস্তরী বা ত্রিস্তরী **গ্যাস্ট্রুলা** (gastrula)-য় পরিণত হয়। প্রাণীর প্রাথমিক শ্রেণিবিন্যাসে ভ্রূণস্তর বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ভ্রূণস্তরের উপর ভিত্তি করে প্রাণিদের দুভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে:

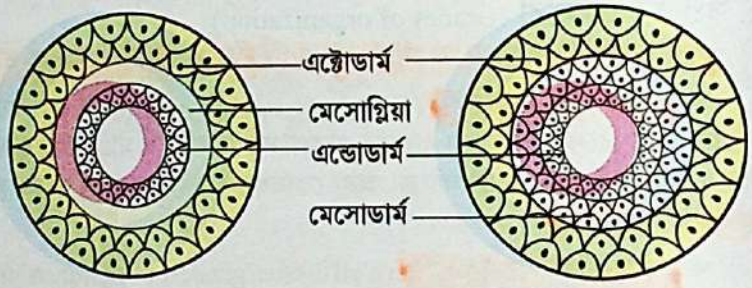

চিত্র ১.১ : দ্বিস্তরী (বায়ে) এবং ত্রীস্তরী (ডানে) কোষ বিন্যাস

ক. দ্বিস্তরী বা দ্বিভ্রূণস্তরী প্রাণী (Diploblastic animal) : যেসব প্রাণীর ভ্রূণের গ্যাস্ট্রুলা পর্যায়ে কোষগুলো এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্ম নামক দুটি স্তরে বিন্যস্ত থাকে, সেগুলোকে দ্বিস্তরী প্রাণী বলে। স্তরদুটির মাঝে থাকে আঠালো জেলির মতো অকোষীয় মেসোগ্লিয়া (mesoglea)। Cnidaria পর্বের প্রাণীরা দ্বিস্তরী (যেমন– *Hydra*)।

খ. ত্রিস্তরী বা ত্রিভ্রূণস্তরী প্রাণী (Triploblastic animal) : যেসব প্রাণীর ভ্রূণে গ্যাস্ট্রুলা পর্যায়ে কোষগুলো তিনটি কোষীয় স্তরে বিন্যস্ত থাকে তাদের ত্রিস্তরী প্রাণী বলে। তিনটি স্তরের মধ্যে বাইরের স্তরটিকে **এক্টোডার্ম** (ectoderm), মাঝেরটিকে **মেসোডার্ম** (mesoderm) এবং ভিতরেরটিকে **এন্ডোডার্ম** (endoderm) বলে। Platyhelminthes (ফিতাকৃমি-*Taenia solium*) থেকে শুরু করে Chordata (মানুষ-*Homo sapiens*) পর্ব পর্যন্ত সকল প্রাণী ত্রিস্তরী। এ স্তরগুলো থেকে প্রাণিদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি হয়।

দ্বিস্তরী প্রাণী ও ত্রিস্তরী প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য

তুলনীয় বৈশিষ্ট্য	দ্বিস্তরী প্রাণী	ত্রিস্তরী প্রাণী
১. ভ্রূণীয় কোষস্তর	দেহের কোষগুলো এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্ম নামক দুটি স্তরে বিন্যস্ত থাকে।	দেহের কোষগুলো এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম ও এন্ডোডার্ম নামক তিনটি স্তরে বিন্যস্ত থাকে।
২. মেসোগ্লিয়া	এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্মের মাঝখানে মেসোগ্লিয়া নামক অকোষীয় স্তর থাকে।	মেসোগ্লিয়া নেই।
৩. ভ্রূণস্তরের পরিণতি	কোষগুলো টিস্যু বা অঙ্গ গঠন করতে পারে না।	ভ্রূণস্তরের কোষগুলো বিভিন্ন টিস্যু, অঙ্গ ও অঙ্গতন্ত্র গঠন করে।
৪. নেমাটোসিস্ট	উপস্থিত।	অনুপস্থিত।
৫. পলিপ ও মেডুসা দশা	উভয় দশা বা একটি দশা থাকে।	অনুপস্থিত।
৬. দেহ গহ্বর	গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার গহ্বর বা সিলেন্টেরন।	সিলোম।

www.Educationblog24.Com

৬. প্রতিসাম্য (Symmetry)

প্রতিসাম্য বলতে প্রাণিদেহের মধ্যরেখীয় তলের দুপাশে সদৃশ বা সমান আকার-আকৃতিবিশিষ্ট অংশের অবস্থানকে বোঝায়। যেসব প্রাণীর দেহকে কোনো না কোনো অক্ষ বা তল বরাবর সমান অংশে ভাগ করা যায় সেসব প্রাণীকে **প্রতিসম প্রাণী** (symmetrical animal) বলে। আর যেসব প্রাণীর দেহে এমন বিভাজন সম্ভব হয় না সেগুলোকে **অপ্রতিসম প্রাণী** (asymmetrical animal) বলে অভিহিত করা হয়। প্রাণিদেহে নিচে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের প্রতিসাম্য দেখা যায়।

ক. **গোলীয় প্রতিসাম্য** (Spherical symmetry) : একটি গোলককে যেভাবে কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত যে কোনো তল বরাবর সদৃশ বা সমান অংশে ভাগ করা যায়, তেমনিভাবে কোনো প্রাণিদেহকে যদি ভাগ করা যায়, তখন তাকে গোলীয় প্রতিসাম্য বলে। যেমন- *Volvox, Radiolaria, Heliozoa* প্রভৃতি এককোষী প্রোটিস্টান জীব।

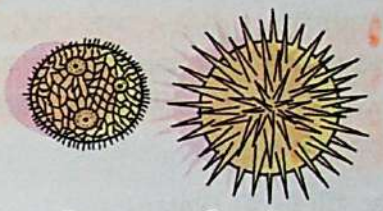

চিত্র ১.২ : গোলীয় প্রতিসাম্য

খ. **অরীয় প্রতিসাম্য** (Radial symmetry) : কোনো প্রাণীর দেহকে যদি কেন্দ্রীয় লম্ব অক্ষ বরাবর কেটে সদৃশ দুইয়ের বেশি সংখ্যক অর্ধাংশে ভাগ করা যায়, তখন সে ধরনের প্রতিসাম্যকে অরীয় প্রতিসাম্য বলে। হাইড্রা (*Hydra*), জেলিফিশ (*Aurelia*), সী অ্যানিমন (*Metridium*) ও সম্পর্কিত গোষ্ঠিভুক্ত প্রাণী যাদের অনুলম্ব অক্ষের এক প্রান্তে মুখ অবস্থিত সে সব প্রাণীতে অরীয় প্রতিসাম্য দেখা যায়।

চিত্র ১.৩ : অরীয় প্রাতিসাম্য

গ. **দ্বিঅরীয় প্রতিসাম্য** (Biradial symmetry): কোনো প্রাণিদেহে যখন কোনো অঙ্গের সংখ্যা একটি কিংবা একজোড়া হওয়ায় অনুদৈর্ঘ্য অক্ষ বরাবর শুধু দুটি তল পরস্পরের সমকোণে অতিক্রম করতে পারে, ফলে ঐ প্রাণিদেহ ৪টি সদৃশ অংশে বিভক্ত হতে পারে। এ ধরনের প্রতিসাম্য হচ্ছে দ্বিঅরীয় প্রতিসাম্য। Ctenophora (টিনোফোরা) পর্বভুক্ত প্রাণীর দেহ, যেমন–*Ceoloplana* মৌলিকভাবে অরীয় প্রতিসম হলেও দুটি কর্ষিকা থাকায় এগুলো দ্বিঅরীয় প্রতিসম প্রাণী।

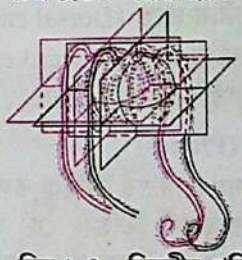

চিত্র ১.৪ : দ্বিঅরীয় প্রতিসাম্য

ঘ. **দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্য** (Bilateral symmetry) : যখন কোনো প্রাণীর দেহকে কেন্দ্রীয় অক্ষ বরাবর শুধু একবার ডান ও বামপাশে (অর্থাৎ স্যাজিটাল তল) দুটি সদৃশ অংশে ভাগ করা যায়, তখন তাকে দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্য বলে। যেমন- প্রজাপতি (*Pieris brassicae*), ব্যাঙ (*Fejervarya asmati*), মানুষ (*Homo sapiens*) প্রভৃতি।

চিত্র ১.৫ : দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্য

ঙ. **অপ্রতিসাম্য** (Asymmetry) : যখন কোনো প্রাণীর দেহকে অক্ষ বা দেহতল বরাবর ছেদ করলে একবারও দুটি সদৃশ অংশে ভাগ করা যায় না তখন তাকে অপ্রতিসাম্য বলে। উদাহারণ–স্পঞ্জ (*Cliona celata*), আপেল শামুক (*Pila globosa*) ইত্যাদি।

চিত্র ১.৬ : অপ্রতিসাম্য

৭. খণ্ডকায়ন (Metamerism or Segmentation)

কোনো প্রাণীর দেহ যদি লম্বালম্বি অক্ষ বরাবর একই রকম খণ্ডাংশের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে গঠিত হয়, তখন এ অবস্থাকে খণ্ডকায়ন বা মেটামেরিজম (metamerism) বলে। প্রতিটি খণ্ডককে বলা হয় মেটামিয়ার (metamere) বা সোমাইট (somite)। বিভিন্ন ধরনের খণ্ডকায়নবিশিষ্ট প্রাণী হতে পারে। যেমন–

ক. **সমখণ্ডকায়নবিশিষ্ট** (Homonomous metamere) : যে সব প্রাণীর দেহখণ্ডকগুলো সদৃশ বা একই ধরনের হয়, সেসব প্রাণীকে সমখণ্ডকায়নবিশিষ্ট বলে। উদাহরণ– কেঁচোর খণ্ডকায়ন।

খ. **অসমখণ্ডকায়নবিশিষ্ট** (Heteronomous metamere) : যে সব প্রাণীর দেহখণ্ডকগুলো অসম বা ভিন্ন ধরনের হয়, সেসব প্রাণীকে অসম খণ্ডকায়নবিশিষ্ট বলে। উদাহরণ– পতঙ্গের খণ্ডকায়ন।

গ. **খণ্ডকায়নবিহীন** (Asegmental) : এ ধরনের প্রাণীতে কোনো খণ্ডকায়ন নেই। উদাহরণ– সমুদ্রতারা, ঝিনুক ইত্যাদি।

www.Educationblog24.Com

৮. অঞ্চলায়ন বা ট্যাগমাটাইজেশন (Tagmatization)

Arthropoda পর্বের প্রাণিদেহ বাহ্যিকভাবে খণ্ডায়িত হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খণ্ডকগুলো সুস্পষ্ট নয় বরং এক্ষেত্রে কিছু খণ্ডক একত্রে মিলিত হয়ে দেহে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চল সৃষ্টি করে। প্রতিটি অঞ্চলকে ট্যাগমাটা (tagmata) বলে। আর্থ্রোপোডের দেহ-খণ্ডকগুলোর এমন অঞ্চলীকরণকে বলে অঞ্চলায়ন। Arthropoda-র শ্রেণিবিন্যাসে অঞ্চলায়নের গুরুত্ব দেয়া হয়।

চিত্র ১.৭ : ট্যাগমাটাইজেশন

৯. প্রান্তিকতা (Polarity)

দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম প্রাণীর দেহের যে প্রান্তে মুখ থাকে তাকে মাথা ও তার বিপরীত প্রান্তকে পায়ু বা লেজ প্রান্ত বলা হয়। এরকমভাবে যেকোন প্রাণীর দেহের দুই প্রান্তের গঠনের ভিন্নতাই প্রান্তিকতা নামে পরিচিত। সাধারণত প্রাণিদেহের প্রান্তিকতা পাঁচ ধরনের।

ক. **সম্মুখ প্রান্ত** (Anterior end) : দেহের যে প্রান্তে মাথা থাকে।
খ. **পশ্চাৎ প্রান্ত** (Posterior end) : মাথার বিপরীত প্রান্ত।
গ. **পৃষ্ঠীয় প্রান্ত** (Dorsal end): দেহের উপরের দিকের তল।
ঘ. **অঙ্কীয় প্রান্ত** (Ventral end) : দেহের নিচের দিকের তল।
ঙ. **পার্শ্বীয় প্রান্ত** (Lateral end) : দেহের দুইপাশের তল।

১০. তল (Planes)

প্রতিসম প্রাণীতে দৈহিক তল শ্রেণিকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। যে অঞ্চল বরাবর প্রাণিদেহকে ডান ও বাম বা অনুদৈর্ঘ্য ও অনুপ্রস্থ বা সম্মুখ ও পশ্চাৎ অঞ্চল বরাবর দুভাগে ভাগ করা যায়, তাকে তল বলে। প্রাণিদেহে সাধারণত তিন ধরনের তল দেখা যায়।

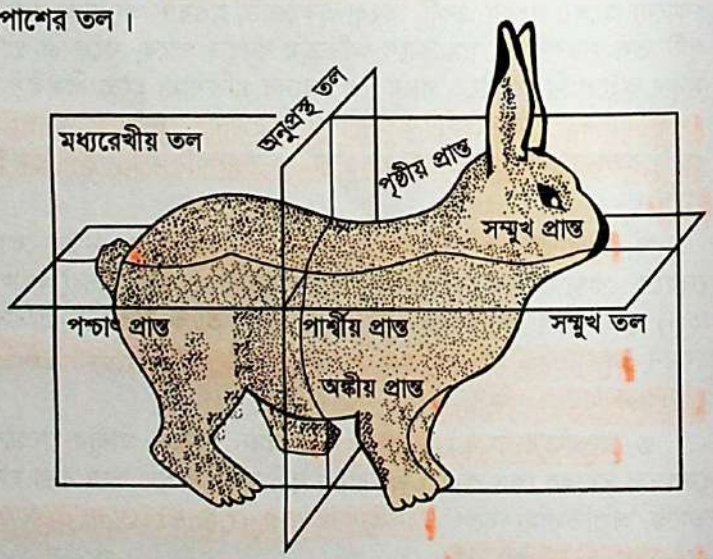

চিত্র ১.৮ : একটি দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম প্রাণীর বিভিন্ন প্রান্ত ও তল

ক. **মধ্যরেখীয় তল** (Median or Sagittal plane) : যে তল দিয়ে কেন্দ্রীয়, পৃষ্ঠীয় ও অঙ্কীয় অক্ষ বরাবর দেহকে পার্শ্বীয়ভাবে সদৃশ ডান ও বাম অর্ধাংশে ভাগ করা যায়, তাকে মধ্যরেখীয় তল বলে।

খ. **সম্মুখ তল** (Frontal plane) : যে তল দিয়ে লম্বা লম্বি অক্ষ বরাবর দেহকে পৃষ্ঠীয় ও অঙ্কীয় এ দুটি অংশে ভাগ করা যায়, তাকে সম্মুখ তল বলে।

গ. **অনুপ্রস্থ তল** (Transverse plane) : যে তল দিয়ে দেহের মধ্যরেখীয় তলের সমকোণ বরাবর দেহকে সম্মুখ ও পশ্চাৎ অর্ধাংশে ভাগ করা যায়, তাকে অনুপ্রস্থ তল বলে।

১১. সিলোম (Coelom)

ত্রিস্তরী প্রাণীর ভ্রূণীয় পরিস্ফুটনের সময় মেসোডার্ম স্তর থেকে সৃষ্ট যে গহ্বর মেসোডার্মাল কোষে নির্মিত পেরিটোনিয়াম (peritoneum) নামক ঝিল্লিতে আবৃত থাকে তাকে সিলোম বলে। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী, দেহাভ্যন্তরীণ সব গহ্বরই সিলোম নয়। বরং সিলোম ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের গহ্বর দেহের অভ্যন্তরে উপস্থিত। সিলোমের উপস্থিতির ভিত্তিতে প্রাণিদের নিম্নোক্ত গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়।

www.Educationblog24.Com

ক. **অ্যাসিলোমেট (Acoelomate)** : এসব প্রাণীর দেহে সিলোমের পরিবর্তে ভ্রূণীয় পরিস্ফুটনের সময় অন্তঃস্থ ফাঁকা স্থানটি (ব্লাস্টোসিল) মেসোডার্মাল স্পঞ্জি প্যারেনকাইমা (spongy parenchyma) কোষে পূর্ণ থাকে। Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes প্রভৃতি পর্বভুক্ত প্রাণীরা অ্যাসিলোমেট।

খ. **স্যুডোসিলোমেট (Pseudocoelomate) বা অপ্রকৃত-সিলোমেট** : এসব প্রাণীও সিলোমবিহীন তবে ভ্রূণীয় পরিস্ফুটনের সময় অন্তঃস্থ ফাঁকা স্থানটিকে (ব্লাস্টোসিল) ঘিরে কখনও কখনও মেসোডার্মাল কোষস্তর অবস্থান করে। কিন্তু কোষগুলো কখনও পূর্ণ কোষস্তর বা পেরিটোনিয়াম সৃষ্টি করে ব্লাস্টোসিলকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করে না। Nematoda, Rotifera, Kinorhyncha প্রভৃতি পর্বভুক্ত প্রাণীরা স্যুডোসিলোমেট।

গ. **ইউসিলোমেট (Eucoelomate) বা প্রকৃত সিলোমেট** : এগুলো প্রকৃত সিলোমযুক্ত প্রাণী কারণ ভ্রূণীয় মেসোডার্মের অভ্যন্তর থেকে গহ্বররূপে সিলোম উদ্ভূত হয় এবং চাপা, মেসোডার্মাল এপিথেলিয়াল কোষে গঠিত পেরিটোনিয়াম স্তরে সম্পূর্ণ বেষ্টিত থাকে। ইউসিলোমেটদের অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রাণী মনে করা হয়। Mollusca, Annelida, Arthropoda, Echinodermata, Hemichordata, Chordata প্রভৃতি পর্বভুক্ত প্রাণী ইউসিলোমেট।

চিত্র ১.৯ : বিভিন্ন ধরনের সিলোম

কাজ : স্যুডোসিলোমেট এবং ইউসিলোমেট প্রাণীর মধ্যে তুলনামূলক ছক তৈরি কর।

১২. নটোকর্ড (Notochord)

ভ্রূণাবস্থায় বা আজীবন দেহের পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা বরাবর অবস্থিত কিছুটা নমনীয়, স্থিতিস্থাপক ও ছিদ্রযুক্ত টিস্যুর দণ্ডকে নটোকর্ড বলে। নটোকর্ডের উপর ভিত্তি করে প্রাণিজগতকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে।

ক. **ননকর্ডেট (Nonchordate)** : এদের দেহে কখনোই নটোকর্ড থাকে না। যেমন–কেঁচো, ঘাসফড়িং ইত্যাদি।

খ. **কর্ডেট (Chordate)** : এসব প্রাণীর দেহে আজীবন বা শুধু ভ্রূণ অবস্থায় নটোকর্ড থাকে। যেমন– অ্যাসিডিয়া, ব্যাঙ, সাপ, মানুষ ইত্যাদি।

১৩. পৌষ্টিকনালি (Alimentary canal)

পৌষ্টিকনালির উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে প্রাণিদের দুভাগে ভাগ করা যায়–

ক. **প্যারাজোয়া (Parazoa)** : যেসব প্রাণীর দেহে কোনো নির্দিষ্ট পৌষ্টিকনালি বা গহ্বর থাকে না সেগুলোকে প্যারাজোয়া বলে। উদাহরণ– Porifera পর্বভুক্ত প্রাণী।

খ. **এন্টেরোজোয়া (Enterozoa)** : যেসব প্রাণীর দেহে নির্দিষ্ট পৌষ্টিকনালি বা গহ্বর থাকে সেগুলোকে এন্টেরোজোয়া বলে। উদাহরণ– Cnidaria থেকে Chordata পর্ব পর্যন্ত সকল প্রাণী।

www.Educationblog24.Com

শ্রেণিবিন্যাসের নীতি (Principles of Animal Classification)

শ্রেণিবিন্যাস একটি সুসংঘবদ্ধ বিজ্ঞান। খুঁটিনাটি অনেক নীতি মেনে শ্রেণিবিন্যাস সম্পন্ন করতে হয়। নিচে প্রধান নীতিগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেয়া হলো।

১. শ্রেণিবদ্ধগত বৈশিষ্ট্য (Taxonomic character) **নির্ধারণ :** একটি ট্যাক্সন-সদস্যের যে বৈশিষ্ট্য অন্য ট্যাক্সন (শ্রেণিবদ্ধগত একক) থেকে তাকে পৃথক করতে পারে বা পৃথক করার সম্ভাবনা দেখাতে পারে সেটি ঐ ট্যাক্সনের শ্রেণিবদ্ধগত বৈশিষ্ট্য। আধুনিক গবেষণায়, শ্রেণিবদ্ধগত বৈশিষ্ট্য বলতে ট্যাক্সন-সদস্যদের অঙ্গসংস্থানিক, রাসায়নিক, শারীরবৃত্তিক, জিনগত, জননগত বা বাস্তুসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যকে বুঝায়। শ্রেণিবিন্যাসের সময় প্রত্যেক ধাপে অন্তর্ভুক্ত ট্যাক্সনের শনাক্তকারী শ্রেণিবদ্ধগত বৈশিষ্ট্যাবলির উল্লেখ করতে হয়।

২. শনাক্তকরণ (Identification) **:** শ্রেণিবদ্ধগত বৈশিষ্ট্যের আলোকে পর্যবেক্ষণে থাকা কোনো ট্যাক্সন-সদস্য পরিচিত বা আগে বর্ণিত হয়েছে এমন হতে পারে, কিংবা অপরিচিতও হতে পারে। তার অর্থ এই নয় যে, এটি একটি নতুন ট্যাক্সন। এভাবে শ্রেণিকরণের উদ্দেশে সংগৃহীত যে কোনো নমুনা নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য প্রাণীর প্রকাশিত বর্ণনার সাথে তুলনামূলক আলোচনা সাপেক্ষে ক্যাটাগরিকরণ সম্পন্ন করতে হবে।

৩. ক্যাটাগরিকরণ বা র‍্যাংকভুক্তি (Categorization or Ranking) **:** যেসব প্রাণী বা প্রাণিগোষ্ঠীকে শ্রেণিবিন্যাসের উদ্দেশে বিভিন্ন ধাপ অর্থাৎ ক্যাটাগরি বা র‍্যাংক-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয় সে সব প্রাণিগোষ্ঠীকে **ট্যাক্সন** (taxon; বহুবচনে taxa) বলে। **ট্যাক্সন হচ্ছে শ্রেণিবদ্ধগত একক** (taxonomic unit)। অর্থাৎ শ্রেণিবিন্যাসে ব্যবহৃত প্রতিটি ক্যাটাগরিভুক্ত (র‍্যাংকভুক্ত) প্রাণীর জনগোষ্ঠী বা জনগোষ্ঠীবর্গকে একেকটি ট্যাক্সন বলে। যেমন–Animalia, Chordata, Mammalia, Primates, Hominidae, *Homo, Homo sapiens* একেকটি ট্যাক্সন। বিবর্তনিকভাবে সম্পর্কিত এবং অভিন্ন বৈশিষ্ট্যাবলি বহনকারী প্রাণিগুলো (ট্যাক্সন)-কে একেকটি শ্রেণিবদ্ধগত ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শ্রেণিবিন্যাসের আবশ্যিক (mandatory) ধাপ (র‍্যাংক বা ক্যাটাগরি) হচ্ছে ৭টি, যথা:- Kingdom, Phylum, Class, Order, Family, Genus ও Species।

বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নতুন প্রাণী আবিষ্কার হওয়ায় পরবর্তীতে প্রাণীর সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাওয়ার কারণে ঐ ৭টি স্তরের শ্রেণিবিন্যাস অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ অসুবিধা দূর করতে প্রাণিবিজ্ঞানীরা উপরের ৭টি মূলধারার সাথে Super (অধি), Sub (উপ), Infra (ইনফ্রা) ইত্যাদি নতুন স্তর যুক্ত করেন। তবে এগুলো আবশ্যিক ধাপ নয়।

i. **প্রজাতি** (Species) **:** শ্রেণিবিন্যাসের মূল বা ভিত্তি একক হচ্ছে প্রজাতি। Earnst Mayr (1969) এর মতে -"প্রাকৃতিক পরিবেশে কোনো জীবগোষ্ঠী যদি নিজেদের মধ্যে যৌন মিলন ঘটিয়ে জননক্ষম সন্তান উৎপাদনে সক্ষম হয় কিন্তু অন্য কোনো গোষ্ঠীর সাথে প্রজননগতভাবে বিচ্ছিন্ন বা আলাদা থাকে তখন ঐ ধরনের জীবগোষ্ঠীকে প্রজাতি বলে।" যেমন– পৃথিবীর সকল মানুষ, বানর, ব্যাঙ, আম, কাঁঠাল গাছ একেকটি প্রজাতির অন্তর্গত।

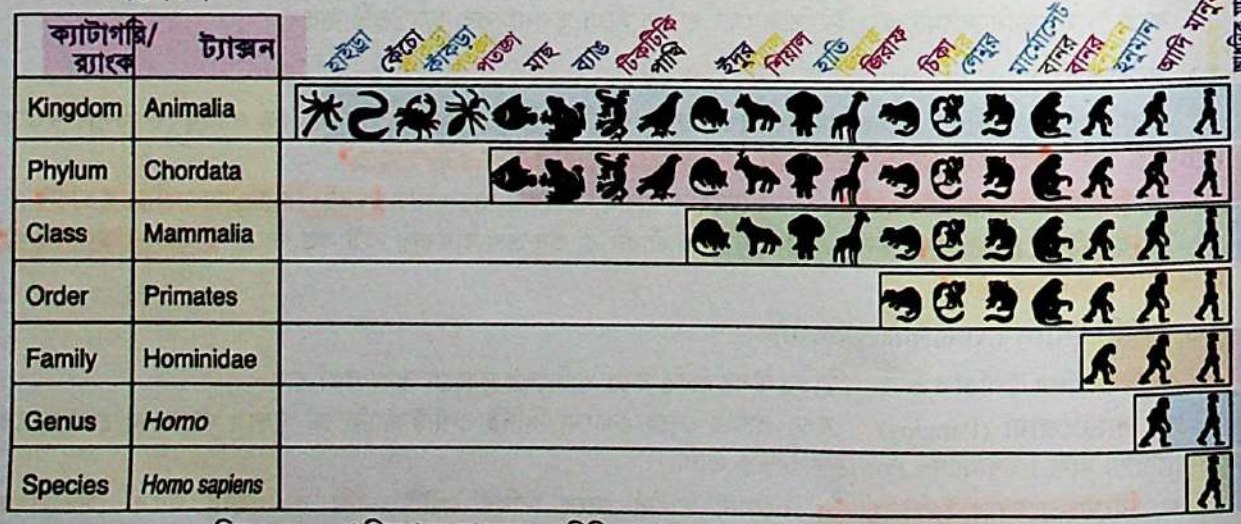

চিত্র ১.১০ : প্রাণিজগতে মানুষের শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান (systemetic position)

www.Educationblog24.Com

ii. **গণ** (Genus) : পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত একাধিক প্রজাতির সমন্বয়ে গঠিত এককে গণ বলে।
iii. **গোত্র** (Family) : পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত এক বা একাধিক গণ মিলে গঠিত হয় একটি গোত্র।
iv. **বর্গ** (Order) : পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত এক বা একাধিক গোত্র মিলে একটি বর্গ গঠন করে।
v. **শ্রেণি** (Class) : পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এক বা একাধিক বর্গ নিয়ে গঠিত এককে শ্রেণি বলে।
vi. **পর্ব** (Phylum) : কয়েকটি সাদৃশ্যপূর্ণ শ্রেণি নিয়ে গঠিত এককে বলা হয় পর্ব।
vii. **রাজ্য** (Kingdom) : এটি প্রাণী শ্রেণিবিন্যাসের সার্বজনীন স্তর। অর্থাৎ এ স্তরটিতে পৃথিবীর সকল প্রাণীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪. নামকরণ (Nomenclature) : কোনো বিশেষ প্রাণী বা প্রাণিগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট নামে শনাক্তকরণের পদ্ধতিকে বলা হয় নামকরণ। ব্যাপক তথ্যানুসন্ধানের পর কোন প্রাণী নতুন প্রমাণিত হলে উক্ত প্রাণীকে ICZN এর নিয়মানুযায়ী নামকরণ করতে হবে। সুইডিশ বিজ্ঞানী **ক্যারোলাস লিনিয়াস** (Carolus Linnaeus) সর্বপ্রথম নামকরণের একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। এটি **দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতি** (Binomial Nomenclature System) নামে পরিচিত। এ নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক জীবের বৈজ্ঞানিক নামের দুটি অংশ থাকে যার প্রথমটি **গণ** (genus) নাম এবং দ্বিতীয়টি **প্রজাতি** (species) নাম। গণ নামের প্রথম অক্ষর ইংরেজী বর্ণমালার বড় অক্ষরে এবং প্রজাতি নামের আদ্যক্ষর ছোট অক্ষরে লিখতে হয়। এভাবে দুটি ল্যাটিন বা রূপান্তরিত ল্যাটিন শব্দ দিয়ে প্রাণীর নামকরণের পদ্ধতিকে **দ্বিপদ নামকরণ** (binomial nomenclature) বলে।

অনেক সময় একটি প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য অঙ্গসংস্থানিক পার্থক্য দেখা যায়। সে সব সদস্যকে ঐ নির্দিষ্ট প্রজাতির **উপপ্রজাতি** (subspecies) হিসেবে গণ্য করা হয়। তখন গণ ও প্রজাতি সমন্বিত দ্বিপদ নামটি উপপ্রজাতিসহ **ত্রিপদ** (trinomial) নামে পরিচিত হয়। এভাবে, উপপ্রজাতিসহ কোনো প্রাণীর নামকরণকে **ত্রিপদ নামকরণ** (trinominal nomenclature) বলে। যেমন: ইউরোপীয়ান চড়ুই পাখির বৈজ্ঞানিক নাম-*Passer domesticus*; কিন্তু নীলনদ এলাকার চড়ুই পাখির বৈজ্ঞানিক নাম– *Passer domesticus niloticus*। পাখি বিজ্ঞানী Schlegel (1844) সর্বপ্রথম ত্রিপদ নামকরণ পদ্ধতির প্রচলন করেন এবং এটি ICZN কর্তৃক স্বীকৃত পদ্ধতি।

কোনো জীবের নামকরণ পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল এবং তা কতকগুলো নিয়ম মেনে সমাধান করা হয়। প্রাণীর নামকরণের নিয়মগুলো প্রাণী নামকরণের আন্তর্জাতিক সংস্থা International Commission on Zoological Nomenclature (ICZN) প্রণয়ন করে থাকে এবং নিয়মগুলো International Code on Zoological Nomenclature-এ লিপিবদ্ধ করা হয়। **নিচে নামকরণের প্রধান নিয়মাবলি উলেখ করা হলো।**

i. প্রত্যেক প্রাণীর একটি **বৈজ্ঞানিক নাম** থাকবে এবং এ নামের **দুটি অংশ** থাকবে; একে **দ্বিপদ নামকরণ** বলা হবে।
ii. দ্বিপদ নামের প্রথম অংশটি ঐ জীবের **গণ** নাম ও দ্বিতীয় অংশটি **প্রজাতি** নামের নির্দেশক।
iii. প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নামটি অবশ্যই **ল্যাটিন** বা **ল্যাটিনকৃত** (latinized) হতে হবে। দ্বিপদ নামকরণ ছাপা অক্ষরে হলে সবসময় **ইটালিক** (ডান দিকে বাঁকা করে) হরফে হবে (যেমন–*Panthera tigris*, বাঘ)।
iv. গণ-নামটি বিশেষ্য ও এর আদ্যাক্ষরটি অবশ্যই বড় হরফে (capital letter) লিখতে হবে এবং প্রজাতি নামটি বিশেষণ যার আদ্যাক্ষরটি ছোট হরফে (small letter) লিখতে হবে।
v. যে বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম কোনো জীবের বিজ্ঞানসম্মত বর্ণনা দিবেন, তাঁর নাম বা নামের অংশ উক্ত জীবের দ্বিপদ নামের শেষে সংযোজিত হবে। যেমন– মাছের সিলিয়েট পরজীবী, *Paratrichodina lizae* Asmat, 2002; আসমতি ব্যাঙ, *Fejervarya asmati* Howlader, 2011।

৫. সংরক্ষণ (Preservation) : শ্রেণিবিন্যাসকৃত নমুনাকে বিস্তারিত তথ্যসহ (সংগ্রহকারীর নাম, সংগ্রহের স্থান, সময়, তারিখ ইত্যাদি) সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে অন্যান্য নমুনা শনাক্তকরণ সহায়ক হয়। এ কারণে বিভিন্ন দেশে প্রাপ্ত প্রাণীর নমুনা প্রাকৃতিক জাদুঘর, বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের বিভাগীয় সংরক্ষণশালায় সরকারী অনুমোদন সাপেক্ষে সংরক্ষিত থাকে। নমুনাটি হতে পারে স্টাফ করা (stuffed) প্রাণী, চামড়া, কিংবা বিভিন্ন অংশ (শিং, লোম, মল ইত্যাদি)

www.Educationblog24.Com

বা কংকাল। প্রাণিদেহ শুকনো বা তরলেও সংরক্ষণ করা যায়। ফরমালিন ও অ্যালকোহল হচ্ছে সংরক্ষণের ভালো তরল মাধ্যম। বিভিন্ন প্রাণিগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন মাত্রার ফরমালিন ও অ্যালকোহল, কিংবা অন্যান্য বিশেষ সংরক্ষণ মাধ্যম নির্দিষ্ট রয়েছে। অতএব, শ্রেণিবিন্যাসে নমুনা সংরক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বশীল অধ্যায়।

প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Animal Classification)

তত্ত্বীয় ও ফলিত উভয় জীববিজ্ঞানেই শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

তাত্ত্বিক প্রয়োজনীয়তা

- শ্রেণিবিন্যাসের মাধ্যমে কোনো প্রাণিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাণী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করলে ঐ গোষ্ঠীর অন্যান্য প্রাণী সম্বন্ধে ধারণা জন্মে।
- কম পরিশ্রম ও অল্প সময়ের মধ্যে প্রাণিজগতের অনেক সদস্য সম্পর্কে জানা ও শেখা যায়।
- প্রাণিকূলের পারস্পরিক সম্পর্ক বা জাতিজনির বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়।
- প্রাণিকূলের বিবর্তনিক ধারা নির্ণয়ে শ্রেণিবিন্যাস সাহায্য করে।
- নতুন প্রজাতি শনাক্ত করতে শ্রেণিবিন্যাস অপরিহার্য।

ফলিত প্রয়োজনীয়তা

- জনস্বাস্থ্য, কৃষি ও বনের ক্ষতিকর প্রজাতি দমনের উদ্দেশে শ্রেণিবিন্যাস নির্দিষ্ট প্রজাতির সঠিক পরিচয় দান করে।
- শ্রেণিবিন্যাসের মাধ্যমে অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন প্রাণী বাছাই করা যায়।
- বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সাহায্য করে।
- ভূতাত্ত্বিক ঘটনাবলির নিখুঁত চিত্র তুলে ধরতে জীবজগতের শ্রেণিবিন্যাসের সাহায্য প্রয়োজন।
- কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উন্নত জাতের পশুপাখি উদ্ভাবন সহজতর হয়।

Hickman *et al.* (2017) অনুসরণে প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাস

প্রাণিজগতের পর্বগুলোকে সাধারণভাবে **প্রধান পর্ব** (Major Phyla) এবং **গৌণ পর্ব** (Minor Phyla)-এ রকম দুটি দলে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। কোন বিবর্তনিক সম্পর্ক বা বৈশিষ্ট্যগত ভিত্তিতে দলবিভক্তি করা হয় না। তবে, প্রজাতি ও সদস্য সংখ্যা, বাস্তুতন্ত্রে এদের গুরুত্ব এবং পর্ব হিসেবে সুস্পষ্টতা অনুযায়ী এমন শ্রেণিবিন্যাস প্রচলিত আছে।

১. প্রধান পর্ব (Major Phyla) : যেসব পর্বের প্রজাতিসংখ্যা অনেক বেশি (পাঁচ হাজারের অধিক), প্রজাতির সদস্যরা বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং সুস্পষ্টভাবে পর্ব হিসেবে পৃথক সত্ত্বার অধিকারী সে সব পর্বকেই প্রধান (মুখ্য) পর্ব অর্থাৎ Major Phyla হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। প্রধান পর্বগুলোর মধ্যে ৮টি ননকর্ডাটা (nonchordata) ও ১টি কর্ডাটা (chordata)।

২. গৌণ পর্ব (Minor Phyla) : যেসব পর্বের প্রজাতিসংখ্যা নগণ্য, প্রজাতির বাস্তুতান্ত্রিক গুরুত্ব নেই বললেই চলে এবং শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান অস্পষ্ট অথবা বিতর্কিত সে সব পর্বই গৌণ পর্ব অর্থাৎ Minor Phyla হিসেবে স্বীকৃত। উদাহরণ– Placozoa, Ctenophora ইত্যাদি পর্ব।

Hickman *et al.* (2014) রচিত Integrated Principles of Zoology পুস্তকের বর্ণনায় প্রাণিজগতের ৩৩টি পর্বের মধ্যে প্রধান বা মেজর পর্বের সংখ্যা হলো ৯টি, এর ৮টি ননকর্ডাটা ও ১টি কর্ডাটা পর্ব। বাকি পর্বগুলো গৌণ বা মাইনর পর্ব। নিচে ৯টি প্রধান পর্বের নাম উল্লেখ করা হলো -

Phylum-1 : **PORIFERA**, Phylum-2 : **CNIDARIA**, Phylum-3 : **PLATYHELMINTHES**, Phylym-4: **NEMATODA**, Phylum -5: **MOLLUSCA**, Phylum- 6 : **ANNELIDA**, Phylum -7 : **ARTHROPODA**, Phylum -8 : **ECHINODERMATA**, Phylum -9 : **CHORDATA**.

www.Educationblog24.Com

Hickman *et al.* (2017) অনুসরণে প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাসের ছক

Kingdom-ANIMALIA

Branch A. MESOZOA (স্বল্প সংখ্যক কোষবিশিষ্ট প্রাণী; টিস্যু বা অঙ্গ গঠিত হয় না)
- 1. Phylum Mesozoa

Branch B. PARAZOA (অসংখ্য কোষবিশিষ্ট প্রাণী; টিস্যু বা অঙ্গতন্ত্র গঠিত হয় না)
- ❋ 2. Phylum **Porifera**
- 3. Phylum Placozoa

Branch C. EUMETAZOA (অগণিত কোষবিশিষ্ট প্রাণী; টিস্যু, অঙ্গ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অঙ্গতন্ত্র গঠন করে)

Grade I. Radiata (দ্বিস্তরী প্রাণী, টিস্যু গঠিত হলেও অঙ্গতন্ত্র অনুপস্থিত; দেহ অরীয় প্রতিসম)
- ❋ 4. Phylum **Cnidaria**
- 5. Phylum Ctenophora

Grade II. Bilateria (ত্রিস্তরী প্রাণী; সুগঠিত অঙ্গতন্ত্র উপস্থিত; দেহ প্রধানত দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম)

Acoelomates (সিলোমবিহীন প্রাণী)
- ❋ 6. Phylum **Platyhelminthes**
- 7. Phylum Gnathostomulida
- 8. Phylum Nemertea

Pseudocoelomates (অপ্রকৃত সিলোমধারী প্রাণী)
- 9. Phylum Rotifera
- 10. Phylum Gastrotricha
- 11. Phylum Kinorhyncha
- ❋12. Phylum **Nematoda**
- 13. Phylum Nematomorpha
- 14. Phylum Acanthocephala
- 15. Phylum Entoprocta
- 16. Phylum Priapulida
- 17. Phylum Loricifera

Eucoelomates (প্রকৃত সিলোমধারী প্রাণী)
- ❋ 18. Phylum **Mollusca**
- ❋ 19. Phylum **Annelida**
- ❋ 20. Phylum **Arthropoda**
- 21. Phylum Echiurida
- 22. Phylum Sipunculida
- 23. Phylum Tardigrada
- 24. Phylum Pentastomida
- 25. Phylum Onychophora
- 26. Phylum Pogonophora
- 27. Phylum Phoronida
- 28. Phylum Ectoprocta
- 29. Phylum Chaetognatha
- 30. Phylum Brachiopoda
- ❋31. Phylum **Echinodermata**
- 32. Phylum Hemichordata
- ❋33. Phylum **Chordata**

তারকা (❋) চিহ্নিত পর্বগুলোকে (৯টি) প্রধান পর্ব (major phylum) হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

প্রাণিজগতের প্রধান বা মেজর (major) পর্বগুলোর নাম এবং এদের প্রজাতি সংখ্যা (Zhang 2013 অনুসরণে)।

	ক্র: নং	প্রধান পর্বের নাম	আবিষ্কৃত প্রজাতির সংখ্যা Zhang (2013)	বাংলাদেশে বর্ণিত প্রজাতির সংখ্যা Ahmed (2008-2009)
NON-CHORDATA	1.	Phylum **Porifera**	8,659	29
	2.	Phylum **Cnidaria**	10,203	102
	3.	Phylum **Platyhelminthes**	29,487	125
	4.	Phylum **Nematoda**	25,033	178
	5.	Phylum **Mollusca**	84,977	477
	6.	Phylum **Annelida**	17,388	98
	7.	Phylum **Arthropoda**	1,257,040	2,483
	8.	Phylum **Echinodermata**	7,550	49
	9.	Phylum **Chordata**	68,626	1,611
		মোট	1,508,963	5,152

www.Educationblog24.Com

প্রাণিজগতের প্রধান পর্বসমূহ (Major Phyla of Animal Kingdom)

ভ্রূণাবস্থায় বা আজীবন দেহের পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা বরাবর দণ্ডাকার, স্থিতিস্থাপক ও নিরেট **নটোকর্ড** (notochord)-এর উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে প্রাণিজগতকে দুটি গ্রুপ (group)-এ ভাগ করা হয়েছে, যেমন-**ননকর্ডাটা** (nonchordata) এবং **কর্ডাটা** (chordata)। যেসব প্রাণীর জীবনে কখনও নটোকর্ড উপস্থিত থাকে না, তাদের **ননকর্ডাটা** বলে। এদের স্নায়ুরজ্জু (nerve cord) অঙ্কীয়, নিরেট ও গ্রন্থিযুক্ত; গলবিলীয় ফুলকারন্ধ্র ও পায়ুপশ্চাৎ লেজ অনুপস্থিত। অন্যদিকে যেসব প্রাণীর দেহে নটোকর্ড থাকে, স্নায়ুরজ্জু পৃষ্ঠীয় ও ফাঁপা, গলবিলীয় ফুলকারন্ধ্র ও পায়ুপশ্চাৎ লেজ উপস্থিত সেগুলোকে **কর্ডাটা** বলে।

ননকর্ডাটা প্রাণিদের শ্রেণিবিন্যাস (পর্ব পর্যন্ত)

ননকর্ডাটা প্রাণিদের নিচে বর্ণিত আটটি (১ থেকে ৮) প্রধান পর্বের (Phylum) অধীনে বর্ণনা করা হয়।

প্রত্যেক পর্বের গ্রিক ও ল্যাটিন নামের শব্দার্থ Hickman *et al.* 2017 অনুসরণে উদ্ধৃত।

Phylum–1 : Porifera (পরিফেরা) বা ছিদ্রাল প্রাণী

[ল্যাটিন, *porus* = pore, ছিদ্র + *fer* = to bear, বহনকারী। ১৮৩৬ সালে Robert Grant সর্বপ্রথম পর্বটির নামকরণ করেন। এ পর্বের শনাক্তকৃত জীবন্ত প্রজাতির সংখ্যা ৮,৬৫৯টি।]

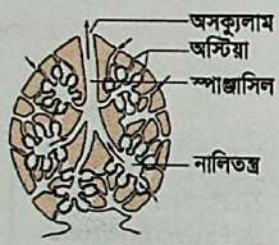

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : প্রাণিদের মধ্যে Porifera পর্বের সদস্যরা প্রাচীনতম ও সরল প্রকৃতির। দেহে অসংখ্য ছিদ্র থাকায় এদের **ছিদ্রাল প্রাণী** বলে। সাধারণভাবে এরা **স্পঞ্জ** (sponge) নামে পরিচিত। এরা দেখতে ডাল-পালাযুক্ত গাছ, ফুলদানি, ঘণ্টা বা বাটির মতো এবং দৈহিক ব্যাস এক মিলিমিটার থেকে প্রায় দুই মিটার। কারও রং অনুজ্জ্বল ধূসর, আবার কোনটি লাল, কমলা, নীল, বেগুনি প্রভৃতি উজ্জ্বল বর্ণের। **অধিকাংশ সামুদ্রিক**। কেবলমাত্র Spongilidae গোত্রের প্রাণীরা মিঠাপানির বাসিন্দা।

পর্ব Porifera-র বৈশিষ্ট্য

১. দেহ অসংখ্য কোষে নির্মিত হলেও কোষগুলো সুবিন্যস্ত হয়ে টিস্যু (tissue) গঠন করে না অর্থাৎ এরা **কোষীয় মাত্রার গঠনবিশিষ্ট প্রাণী**।

২. দেহপ্রাচীর **অস্টিয়া** (ostia) নামক অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত।

৩. দেহে সংবহনতন্ত্রের বিকল্প হিসেবে পানি প্রবাহের জন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ **নালিতন্ত্র** (canal system) দেখা যায়। অস্টিয়াপথে নালিকার মধ্য দিয়ে পানিস্রোতের মাধ্যমে খাদ্য, অক্সিজেন ও শুক্রাণু দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

৪. **স্পিকিউল** (spicule) নামক অসংখ্য চুনময় ক্ষুদ্র কাঁটা অথবা **স্পঞ্জিন** (spongin) নামক এক ধরনের জৈবতন্তু দেহের কাঠামো গঠন করে।

৫. অন্তঃপ্রাচীরে **কোয়ানোসাইট** (choanocyte) নামে বিশেষ ফ্ল্যাজেলাযুক্ত কোষে পরিবেষ্টিত এক বা একাধিক প্রকোষ্ঠ রয়েছে। প্রকোষ্ঠগুলো নালিতন্ত্রে মুক্ত।

৬. নালিতন্ত্র দেহের ভিতরে অবস্থিত **স্পঞ্জোসিল** (spongocoel) নামে একটি প্রশস্ত গহ্বরে মিলিত হয়, এবং শীর্ষপ্রান্তে **অসক্যুলাম** (osculum) নামে একটি বড় প্রান্তিক ছিদ্রপথে দেহের বাইরে উন্মুক্ত হয়।

৭. পূর্ণাঙ্গ প্রাণীরা **নিশ্চল** (sessile); অর্থাৎ কোন বস্তুর সাথে স্থায়ীভাবে যুক্ত থাকে।

৮. জীবনচক্রে সঞ্চরণশীল Amphiblastula অথবা Parenchymula লার্ভা দশা বিদ্যমান।

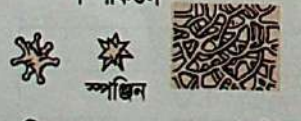

চিত্র ১.১১ : Porifera-র বৈশিষ্ট্য

Scypha gelatinosum (মটকা স্পঞ্জ)

Cliona celata (লাল স্পঞ্জ)

Spongilla lacustris (মিঠাপানির স্পঞ্জ)

Euspongia officinalis (গোসল স্পঞ্জ)

চিত্র ১.১২ : Porifera পর্বের কয়েকটি প্রাণী

www.Educationblog24.Com

Phylum–2 : Cnidaria (নিডারিয়া)

[গ্রিক *knide* = nettle, রোম বা কাঁটা + ল্যাটিন *aria* = connected with, সংযুক্ত। ১৮৮৮ সালে Hatschek পর্বটির নামকরণ করেন। এ পর্বের শনাক্তকৃত জীবন্ত প্রজাতির সংখ্যা ১০,২০৩টি।]

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : Cnidaria পর্বভুক্ত প্রাণীরা একদিকে অরীয় প্রতিসম, অন্যদিকে কোষ-টিস্যু মাত্রার (cell-tissue grade) গাঠনিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রাণী। প্রাণিগুলোর অধিকাংশ নিশ্চল, কিছু প্রজাতি মুক্ত সাঁতারু। সমুদ্র উপকূলে পড়ে থাকা গোল থকথকে জেলির মতো প্রাণিগুলো জেলিফিশ, Cnidaria পর্বেরই মুক্ত সাঁতারু সদস্য। বিচিত্র বর্ণময়তার কারণে এ পর্বের সদস্যরা সমুদ্রকে বর্ণিল রূপদানে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে। প্রবাল ও প্রবাল প্রাচীর গঠনকারী প্রাণীরা এ পর্বেরই সদস্য। এজন্য নিডারিয়ান প্রাণিদের **সমুদ্রের ফুল** (flower of the sea) বলা হয়। পৃথিবীর প্রবাল প্রাচীরগুলোতে বাস করে সামুদ্রিক প্রজাতির ২৫% জীব। প্রবাল প্রাচীর তাই পৃথিবীর অন্যতম রত্নভান্ডার হিসেবে পরিচিত এবং সমুদ্রের Rain Forest নামে অভিহিত।

পর্ব Cnidaria-র বৈশিষ্ট্য

১. প্রাণিগুলো সামান্য **টিস্যু মাত্রার** (tissue grade) বহুকোষী ও অরীয় প্রতিসম প্রাণী।

২. দেহপ্রাচীর দ্বিস্তরী কোষযুক্ত বা **ডিপ্লোব্লাস্টিক** (diploblastic); বাইরের স্তরটি **এপিডার্মিস** এবং ভিতরের স্তর এন্ডোডার্মিস বা **গ্যাস্ট্রোডার্মিস** নামে পরিচিত। উভয় স্তরের মধ্যবর্তীস্থানে থাকে আঠালো জেলির মতো অকোষীয় **মেসোগ্লিয়া** (mesoglea)।

৩. **নেমাটোসিস্ট** (nematocyst) ধারণকারী **নিডোসাইট** (cnidocyte) নামক বিশেষ ধরনের কোষ উপস্থিত। কর্ষিকায় এগুলো সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। নিডারিয়ানদের দংশন অঙ্গাণু (stinging organelles) হচ্ছে নেমাটোসিস্ট। প্রাণী এর সাহায্যে আত্মরক্ষা, খাদ্য গ্রহণ ও দেহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার কাজ করে।

৪. দেহাভ্যন্তরে **সিলেন্টেরন** (coelenteron) নামে একমাত্র **পরিপাক সংবহন গহ্বর** (gastro-vuscular cavity) থাকে যা একটি ছিদ্রপথে বাইরে উন্মুক্ত। ছিদ্রটি মুখ ও পায়ুর কাজ করে।

৫. খাদ্যবস্তু বহিঃকোষীয় ও অন্তঃকোষীয় উভয়ভাবেই পরিপাক হয়।

৬. অনেক প্রজাতি বহুরূপিতা প্রদর্শন করে। বহুরূপী সদস্যদের মৌলিক একক **পলিপ** (polyp) ও **মেডুসা** (medusa)। পলিপ স্থবির ও অযৌন জননক্ষম এবং মেডুসা মুক্ত ও যৌন জননে সক্ষম।

৭. জীবনচক্রে সিলিয়াযুক্ত Plannula লার্ভা দশা রয়েছে।

৮. বিশ প্রজাতির নিডারিয়ান স্বাদু পানির, বাকী সবাই সামুদ্রিক।

চিত্র ১.১৩ : উপরে-*Hydra*-র প্রস্থচ্ছেদ এবং নিচে-নিডোসাইট

Aurelia aurita (জেলি ফিশ)

Tubularia rosa

Porpita porpita (নীল বুতাম)

Gorgonia ventalina (সমুদ্রের পাখা)

Physalia physalis (ভাসমান সন্ত্রাস)

Cerianthus filiformis (টিউব অ্যানিমন)

Pennatula sulcata (সমুদ্রের কলম)

চিত্র ১.১৪ : Cnidaria পর্বের কয়েকটি প্রাণী

www.Educationblog24.Com

Phylum – 3 : Platyhelminthes (প্লাটিহেলমিনথেস) বা চ্যাপ্টা কৃমি

[গ্রিক, *platys* = flat, চ্যাপ্টা + *helminth* = worm, কৃমি। ১৮৭৬ সালে Minot এ পর্বের নামকরণ করেন। এ পর্বের শনাক্তকৃত জীবন্ত প্রজাতির সংখ্যা ২৯,৪৮৭টি।]

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : প্রাণিদের মধ্যে এ পর্বের প্রাণীরাই সরলতম প্রথম ত্রিস্তরী প্রাণী (triploblastic animal)। এদের দেহে সর্বপ্রথম টিস্যু-অঙ্গ মাত্রার (tissue-organ grade) গঠন দেখা যায়। এসব প্রাণী পাতার মতো উপর-নিচে চাপা বা ফিতার মতো লম্বা বলে চ্যাপ্টা কৃমি (flat worms) নামে পরিচিত। অধিকাংশ চ্যাপ্টা কৃমি মানুষ ও অন্যান্য প্রাণিদেহে অন্তঃপরজীবী হিসেবে বাস করে। কিছু কৃমি পানিতে অথবা ভেজা মাটিতে স্বাধীনভাবে অবস্থান করে। অনেক চ্যাপ্টা কৃমি আণুবীক্ষণিক, তবে ৩০ মিটার পর্যন্ত লম্বা চ্যাপ্টা কৃমির কথাও জানা গেছে।

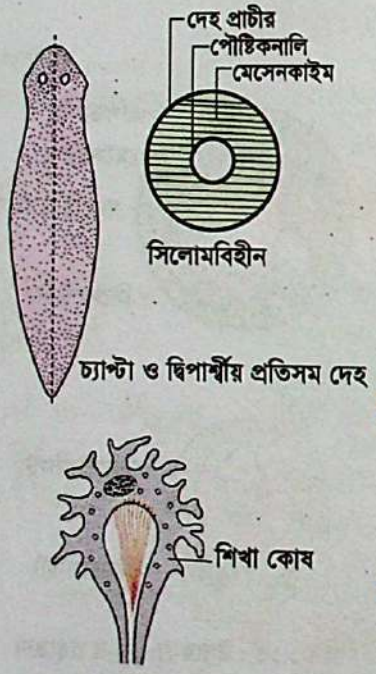

চিত্র ১.১৫ : Platyhelminthes পর্বের বৈশিষ্ট্য

পর্ব Platyhelminthes-এর বৈশিষ্ট্য

১. দেহ নরম, দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম ও পাতা বা ফিতার মতো পৃষ্ঠ-অঙ্কীয়ভাবে চাপা।

২. দেহত্বক সিলিয়াযুক্ত এপিডার্মিস (ciliated epidermis) অথবা কিউটিকল (cuticle)-এ আবৃত।

৩. ত্রিস্তরী প্রাণী হলেও এরা অ্যাসিলোমেট (সিলোমবিহীন)।

৪. একমাত্র পরিপাকনালি ছাড়া অন্তঃস্থ আর কোন গহ্বর নেই।

৫. বিভিন্ন অঙ্গের মাঝে ফাঁকা স্থানগুলো প্যারেনকাইমা (parenchyma) নামক যোজক টিস্যু বা মেসেনকাইম (mesenchyme)-এ পূর্ণ থাকে।

৬. অনেক ক্ষেত্রে বাহ্যিক চোষক (sucker) বা হুক (hook) অথবা উভয়ই উপস্থিত।

৭. রক্ত সংবহন ও শ্বসনতন্ত্র অনুপস্থিত; রেচনতন্ত্র শাখা-প্রশাখাযুক্ত রেচননালি ও শিখা কোষ (flame cell) নিয়ে গঠিত।

৮. অধিকাংশ পরজীবী। অনেক সদস্য সরাসরি দেহতলের সাহায্যে পুষ্টি গ্রহণ করে। কিছুসংখ্যক মুক্তজীবী।

৯. এ পর্বের প্রাণীরা উভলিঙ্গ; নিষেক অভ্যন্তরীণ এবং পরিস্ফুটন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ধরনের।

১০. চ্যাপ্টা কৃমির জীবনচক্রে অনেক ধরনের লার্ভা (larva) দশা থাকে।

Schistosoma mansoni (রক্ত কৃমি) | *Bipalium kewense* (হাতুরীমস্তক চ্যাপ্টা কৃমি) | *Fasciola hepatica* (ভেড়ার যকৃত কৃমি) | *Gyrodactylus corti* (স্যালমন কৃমি) | *Taenia solium* (শূকরের ফিতা কৃমি)

চিত্র ১.১৬ : Platyhelminthes পর্বের কয়েকটি প্রাণী

www.Educationblog24.Com

Phylum – 4 : Nematoda/Nemathelminthes (নেমাটোডা/নেমাথেলমিনথেস) বা গোল কৃমি

[গ্রিক, *nematos* = thread, সুতা + *eidos* = form, আকৃতি + *helminth* = worm, কৃমি। ১৮৫৯ সালে Gogenbaur পর্বটির নামকরণ করেন। Nematoda পর্বের শনাক্তকৃত জীবন্ত প্রজাতির সংখ্যা ২৫,০৩৩টি।]

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : Nematoda পর্বের প্রাণিগুলো **সুতা কৃমি** (thread worm) বা **গোল কৃমি** (round worm) নামে পরিচিত। এরা **অঙ্গ-তন্ত্র** গঠন মাত্রার (organ-system grade) প্রাণী। এ পর্বের শনাক্তকৃত প্রায় ২৫,০০০ প্রজাতির কৃমি আছে যার অধিকাংশই বিভিন্ন জীবদেহে পরজীবী। অপ্রকৃত সিলোমেট প্রাণীর মধ্যে নেমাটোডের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। বাস্তুতান্ত্রিক সকল পরিবেশে গোল কৃমি বিস্তৃত। এ পর্বের পরজীবী সদস্যরা মানুষ, গবাদি পশু ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে। মুক্তজীবী প্রাণীরা ব্যাকটেরিয়া, ঈস্ট, ছত্রাক ও শৈবাল খেয়ে জীবনধারণ করে।

চিত্র ১.১৭ : Nematoda পর্বের বৈশিষ্ট্য

পর্ব Nematoda-র বৈশিষ্ট্য

১. দেহ নলাকার, দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম, উভয় প্রান্তই ক্রমশ সরু ও মধ্যভাগ চওড়া; আণুবীক্ষণিক থেকে এক মিটার পর্যন্ত লম্বা।

২. প্রাণীরা **স্যুডোসিলোমেট** (অপ্রকৃত সিলোমযুক্ত) ও **অখণ্ডকায়িত** (unsegmented)।

৩. দেহ নমনীয়; **ইলাস্টিন** (elastin) নির্মিত অকোষীয়, পুরু প্রতিরোধক্ষম **কিউটিকল** (cuticle)-দিয়ে আবৃত।

৪. পৌষ্টিকনালি সোজা ও শাখাহীন এবং মুখ থেকে পায়ু পর্যন্ত প্রসারিত। এ কারণে এসব প্রাণীর দেহকে 'নলের ভিতর নল' ('tube within a tube') ধরনের গঠনের মতো দেখায়।

৫. মুখছিদ্র সাধারণত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ওষ্ঠে পরিবৃত।

৬. শ্বসনতন্ত্র ও সংবহনতন্ত্র অনুপস্থিত।

৭. অধিকাংশ প্রাণী একলিঙ্গ, **যৌন দ্বিরূপতা** (sexual dimorphism) দেখা যায়।

৮. স্থলচর বা জলচর, মুক্তজীবী বা পরজীবী প্রাণী।

[যৌন দ্বিরূপতা : একই প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষ সদস্য বর্ণ, আকার, আকৃতি বা গাঠনিকভাবে পৃথক হলে তাকে যৌন দ্বিরূপতা বলে।]

Loa loa (চোখ কৃমি) | *Ascaris lumbricoides* (গোল কৃমি) | *Trichinella spiralis* (ট্রাইকিনেলা কৃমি) | *Wuchereria bancrofti* (ফাইলেরিয়া কৃমি)

চিত্র ১.১৮ : Nematoda পর্বের কয়েকটি প্রাণী

www.Educationblog24.Com

Phylum – 5 : Mollusca (মলাস্কা) বা কম্বোজ প্রাণী

[ল্যাটিন, *molluscus* = soft, নরম। ১৭৫৮ সালে Linnaeus এ পর্বের নামকরণ করেন। এ পর্বের শনাক্তকৃত জীবন্ত প্রজাতির সংখ্যা ৮৪,৯৭৭টি।]

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : Mollusca প্রাণিজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম পর্ব। প্রাণীর বর্তমান সংখ্যাগত দিক থেকে Arthropoda পর্বের পরেই এদের অবস্থান। এ পর্বের সদস্যরা অনন্য ধরনের খোলকবাহী ননকর্ডেট প্রাণী। ঝিনুক, শামুক, অক্টোপাস, সেপিয়া, ললিগো এ পর্বের পরিচিত সদস্য। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে স্বচ্ছল ব্যক্তিরা খোলক সংগ্রহ করতেন। এক সময় বাংলাদেশের স্বনামধন্য স্কুলের পাঠ্যক্রমে শিক্ষার্থীদের জন্য খোলক সংগ্রহের প্রচলন ছিল।

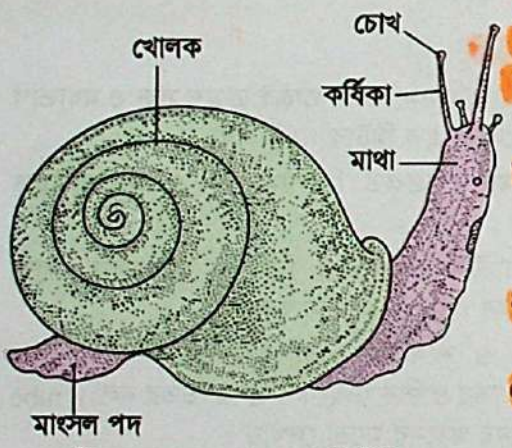

চিত্র ১.১৯ : Mollusca-র বৈশিষ্ট্য

পর্ব Mollusca-র বৈশিষ্ট্য

১. দেহ নরম, মাংসল ও অখণ্ডকায়িত।

২. সিলোমেট, অধিকাংশ দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম (গ্যাস্ট্রোপোডা ব্যতীত) এবং সুস্পষ্ট মাথাবিশিষ্ট।

৩. **ম্যান্টল** (mantle) নামক পাতলা আবরণে দেহ আবৃত। ম্যান্টল থেকে ক্ষরিত পদার্থে চুনময় **খোলক** (shell) গঠিত হয়। সাধারণত খোলকের মধ্যে প্রাণী অবস্থান করে।

৪. দেহগহ্বর খুব সংক্ষিপ্ত ও **হিমোসিল** (haemocoel)-এ পরিণত হয়েছে।

৫. দেহের অঙ্কীয়দেশে মোটা চামড়া প্রশস্ত মাংসল পিন্ডের মতো **পদ** (foot)-এ রূপান্তরিত হয়েছে।

৬. পৌষ্টিকনালি প্যাঁচানো; কখনও U আকৃতির। মুখবিবরে **কাইটিন** (chitin) নির্মিত একটি রেতি-জিহ্বা বা র‍্যাডুলা (radula) থাকে (Bivalvia ব্যতীত)।

৭. ফুলকা (টেনিডিয়া) অথবা ফুসফুস অথবা উভয় অংশ, অথবা ম্যান্টল দিয়ে শ্বসন সম্পন্ন হয়।

৮. রক্তে **হিমোসায়ানিন** (haemocyanin) ও **অ্যামিবোসাইট** (amoebocyte) কণিকা থাকে।

৯. পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত হৃৎযন্ত্র, রক্তনালি ও হিমোসিল উভয়ই উপস্থিত অর্থাৎ অর্ধমুক্ত সংবহনতন্ত্র দেখা যায়।

১০. অধিকাংশ প্রাণী সমুদ্রের লবণাক্ত পানিতে ও কিছু সদস্য স্বাদু পানিতে, ডাঙ্গায় ও গর্তে বাস করে।

Uroteuthis duvaucelli (সমুদ্রের তীর) | *Lamellidens marginalis* (স্বাদু পানির ঝিনুক) | *Pinctada vulgaris* (মুক্তা ঝিনুক) | *Pila globosa* (আপেল শামুক) | *Octopus vulgaris* (অক্টোপাস)

চিত্র ১.২০ : Mollusca পর্বের কয়েকটি প্রাণী

www.Educationblog24.Com

Phylum – 6 : Annelida (অ্যানিলিডা) বা অঙ্গুরীমাল

[ল্যাটিন, *annelus* = little ring, ছোট আংটি + *ida* = form, আকৃতি। ১৮০৯ সালে Lamarck এ পর্বের নামকরণ করেন। এ পর্বের শনাক্তকৃত জীবন্ত প্রজাতির সংখ্যা ১৭,৩৮৮টি।]

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : অ্যানিলিড প্রাণী দৈহিক গড়নের দিক থেকে অনন্য। অঙ্গ-তন্ত্র মাত্রার গঠন ছাড়াও প্রাণিগুলো দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম ও ত্রিস্তরবিশিষ্ট। অ্যানিলিডে আগের পর্বগুলোর চেয়ে অধিকতর কেন্দ্রীভূত স্নায়ুতন্ত্র এবং জটিলতর সংবহনতন্ত্র বিবর্তনের গতিপথে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। পৃথিবীতে অ্যানিলিড সদস্যরা ব্যাপক বিস্তৃত, কিছু প্রজাতি পৃথিবীর সব দেশেই পাওয়া যায়। পলিকিটজাতীয় অ্যানিলিডগুলো অধিকাংশই সামুদ্রিক, সমুদ্রের তলদেশে বা পৃষ্ঠতলে বিচরণ করে। কেঁচো ও জোঁক জাতীয় সদস্যরা স্বাদুপানিবাসী বা স্থলচর। স্থলচর সদস্যগুলো কাদা বা বালিতে গর্তবাসী, কিংবা ভেজা জায়গায় পাতার নিচে বাস করে। অনেক জোঁক প্রজাতি রক্তপায়ী। বিভিন্ন প্রজাতির অ্যানিলিড গোষ্ঠী পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

পর্ব Annelida-র বৈশিষ্ট্য

১. দেহ লম্বা, নলাকার, দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম, এপিথেলিয়াম নিঃসৃত পাতলা **কিউটিকল**-এ আবৃত এবং প্রকৃত সিলোমযুক্ত।

২. **প্রকৃত খন্ডকায়ন** (true segmentation) উপস্থিত, আংটির মতো অনেকগুলো একই রকম খণ্ডক নিয়ে দেহ গঠিত। এদের চলন অঙ্গ কাইটিনময় **সিটি** (setae) বা পেশল **প্যারাপোডিয়া** (parapodia)।

৩. দেহের প্রায় প্রতিটি খণ্ডকে অবস্থিত **নেফ্রিডিয়া** (nephridia) নামক প্যাঁচানো নালিকা প্রধান রেচন অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।

৪. রক্ত সংবহনতন্ত্র **বদ্ধ** (closed) প্রকৃতির, রক্তের বর্ণ লাল। রক্তরসে হিমোগ্লোবিন, হিমোএরিথ্রিন অথবা ক্লোরোক্রুয়োরিন দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে।

৫. পৌষ্টিকনালি নলাকার ও সম্পূর্ণ; মুখ ও পায়ুছিদ্র সমন্বিত।

৬. পরোক্ষ পরিস্ফুটনের ক্ষেত্রে মুক্ত সাঁতারু **ট্রোকোফোর** (trochophore) নামক লার্ভার বিকাশ ঘটে।

৭. অ্যানিলিড সদস্যরা মিঠা পানি, নোনা পানি বা স্থলে বাস করে। অনেকে স্বাধীনজীবী, কিছু সংখ্যক পরজীবীও বটে।

চিত্র ১.২১ : Annelida পর্বের বৈশিষ্ট্য

Metaphire posthuma (কেঁচো) | *Arenicola marina* (স্যান্ড ওয়ার্ম) | *Amphitrite ornata* (অরনেট ওয়ার্ম) | *Pontopdella muricata* (সামুদ্রিক চোষক) | *Tubifex tubifex* (রক্তকীট) | *Hirudinaria medicinalis* (জোঁক)

চিত্র ১.২২ : Annelida পর্বের কয়েকটি প্রাণী

www.Educationblog24.Com

Phylum – 7 : Arthropoda (আর্থ্রোপোডা) বা সন্ধিপদী প্রাণী

[গ্রিক, *arthron* = joint, সন্ধি + *podos* = foot, পা। ১৮৪৮ সালে von Siebold এ পর্বের নামকরণ করেন। এ পর্বের শনাক্তকৃত জীবন্ত প্রজাতির সংখ্যা ১,২৫৭,০৪০টি।]

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : Arthropoda হচ্ছে প্রাণিজগতের বৃহত্তম পর্ব। এপর্যন্ত নথিভুক্ত পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ প্রাণী এ পর্বের অন্তর্গত। শুধু সংখ্যাগত দিক থেকে নয়, দেহগঠন, বর্ণময়তা, বসতি, স্বভাব প্রভৃতি বৈচিত্র্যেও এসব প্রজাতি অনন্য অবস্থান দখল করে আছে। পৃথিবীর নদী-নালা, খাল-বিল, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র-মোহনা, বরফ-মরুজ এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে আর্থ্রোপোড সদস্য পাওয়া যাবে না। এরা সর্বভূক, মুক্তজীবী বা পরজীবী। এদের চলন, শ্বসন, রক্ত-সংবহন প্রভৃতি তন্ত্রও বৈচিত্র্যময়। আর্থ্রোপোডের সামাজিক জীবন প্রাণিজগতে অনন্য ও বিস্ময়কর নজির স্থাপন করেছে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় অত্যন্ত কার্যক্ষম বলে আর্থ্রোপোড সদস্যরা পরিবেশ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে পেরেছে।

পর্ব Arthropoda-র বৈশিষ্ট্য

১. দেহ সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গবিশিষ্ট, দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম, খণ্ডকায়িত এবং **ট্যাগমাটা** (tagmata)-য় (বিভিন্ন অংশ যেমন-মস্তক, বক্ষ ও উদর) বিভক্ত।

২. মস্তকে একজোড়া বা দুজোড়া **অ্যান্টেনা** (antenna) ও সাধারণত একজোড়া **পুঞ্জাক্ষি** (compound eyes) থাকে।

৩. বহিঃকঙ্কাল **কাইটিন** (chitin) নির্মিত এবং নিয়মিত মোচিত হয়।

৪. সিলোম সংক্ষিপ্ত ও অধিকাংশ দেহগহ্বর রক্তে পূর্ণ **হিমোসিল** (haemocoel)।

৫. পৌষ্টিকতন্ত্র সম্পূর্ণ। উপাঙ্গ পরিবর্তিত হয়ে **মুখোপাঙ্গ** (mouth parts) গঠিত হয় যা বিভিন্ন খাদ্য গ্রহণে অভিযোজিত।

৬. রক্ত সংবহনতন্ত্র **উন্মুক্ত** (open); এটি পৃষ্ঠীয় সংকোচনশীল হৃৎযন্ত্র, ধমনি এবং হিমোসিল নিয়ে গঠিত।

৭. রেচন অঙ্গ **ম্যালপিজিয়ান নালিকা** (malpighian tubule)। এছাড়াও রয়েছে **কক্সাল** (coxal), **অ্যান্টেনাল** (antennal) বা **ম্যাক্সিলারি** (maxillary) গ্রন্থি।

৮. স্ত্রী-পুরুষ পৃথক, সাধারণত অন্তঃনিষেক সম্পন্ন হয় এবং প্রায় ক্ষেত্রেই **রূপান্তর** (metamorphosis) ঘটে।

৯. এরা স্থলচর, পানিচর, মুক্তজীবী, নিশ্চল, সহবাসী বা পরজীবী হিসেবে বাস করে।

চিত্র ১.২৩ : Arthropoda -র বৈশিষ্ট্য

চিত্র ১.২৪ : Arthropoda পর্বের কয়েকটি প্রাণী

www.Educationblog24.Com

Phylum-8 : Echinodermata (একাইনোডার্মাটা) বা কণ্টকত্বক প্রাণী

[ল্যাটিন, *echinatus* = spinous, কাঁটাময় + গ্রিক, *derma* = skin, ত্বক + *ata* = to bear, বহন করা। ১৭৩৪ সালে Jacob Klein এর নামকরণ করেন। এ পর্বের শনাক্তকৃত জীবন্ত প্রজাতির সংখ্যা ৭,৫৫০টি।]

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : সমুদ্র তারার (sea star) ছবির মধ্য দিয়েই Echinodermata পর্ব সবচেয়ে বেশি পরিচিতি পেয়েছে। সমুদ্র তারা ছাড়াও এ পর্বে রয়েছে ব্রিটল তারা, সাগর আর্চিন, সমুদ্র শসা, সমুদ্র পদ্ম প্রভৃতি প্রাণী। কোনোটি গোল, অন্যগুলো শসা বা তারার মতো দেখতে। এসব প্রাণী ত্রিস্তরী, প্রকৃত-সিলোমেট ও অঙ্গ-তন্ত্র মাত্রার গঠন সম্বলিত প্রজাতি। সকল একাইনোডার্ম সদস্য কাঁটাময় ত্বকবিশিষ্ট। ত্বকের নিচে শায়িত চুনময় অন্তঃকঙ্কালিক প্লেট (calcareous endoskeletal plates) থেকে এসব কাঁটা উদগত হয়। কাঁটাগুলো বহিঃকঙ্কাল, আর প্লেটগুলো হচ্ছে অন্তঃকঙ্কাল। এ পর্বের প্রজাতিগুলো অসমোরেগুলেশনে অক্ষম বলে মোহনায় খুব কম পাওয়া যায়, বরং সব সমুদ্রের পৃষ্ঠতল থেকে শুরু করে অতল পর্যন্ত সবখানে বিস্তৃত। গভীর সমুদ্রে একাইনোডার্ম ধরনের প্রাণী বেশি দেখা যায়। মুক্তজীবী ও সহজীবী প্রজাতি থাকলেও পরজীবী একাইনোডার্ম নেই।

চিত্র ১.২৫ : Echinodermata পর্বের বৈশিষ্ট্য

পর্ব Echinodermata-র বৈশিষ্ট্য

১. পূর্ণাঙ্গ প্রাণী **পঞ্চঅরীয় প্রতিসম** (pentaradial symmetry), অখণ্ডকায়িত, তারকাকার, গোলাকার, চাকতির মতো অথবা লম্বাকৃতির, কিন্তু লার্ভা দশায় দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম।

২. দেহ **কণ্টকময়**, স্পাইন (spine) ও পেডিসিলারি (pedicellariae) নামক বহিঃকঙ্কালযুক্ত।

৩. দেহ **মৌখিক** (oral) ও **বিমৌখিক** (aboral) তলে বিন্যস্ত; মৌখিক তলে পাঁচটি **অ্যাম্বুল্যাক্রাল খাদ** (ambulacral grooves) উপস্থিত।

৪. দেহের ভিতরে সিলোম থেকে সৃষ্ট অনন্য গড়নের **পানি সংবহনতন্ত্র** (water vuscular system) রয়েছে। এর সংশ্লিষ্ট নালিকা পদ বা **টিউব ফিট** (tube feet) এদের চলন অঙ্গ। এ তন্ত্রটি চলন ছাড়াও শ্বসন, খাদ্য আহরণেও সাহায্য করে।

৫. রক্ত সংবহনতন্ত্র অনুপস্থিত তবে **হিমাল** (haemal) ও **পেরিহিমালতন্ত্র** সংবহনতন্ত্রের কাজ করে।

৬. রেচনতন্ত্র নেই।

৭. ত্বকীয় ফুলকা, নালিকা পা বা শ্বসনবৃক্ষ ইত্যাদি দিয়ে শ্বসন সম্পন্ন হয়।

৮. একলিঙ্গ প্রাণী, নিষেক বাহ্যিক, জীবনচক্রে মুক্ত সাঁতারু লার্ভা আছে।

৯. **সকল সদস্যই সামুদ্রিক**।

চিত্র ১.২৬ : Echinodermata পর্বের কয়েকটি প্রাণী

www.Educationblog24.Com

Phylum – 9 : Chordata (কর্ডাটা)

[ল্যাটিন, *chorda* = cord, রজ্জু + গ্রিক *ata* = to bear, বহন করা। ১৮৮৫ সালে Bateson সর্বপ্রথম এ পর্বের নামকরণ করেন। এ পর্বের শনাক্তকৃত জীবন্ত প্রজাতির সংখ্যা ৬৮,৬২৬টি।]

যেসব প্রাণীর জীবনে কোন না কোন পর্যায়ে পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা বরাবর দণ্ডাকার ও স্থিতিস্থাপক 'নটোকর্ড' থাকে তাদের কর্ডাটা বলে। এদের স্নায়ুরজ্জু পৃষ্ঠীয় ও ফাঁপা। জীবনের যেকোন পর্যায়ে গলবিলের দুপাশে কয়েকজোড়া **ফুলকা রন্ধ্র** (gill slits) থাকে। এদের হৃৎপিণ্ড অঙ্কীয়দেশে অবস্থান করে। একটি মাত্র ও সর্বশেষ পর্বের অধীনে কর্ডাটা প্রাণিদের বর্ণনা করা হয়।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : মানুষের কাছে Chordata পর্বের প্রাণীই সবচেয়ে বেশি পরিচিত। ক্ষুদ্রাকায় কাচকি মাছ থেকে মানুষ পর্যন্ত সব প্রাণী এ পর্বের অন্তর্ভুক্ত। বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় আপাতত শেষ প্রান্তে রয়েছে এ পর্ব। তবে উৎপত্তির সময়কার প্রাণিদের দেহগড়ন বর্তমান পর্যায়ের স্তন্যপায়ীতে এসে যে জটিল রূপ ধারণ করেছে তা সুস্পষ্ট। এ পর্বের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত পর্ব হচ্ছে Echinodermata এবং Hemichordata। অন্তঃকঙ্কাল, ছিদ্রাল গলবিল, উন্নত **মস্তিষ্ক**, জোড় বিশেষ সংবেদ অঙ্গ ও জোড় উপাঙ্গসমৃদ্ধ এ প্রাণিকূল উৎপত্তির পর দ্রুত পৃথিবীর সমস্ত বাস্তুতন্ত্রে ছড়িয়ে এক শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে। তার ফলশ্রুতিতে সবশেষে মানুষের উদ্ভবের মধ্য দিয়ে পৃথিবী জয় সমাপ্ত হয়েছে।

পর্ব Chordata-র বৈশিষ্ট্য

১. **নটোকর্ড :** ভ্রূণাবস্থায় অথবা আজীবন কর্ডেটের পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা বরাবর দণ্ডাকার ও স্থিতিস্থাপক নিরেট নটোকর্ড (notochord; গ্রিক, *noton* = back, পিঠ + ল্যাটিন, *chorda* = cord, রজ্জু) থাকে। উন্নত প্রাণিদের পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় এটি **মেরুদন্ড** (vertebral column) দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়। এসব প্রাণিকে তখন **মেরুদণ্ডী প্রাণী** (vertebrates) নামে অভিহিত করা হয়।

২. **স্নায়ুরজ্জু :** নটোকর্ডের ঠিক উপরে লম্ব অক্ষ বরাবর ফাঁপা, নলাকার, **স্নায়ুরজ্জু** (nerve cord) থাকে। মেরুদন্ডী প্রাণিদের ক্ষেত্রে স্নায়ুরজ্জুটি পরিবর্তিত হয়ে সম্মুখপ্রান্তে **মস্তিষ্ক** (brain) ও পশ্চাতে **সুষুম্নাকান্ড** (spinal cord) গঠন করে।

৩. **গলবিলীয় ফুলকা রন্ধ্র :** জীবনের যে কোনো দশায় বা আজীবন কর্ডেটে গলবিলের দুপাশে কয়েক জোড়া **ফুলকা রন্ধ্র** (gill slits) থাকে (উন্নত কর্ডেটে ফুলকা রন্ধ্রের বিলোপ ঘটে)।

৪. **এন্ডোস্টাইল :** গলবিলের নিচে **এন্ডোস্টাইল** (endostyle) নামক অঙ্গ থাকে, এটি পরবর্তীতে থাইরয়েড গ্রন্থিতে রূপান্তরিত হয়।

৫. **রক্ত সংবহন তন্ত্র :** কর্ডেটদের রক্ত সংবহনতন্ত্র বদ্ধ ধরনের; অর্থাৎ রক্ত সর্বদাই রক্ত বাহিকা ও হৃৎযন্ত্রের ভিতর আবদ্ধ থেকেই প্রবাহিত হয়, কখনোই দেহগহ্বরে মুক্ত হয় না। রক্তের লোহিত কণিকায় **হিমোগ্লোবিন** থাকে। এদের সংবহনতন্ত্রে **পোর্টালতন্ত্র** বিদ্যমান।

চিত্র ১.২৭ : কর্ডেটদের মৌলিক দেহগঠন

৬. **হৃৎপিণ্ডের অবস্থান :** কর্ডেটে হৃৎপিন্ড অঙ্কীয়দেশে অবস্থান করে।

৭. **পার্শ্বপদ :** মেরুদন্ডীদের দুজোড়া পার্শ্বপদ থাকে যা অন্তঃকঙ্কালে অবলম্বিত।

৮. **লেজ :** ভ্রূণ দশায় পায়ুর পশ্চাতে পেশল স্থিতিস্থাপক লেজ (post-anal tail) থাকে। অনেক ক্ষেত্রে এটিও পরবর্তীতে বিলীন হয়ে যায়।

৯. **খণ্ডকায়ন :** কর্ডেটের খণ্ডকায়ন দেহপ্রাচীর, মস্তিষ্ক ও লেজে সীমাবদ্ধ থাকে, সিলোম পর্যন্ত পৌঁছায় না।

www.Educationblog24.Com

প্রাণিজগতের প্রধান পর্বসমূহের অনন্য বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ

পর্বের নাম	অনন্য বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
Porifera	১. দেহ প্রাচীর **অস্টিয়া** নামক অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত; অন্তঃপ্রাচীরে **কোয়ানোসাইট** নামক কোষ থাকে। ২. দেহাভ্যন্তরে বিশেষ ধরনের **নালিতন্ত্র** দেখা যায়। ৩. দেহে চুনময় **স্পিকিউল** ও **স্পঞ্জিন** নামক জৈবতন্তু বিদ্যমান।	*Spongilla locustris* (মিঠা পানির স্পঞ্জ) *Euspongia officinalis* (গোসল স্পঞ্জ)
Cnidaria	১. দ্বিস্তরী প্রাণী; বাইরের এপিডার্মিস ও ভিতরের এন্ডোডার্মিস নিয়ে দেহ প্রাচীর গঠিত। ২. নেমাটোসিস্ট ধারণকারী **নিডোসাইট** কোষ পাওয়া যায়। ৩. দেহাভ্যন্তরে **সিলেন্টেরন** নামের একটি কেন্দ্রীয় গহ্বর থাকে।	*Aurelia aurita* (জেলি ফিশ) *Pennatula sulcata* (সমুদ্রের কলম)
Platyhelminthes	১. দেহ পৃষ্ঠ-অঙ্কীয়ভাবে চাপা, **চোষক** বা **হুক** যুক্ত। ২. নরম **কিউটিকুলার এপিডার্মিস** দিয়ে দেহ আবৃত। ৩. **সিলোমবিহীন** প্রাণী; রেচন অঙ্গে **শিখাকোষ** থাকে।	*Fasciola hepatica* (যকৃত কৃমি) *Taenia solium* (ফিতা কৃমি)
Nematoda	১. দেহ কীট আকৃতির, নলাকার এবং উভয় প্রান্ত ক্রমশ সরু। ২. দেহ নমনীয় ইলাস্টিন নির্মিত **কিউটিকল** দিয়ে আবৃত। ৩. প্রাণীরা **অপ্রকৃত সিলোমযুক্ত** ও অখন্ডকায়িত।	*Ascaris lumbricoides* (গোল কৃমি) *Loa loa* (চোখ কৃমি)
Mollusca	১. দেহ নরম, অখন্ডকায়িত এবং **ম্যান্টল** নামক পর্দা দিয়ে আবৃত। ২. দেহের অঙ্কীয় দিকে পেশিবহুল **পদ** বিদ্যমান। ৩. পৌষ্টিকনালি প্যাঁচানো; কখনও "U" আকৃতির।	*Pila globosa* (আপেল শামুক) *Octopus vulgaris* (অক্টোপাস)
Annelida	১. প্রকৃত সিলোমযুক্ত প্রাণী; দেহ আংটির মতো একাধিক সদৃশ **খন্ডক** নিয়ে গঠিত। ২. চলনাঙ্গ **সিটি** বা **প্যারাপোডিয়া** অথবা অনুপস্থিত। ৩. দেহের প্রায় প্রত্যেক খন্ডকে **নেফ্রিডিয়া** নামক রেচন অঙ্গ রয়েছে।	*Metaphire posthuma* (কেঁচো) *Hirudinaria medicinalis* (জোঁক)
Arthropoda	১. দেহ **কাইটিন** নির্মিত শক্ত বহিঃকঙ্কাল দিয়ে আবৃত এবং সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গবিশিষ্ট। ২. দেহ গহ্বর রক্ত দিয়ে পূর্ণ থেকে **হিমোসিল** গঠন করে। ৩. মস্তকে সাধারণত একজোড়া **অ্যান্টিনি** ও একজোড়া **পুঞ্জাক্ষি** থাকে।	*Periplaneta americana* (তেলাপোকা) *Musca domestica* (গৃহ মাছি)
Echinodermata	১. দেহ **কন্টকময়** ও পেডিসিলারিযুক্ত অমসৃণ বহিঃকঙ্কাল দিয়ে আবৃত। ২. পূর্ণাঙ্গ প্রাণী অরীয় বা পঞ্চঅরীয় প্রতিসম, লার্ভা দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম। ৩. অনন্য গড়নের পানি সংবহনতন্ত্র রয়েছে এবং এর সংশ্লিষ্ট **নালিকা পদ** এদের চলন অঙ্গ।	*Astropecten euryacanthus* (স্টার ফিশ) *Antedon bifida* (পালক স্টার)
Chordata	১. জীবনের যেকোন দশায় একটি স্থিতিস্থাপক **নটোকর্ড** থাকে। ২. একটি পৃষ্ঠীয় ফাঁপা ও নলাকার **স্নায়ুরজ্জু** পৌষ্টিকনালির পৃষ্ঠদেশে প্রসারিত থাকে। ৩. জীবনের কোন দশায় গলবিলীয় **ফুলকা রন্ধ্র** উপস্থিত।	*Tenualosa ilisha* (ইলিশ মাছ) *Homo sapiens* (মানুষ)

www.Educationblog24.Com

Chordata পর্বের শ্রেণিবিন্যাস (শ্রেণি পর্যন্ত)

Hickman *et al.* (2017) অনুসৃত প্রচলিত শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী Chordata পর্বের শ্রেণিবিন্যাসটি ছক আকারে দেখানো হলো। প্রাণিগোষ্ঠীগুলোর প্রজাতি সংখ্যাও Hickman *et al.* (2017) অনুসৃত। Amphibia থেকে Mammalia-র প্রজাতি-সংখ্যা মূল উৎস সংখ্যা থেকে নেয়া হয়েছে।

Phylum : Chordata

- **Subphylum-1 : Urochordata**
  - Class-1 : Ascidiacea
  - Class-2 : Thaliacea
  - Class-3 : Larvacea
- **Subphylum-2 : Cephalochordata**
- **Subphylum-3 : Vertebrata**
  - **Superclass : Cyclostomata**
    - Class-1 : Myxini
    - Class-2 : Petromyzontida
  - **Superclass : Gnathostomata**
    - Class-1 : Chondrichthyes
    - Class-2 : Actinopterygii
    - Class-3 : Sarcopterygii
    - Class-4 : Amphibia
    - Class-5 : Reptilia
    - Class-6 : Aves
    - Class-7 : Mammalia

Urochordata ও Cephalochordata-র অন্তর্গত প্রাণিদের দেহ সরল প্রকৃতির এবং এদের মেরুদণ্ড গঠিত হয় না বলে এদেরকে প্রোটোকর্ডাটা (Protochordata) বা আদি কর্ডাটা বলা হয়।

উপপর্ব বা Subphylum –1 : Urochordata (ইউরোকর্ডাটা ; গ্রিক, *oura* = লেজ + *chorda* = রজ্জু)

প্রায় ৩,০০০ টি প্রজাতি নিয়ে এ উপপর্ব গঠিত। পৃথিবীর সব সমুদ্র উপকূলে অগভীর পানিতে এদের পাওয়া যায়। কিছু প্রজাতি সাইফন (siphon) দিয়ে সজোরে পানি উৎসারিত করে বলে এদের সাগর ফোয়ারা (sea squirt) নামে ডাকা হয়।

বৈশিষ্ট্য

১. পরিণত প্রাণীতে নটোকর্ড থাকে না, লার্ভা দশায় কেবল লেজে নটোকর্ড থাকে।
২. পরিণত প্রাণী নিশ্চল এবং স্থায়ীভাবে নিমজ্জিত কোনো বস্তুর সঙ্গে আটকে থাকে, কিন্তু লার্ভা মুক্ত সাঁতারু।
৩. দেহ সেলুলোজ নির্মিত টিউনিক (tunic) বা টেস্ট (test) নামক আচ্ছাদনে আবৃত।
৪. সকলেই সামুদ্রিক এবং সমুদ্রের তলদেশে একক বা কলোনি গঠন করে বাস করে।

Subphylum Urochordata নিচে বর্ণিত ৩টি Class বা শ্রেণিতে বিভক্ত।

Class – 1: Ascidiacea (অ্যাসিডিয়াসিয়া) : এ শ্রেণিভুক্ত প্রাণীর দেহ স্ফীতকায় বা নলাকার। দেহের আবরণ স্থায়ী, পুরু ও অর্ধস্বচ্ছ। পরিণত প্রাণীতে লেজ থাকে না। যেমন– *Ascidia mentula, Molgula tubifera* প্রভৃতি।

Class – 2: Thaliacea (থ্যালিয়েসিয়া) : এ শ্রেণিভুক্ত সদস্যরা দেখতে লেবু বা পিপে আকৃতির। দেহের আবরণ পাতলা ও স্বচ্ছ। পরিণত প্রাণী লেজবিহীন। যেমন– *Salpa maxima, Doliolum rarum* প্রভৃতি।

Class –3: Larvacea (লার্ভেসিয়া) : এ শ্রেণির প্রজাতিরা বাঁকা ব্যাঙাচি আকৃতির। দেহের আবরণ সাময়িক, জিলেটিনের মতো ও স্বচ্ছ। পরিণত প্রাণীতে লেজ থাকে। যেমন– *Oikopleura dioica, Appendicularia* প্রজাতি প্রভৃতি।

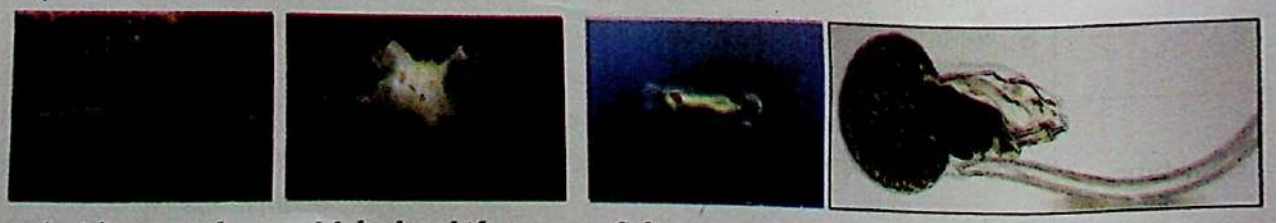

Ascidia mentula *Molgula tubifera* *Salpa maxima* *Oikopleura dioica*

চিত্র ১.২৮ : কয়েকটি ইউরোকর্ডেট প্রাণী

www.Educationblog24.Com

Subphylum – 2 : Cephalochordata (সেফালোকর্ডাটা; গ্রিক, *kephale* = মাথা + *chorda* = রজ্জু)

পৃথিবীর সব উপকূলীয় পানির বালুময় তলদেশে এরা বাস করে। কর্ডেটের সবকটি বৈশিষ্ট্যের আদি ও সরল রূপ দেখতে পাওয়া যায় এসব প্রাণীতে। পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত ৩৩ প্রজাতির সেফালোকর্ডেট শনাক্ত করা হয়েছে।

বৈশিষ্ট্য

১. দেহ লম্বা, পার্শ্বীয়ভাবে চাপা ও স্বচ্ছ; এবং উভয় প্রান্ত সরু।
২. দেহের সামনে অঙ্কীয়ভাবে **ওরাল হুড** (oral hood) এবং তাতে **ওরাল সিরি** (oral cirri) থাকে।
৩. আজীবন স্থায়ী নটোকর্ড ও নার্ভকর্ড (স্নায়ুরজ্জু) দেহের সম্মুখ থেকে পশ্চাৎপ্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত।
৪. গলবিলে অসংখ্য ফুলকা রন্ধ্র উপস্থিত, ফুলকাগুলো **অ্যাট্রিয়াম** (atrium)-এ উন্মুক্ত।
৫. দেহের দুপাশে ">" আকারের **মায়োটোম পেশি** পরপর সজ্জিত।

উদাহরণ– *Branchiostoma lanceolatum* (অ্যাম্ফিঅক্সাস)।

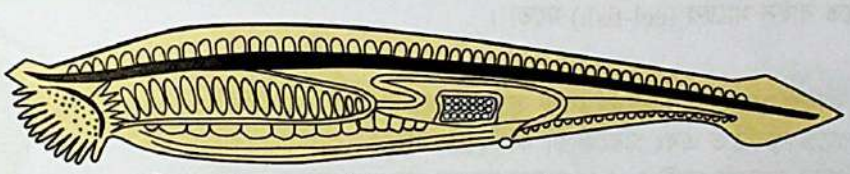

চিত্র ১.২৯ : *Branchiostoma lanceolatum*

কর্ডাটা (chordata) এবং ননকর্ডাটা (nonchordata)-র মধ্যে পার্থক্য

তুলনীয় বিষয়	কর্ডাটা	ননকর্ডাটা বা অকর্ডাটা
১. নটোকর্ড	জীবনের কোন সময় বা আজীবন পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা বরাবর উপস্থিত।	কখনোই থাকে না।
২. ফুলকা রন্ধ্র	জীবনের যে কোন দশায় বা আজীবন গলবিলের দুপাশে অবস্থান করে।	ফুলকা থাকলেও জীবনের কোন অবস্থাতে ফুলকারন্ধ্র থাকে না।
৩. স্নায়ুরজ্জু	নটোকর্ডের উপরে ফাঁপা, নলাকার সূত্রবিশেষ।	অঙ্কীয়দেশে অবস্থিত নিরেট কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র।
৪. লেজ	জীবনের শুরুতে কিংবা আজীবন থাকে।	প্রকৃত লেজ থাকে না।
৫. হৃৎযন্ত্র	পৌষ্টিকনালির অঙ্কীয়দেশে উপস্থিত।	নাও থাকতে পারে; থাকলে পৌষ্টিকনালির পৃষ্ঠদেশে।
৬. হিমোগ্লোবিন	লোহিত কণিকার অভ্যন্তরে অবস্থিত।	নাও থাকতে পারে, থাকলে রক্তরসে দ্রবীভূত।

Subphylum – 3 : Vertebrata (ভার্টিব্রাটা; ল্যাটিন, *vertebratus* = মেরুদণ্ডবিশিষ্ট)

কর্ডেটের তৃতীয় উপপর্ব হচ্ছে Vertebrata। এটি বিরাট ও বৈচিত্র্যময় প্রাণিগোষ্ঠী নিয়ে গঠিত। কর্ডেটের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়াও আরও কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য ধারণ করায় এ উপপর্ব প্রাধান্যকারী গোষ্ঠী হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। অস্থিময় বা তরুণাস্থিময় **ক্রেনিয়াম** (cranium)-এর ভিতর মস্তিষ্ক অবস্থান করে বলে এ উপপর্বের আরেক নাম Craniata।

বৈশিষ্ট্য

১. নটোকর্ড অস্থিময় বা তরুণাস্থিময় কশেরুকাবিশিষ্ট **মেরুদণ্ড** দিয়ে প্রতিস্থাপিত।
২. পৃষ্ঠীয় ফাঁপা স্নায়ুরজ্জু **মস্তিষ্ক** ও **সুষুম্নাকাণ্ড** গঠন করে।
৩. অস্থিময় অথবা তরুণাস্থিময় কশেরুকা সুষুম্নাকাণ্ডকে ঘিরে রাখে এবং কঙ্কাল সম্মুখপ্রান্তে পরিবর্তিত হয়ে **করোটি** (skull) গঠনের মাধ্যমে মস্তিষ্ককে সুরক্ষিত রাখে।
৪. গলবিলের উভয় পাশে ৫–১৫ জোড়া ফুলকা রন্ধ্র থাকে। উন্নত মেরুদণ্ডীতে গলবিলীয় ফুলকা রন্ধ্র কেবল ভ্রূণদশায় উপস্থিত থাকে।
৫. পার্শ্বীয় জোড় উপাঙ্গ (পাখনা বা পদ) চলন অঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

www.Educationblog24.Com

Vertebrata বা মেরুদণ্ডী প্রাণিদের শ্রেণিবিন্যাস

আধুনিক শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী উপপর্ব Vetebrata দুটি Superclass বা অধিশ্রেণিতে বিভক্ত : যেমন–

(I) **Cyclostomata** এবং (II) **Gnathostomata.**

Superclass – I : Cyclostomata (সাইক্লোস্টোমাটা; গ্রিক *cyclos* = round, গোল + *stoma* = mouth, মুখ)

প্রকৃত চোয়াল ও জোড় উপাঙ্গবিহীন; মুখ গোলাকার ও কেরাটিনময় দাঁতযুক্ত; এবং পরিণত প্রাণীতে মেরুদণ্ড ক্ষয়িষ্ণু বা অনুপস্থিত। এ Superclass-এর অধীনে দুধরনের মৎস্যগোষ্ঠী রয়েছে– একটি হচ্ছে Class–Myxini, অন্যটি Class–Petromyzontida.

Class-1 : Myxini (মিক্সিনি; গ্রিক *myxa* = slime, পিচ্ছিল আবরণ)

এ শ্রেণিভুক্ত মাছগুলো **হ্যাগফিশ** (hagfish) নামে পরিচিত। এরা স্বাধীনজীবী, প্রধানত অ্যানিলিড, মলাস্ক, ক্রাস্টাসিয়ান আর্থোপোড বা মৃতপ্রায় মাছ আহার করে। বর্তমানে প্রায় ৭০ প্রজাতির হ্যাগফিশ রয়েছে, সবাই সামুদ্রিক। হ্যাগফিশ দেখতে বাইন মাছের (eel-fish) মতো।

বৈশিষ্ট্য

১. দেহ আঁইশবিহীন, পিচ্ছিল গ্রন্থিযুক্ত ত্বকে আবৃত, পৃষ্ঠীয় পাখনাবিহীন।
২. মুখ প্রান্তে অবস্থিত এবং চারজোড়া কর্ষিকায় পরিবৃত।
৩. গলবিলের দুপাশে মোট ৫–১৫ জোড়া ফুলকা রন্ধ্র অবস্থিত।
৪. হ্যাগফিশের নাসিকা-থলি মুখবিবরে উন্মুক্ত।
৫. কোনো লার্ভা দশা নেই।

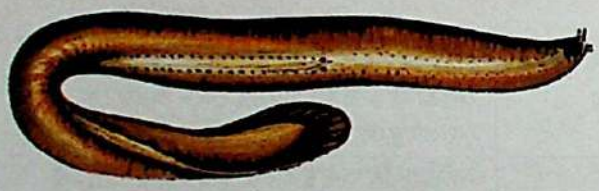

Myxine glutinosa
(আটলান্টিক হ্যাগফিশ)

চিত্র ১.৩০ : Myxini শ্রেণির একটি মাছ

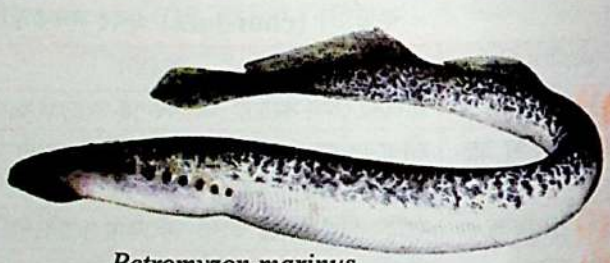

Petromyzon marinus
(পেট্রোমাইজন)

চিত্র ১.৩১ : Petromyzontida শ্রেণির একটি মাছ

Class–2: Petromyzontida (পেট্রোমাইজনটিডা; গ্রিক, *petros* = stone, পাথর + *myzon* = sucking, চোষণ)

এ শ্রেণিভুক্ত মাছগুলো **ল্যামপ্রে** (lamprey) নামে পরিচিত। অনেকে পরজীবী জীবন যাপন করে। বর্তমানে প্রায় ৪১ প্রজাতির ল্যামপ্রে রয়েছে। সবাই সামুদ্রিক হলেও ডিম পাড়ার জন্য মিঠাপানির হ্রদে আসতে হয়। ডিম ছাড়ার পর কয়েক দিনের মধ্যেই মারা যায়। ডিম ফুটে **অ্যামোসিট** (ammocete) লার্ভা বেরিয়ে রূপান্তর শেষে সমুদ্রে যাত্রা করে।

বৈশিষ্ট্য

১. পরিণত ল্যামপ্রের দেহ সরু, দেখতে বাইন মাছের মতো, আঁইশবিহীন, একটি বা দুটি পৃষ্ঠীয় পাখনাযুক্ত।
২. মৌখিক চাকতিটি (oral disc) চোষকের ভূমিকা পালন করে। এর চারদিকে কেরাটিনময় দাঁত অবস্থান করে।
৩. পৃথক ফুলকা রন্ধ্রসহ সাতজোড়া ফুলকা রয়েছে।
৪. ল্যামপ্রের নাসিকা-থলি মুখবিবরে উন্মুক্ত নয়।
৫. লার্ভা দশা আছে।

Superclass–II : Gnathostomata (ন্যাথোস্টোমাটা; গ্রিক *gnathos* =jaw, চোয়াল + *stoma* = mouth, মুখ)

প্রকৃত চোয়াল ও জোড় উপাঙ্গবিশিষ্ট এবং তরুণাস্থি ও অস্থিময় প্রাণিগোষ্ঠী হিসেবে Superclass বা অধিশ্রেণি *Gnathostomata* অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন ধরনের মেরুদন্ডী প্রাণীর সমাবেশ ঘটেছে এ অধিশ্রেণিতে। এসব প্রাণীকে ৭টি Class বা শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

www.Educationblog24.Com

Class –1 : Chondrichthyes (কন্ড্রিকথিস; গ্রিক *chondros* = cartilage, তরুণাস্থি + *ichthys* = fish, মাছ)

এটি Gnathostomata-র প্রথম শ্রেণি। বর্তমানে এ শ্রেণিতে প্রায় ১০০০ প্রজাতির তরুণাস্থিময় মাছ শনাক্ত করা হয়েছে। এটি প্রাচীন হলেও বেশ উন্নত গোষ্ঠী। সুগঠিত সংবেদ অঙ্গ, শক্তিশালী লেজ ও সাঁতার-পেশি এবং শিকারী স্বভাব সব মিলিয়ে জলজ পরিবেশের এক দাপুটে গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। এদের অধিকাংশই সামুদ্রিক।

বৈশিষ্ট্য

১. দেহ অসংখ্য ক্ষুদ্র **প্ল্যাকয়েড** (placoid); নামক সূক্ষ্ম কাঁটার মতো আঁইশে আবৃত।
২. অন্তঃকঙ্কাল সম্পূর্ণ **তরুণাস্থিময়**।
৩. মাথার দুপাশে ৫–৭ জোড়া ফুলকা রন্ধ্র পৃথকভাবে দেহের বাইরে উন্মুক্ত।
৪. পুচ্ছ-পাখনা **হেটারোসার্কাল** (heterocercal) ধরনের; অর্থাৎ পুচ্ছ–পাখনার অংশ দুটি অসমান।
৫. মুখছিদ্র ও নাসারন্ধ্র মস্তকের অঙ্কীয়দেশে অবস্থিত। চোয়ালে অসংখ্য সারিবদ্ধ দাঁত থাকে।

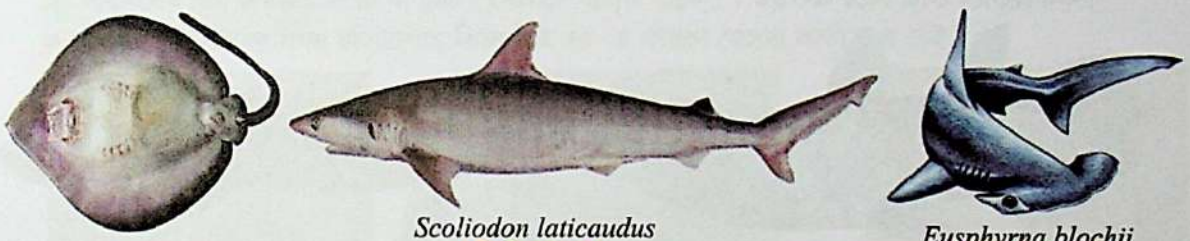

Plesiobatis daviesi (স্টিং রে) | *Scoliodon laticaudus* (থুড্রি হাঙ্গর) | *Eusphyrna blochii* (হাতুড়ী হাঙ্গর)

চিত্র ১.৩২ : Chondrichthyes শ্রেণির কয়েকটি মাছ

Class – 2 : Actinopterygii (অ্যাকটিনোপটেরিজি; গ্রিক *actis* = rays, রশ্মি + *pteryx* = fin, পাখনা)

এ শ্রেণিভুক্ত মাছগুলো **রশ্মিময় পাখনাবিশিষ্ট মাছ** (ray-finned fishes) নামে পরিচিত। এ শ্রেণিতে ৩১,০৪৫ প্রজাতির মাছ রয়েছে। জীবিত মাছের প্রায় ৯৬% এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। ঝর্ণা, হ্রদ, গুহা, গর্ত, বরফ, গভীর সাগর সবখানে এ জাতীয় মাছ বিস্তৃত।

বৈশিষ্ট্য

১. ত্বক গ্রন্থিময় এবং সাধারণত **সাইক্লয়েড** (cycloid; গোলাকার) বা **টিনয়েড** (ptenoid; কাঁটাযুক্ত) ধরনের আঁইশে আবৃত। কিছু ক্ষেত্রে আঁইশ নেই।
২. অন্তঃকঙ্কাল **অস্থিময়**।
৩. মাথার দুপাশে একটি করে ফুলকা রন্ধ্র অবস্থিত যা **কানকো** (operculum) দিয়ে আবৃত।
৪. পৌচ্ছিক-পাখনা **হোমোসার্কাল** (homocercal) ধরনের অর্থাৎ পুচ্ছ-পাখনার অংশদুটি সমান এবং রশ্মিযুক্ত।
৫. **বায়ুথলি বা পটকা** (swim bladder) দেহকে পানিতে ভেসে থাকতে সাহায্য করে।

Tenualosa ilisha (ইলিশ মাছ) | *Anabas testudineus* (কই মাছ) | *Channa punctatus* (টাকি মাছ)

চিত্র ১.৩৩ : Actinopterygii শ্রেণির কয়েকটি মাছ

www.Educationblog24.Com

Class –3 : Sarcopterygii (সার্কোপটেরিজি; *sarkos* = flesh, মাংসল + *pteryx* = fin, পাখনা)

এ শ্রেণিভুক্ত মাছকে **পিণ্ডাকার-পাখনাবিশিষ্ট মাছ** (lobe-finned fishes) বলে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এ শ্রেণিরই কোনো মাছ থেকে চতুষ্পদী ও স্থলচর প্রাণী হিসেবে উভচর গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছে। বর্তমানে মাত্র ৮ প্রজাতির মাছ জীবিত আছে। এ গোষ্ঠীর **লাংফিশ** (lungfish) আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় বিস্তৃত। অন্যদিকে, **সিলাকান্থ** (Coelacanth) নামে পরিচিত দুই প্রজাতি ভারত মহাসাগর ও ইন্দোনেশিয়ার উপকূলে বিস্তৃত।

বৈশিষ্ট্য

১. দেহ **গ্যানয়েড** (ganoid; বহিঃস্তর গ্যানয়েনে গঠিত) ধরনের আঁইশে আবৃত।
২. অন্তঃকঙ্কাল অস্থিময়।
৩. মাথার দুপাশে একটি করে ফুলকা রন্ধ্র থাকে যা কানকো দিয়ে আবৃত।
৪. এদের **পটকা** (swim bladder) রক্তজালিকা-সমৃদ্ধ এবং শ্বসন ও ভেসে থাকতে সাহায্য করে।
৫. লেজ **ডাইফাইসার্কাল** (diphycercal) ধরনের অর্থাৎ পুচ্ছপাখনার অংশ দুটি একীভূত হয়ে অভিন্ন ও নমনীয় পাখনা হিসেবে লেজ ঘিরে অবস্থিত।

Latimeria chalumnae
(সিলাকান্থ মাছ)

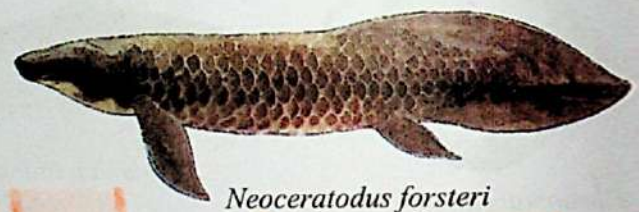

Neoceratodus forsteri
(অস্ট্রেলিয়ান লাংফিশ)

চিত্র ১.৩৪ : Sarcopterygii শ্রেণির দুটি মাছ

Class – 4 : Amphibia (অ্যাম্ফিবিয়া; গ্রিক *amphi* = both, উভয় +*bios* = life, জীবন)

এ শ্রেণির সদস্যরা স্থলভাগ জয়ের উদ্দেশে সর্বপ্রথম চার পা নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। তখন থেকে এসব প্রাণী চতুষ্পদী (tetrapod) নামে পরিচিত। মূলত স্থলচর হলেও জননকালে এরা ডিম পাড়তে পানিতে আসতে বাধ্য হয় এবং পানিতেই ডিমের পরিস্ফুটন ঘটে। এ কারণে এ গোষ্ঠীর সদস্যরা উভচর (ডাঙ্গা + পানিতে বিচরণ) নামে অভিহিত। বর্তমানে জীবিত উভচর প্রজাতির সংখ্যা ৭,৭০০টি। এর মধ্যে লেজবিশিষ্ট উভচর প্রজাতি ৭১৫টি, আর পাবিহীন প্রজাতি রয়েছে ২০০টি। বাকিগুলো (৬,৭৮৫টি) চার-পাবিশিষ্ট উভচর (ব্যাঙ ইত্যাদি)।

বৈশিষ্ট্য

১. গ্রন্থিময় ত্বকবিশিষ্ট, **এক্টোথার্মিক** (ectothermic; দেহের তাপমাত্রা পরিবেশের তাপমাত্রার সাথে উঠানামা করে) চতুষ্পদী মেরুদন্ডী প্রাণী। লার্ভা অবস্থায় জলচর, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় জলচর বা স্থলচর।
২. ত্বক মসৃণ, আর্দ্র, গ্রন্থিময়; শ্বসনেও সাহায্য করে।
৩. অগ্রপদে চারটি ও পশ্চাৎপদে পাঁচটি করে নখরবিহীন আঙ্গুল থাকে।
৪. লার্ভা দশায় ফুলকা ও পরিণত অবস্থায় ফুসফুস, ত্বক ও মুখবিবরীয় মিউকাস ঝিল্লির মাধ্যমে শ্বসন ঘটে।
৫. হৃৎপিন্ড তিন প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট– দুটি অ্যাট্রিয়া (অলিন্দ) এবং একটি ভেন্ট্রিকল (নিলয়)।

Salamandra salamandra
(স্যালামান্ডার)

Rhacophorous fergusonil
(উড়ুক্কু ব্যাঙ)

Hoplobatrachus tigerinus
(সোনাব্যাঙ)

চিত্র ১.৩৫ : Amphibia শ্রেণির কয়েকটি প্রাণী

www.Educationblog24.Com

Class–5 : Reptilia (রেপটিলিয়া বা সরিসৃপ; ল্যাটিন *repto* = creep, হামাগুড়ি দিয়ে চলন)

ভূভাগ জয়ের নেশায় চতুষ্পদী প্রাণিদের অক্লান্ত অভিযান আরও গতিময় হয়েছে সরিসৃপ প্রজাতির উৎপত্তি ও বিকাশের মাধ্যমে। উভচরে যে গাঠনিক ও শারীরবৃত্তিক বাধা ছিল সরিসৃপে তা অপসারিত হওয়ায় দ্রুত পৃথিবী জয় করতে পেরেছে। শুষ্কতা ও ডিমের পরিস্ফুটনজনিত সমস্যাসহ নিষেক, পানি ধরে রাখা, স্থলে বিচরণ, খাদ্য গ্রহণ ও রক্তসংবহনজনিত সমস্ত বাধা অতিক্রম করে সরিসৃপ প্রজাতিরা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে জীবিত সরিসৃপ প্রজাতির সংখ্যা ১০,৪৫০টি।

বৈশিষ্ট্য

১. সরিসৃপের দেহ শুষ্ক ও এপিডার্মিস উদ্ভূত **আঁইশ** (scale) বা শক্ত **প্লেট** (plate)-এ আবৃত।
২. পায়ে ৫টি করে নখরযুক্ত আঙ্গুল থাকে।
৩. হৃৎপিন্ডের ভেন্ট্রিকল (নিলয়) অসম্পূর্ণভাবে দ্বিধাবিভক্ত থাকায় হৃৎপিণ্ড অসম্পূর্ণভাবে চার-প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট (ব্যতিক্রম-কুমিরে সম্পূর্ণভাবে চার-প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট)। ফুসফুসই এদের একমাত্র শ্বসন অঙ্গ।
৪. সরিসৃপের ডিম চামড়ার মতো বা চুনময় খোলসে আবৃত থাকে।
৫. ভ্রূণের পরিস্ফুটনের সময় বহিঃভ্রূণীয় ঝিল্লি সৃষ্টি হয়, এ কারণে কোনো লার্ভা দশা নেই।

Gavialis gangeticus (ঘড়িয়াল)

Lissemys punctata (কচ্ছপ)

Naja naja (গোখরা সাপ)

চিত্র ১.৩৬ : Reptilia শ্রেণির কয়েকটি প্রাণী

কাজ : একটি ব্যাঙ ও একটি টিকটিকির মধ্যে যে সব পার্থক্য তুমি খুঁজে পাও তা ছকের মাধ্যমে দেখাও।

Class – 6 : Aves (অ্যাভিস; ল্যাটিন, *avis* = bird, পাখি)

পানি ও ডাঙ্গা ছেড়ে যে মেরুদণ্ডীগোষ্ঠী আকাশচারী হয়েছে তা পাখি নামে পরিচিত। এদের উৎপত্তি, বিকাশ ও বৈচিত্র্য এত বিচিত্র যে কারণে পাখি নিয়ে আলোচনাও বেশি। আকাশ, মাটি, পানি সবখানে পাখির অবাধ বিচরণ অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর কাছে ঈর্ষণীয় মনে হওয়া স্বাভাবিক। মেরু অঞ্চলসহ পৃথিবীর সমস্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে পাখি বিস্তৃত। অনেক প্রজাতির পাখি আবার এতটাই সুযোগ সন্ধানী যে বছরের নির্দিষ্ট সময়কাল ভিন্ন দেশে কাটিয়ে স্বদেশে ফেরত আসে। বর্তমানে পৃথিবীতে ১০ হাজারের বেশি প্রজাতির পাখি রয়েছে। পাখি হওয়ার জন্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর এ নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর আপাদমস্তকে পরিবর্তনের ঝড় বয়ে গেছে। পরিবর্তনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে দেহকে হালকা করে উড্ডয়ন সফল **অভিযোজন** (adaptation) সম্পন্ন করা।

বৈশিষ্ট্য

১. দেহ **পালক** (feather)–এ আবৃত; গ্রীবা প্রলম্বিত এবং "S" আকৃতির।
২. উড্ডয়ন অঙ্গ হিসেবে অগ্রপদ দুটি **ডানা** (wing)-য় রূপান্তরিত হয়েছে।

Corvus splendens (কাক)

Columba livia (কবুতর)

Copsychus saularis (দোয়েল)

Passer domesticus (চড়ুই পাখি)

চিত্র ১.৩৭ : Aves শ্রেণির কয়েকটি প্রাণী

www.Educationblog24.Com

৩. চোয়াল দাঁতবিহীন **চঞ্চু** (beak) তে পরিণত হয়েছে।
৪. অস্থিগুলো **বায়ুগহ্বরপূর্ণ** (pneumatic) ও হালকা, অনেক হাড় একীভূত হয়েছে।
৫. ফুসফুসের সঙ্গে পাতলা **বায়ুথলি** (air sac) যুক্ত হয়েছে, এমনকি হাড়ের ভিতরেও বায়ুথলি প্রবিষ্ট হয়।
৬. শক্তিদায়ক খাদ্যের দ্রুত বিপাকের জন্য রয়েছে কার্যকর পরিপাকতন্ত্র।
৭. হৃৎপিন্ড ৪ প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট– দুটি অ্যাট্রিয়া (অলিন্দ) ও দুটি ভেন্ট্রিকল (নিলয়)।
৮ পাখির শরীরেই প্রথম **সমোষ্ণশোণিত** (warm blooded) বা **এন্ডোথার্মিক** (endothermic) অবস্থা দেখা দিয়েছে।

Class–7 : Mammalia (ম্যামালিয়া বা স্তন্যপায়ী; ল্যাটিন *mamma* = breast, স্তন)

প্রাণিজগতে বিবর্তনের পরিক্রমায় সর্বোন্নত প্রাণিগোষ্ঠী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে Mammalia শ্রেণি। দেড় গ্রাম ওজনের বাদুর থেকে শুরু করে ১৩০ মেট্রিক টন ওজনের নীল তিমিসহ বিচিত্র আকার, আকৃতি ও গড়নের স্তন্যপায়ী রয়েছে। শারীরিক গঠনের সঙ্গে বুদ্ধিমত্তা ও তাৎক্ষণিক সক্রিয়তার কারণে স্তন্যপায়ীরা আজ সংখ্যাগত দিক থেকে কম হলেও (পাখি, মাছ, পতঙ্গের তুলনায়) পৃথিবীর কর্তৃত্ব দখল করে নিয়েছে। বর্তমানে প্রায় ৬ হাজার প্রজাতির স্তন্যপায়ী রয়েছে। মানুষও এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত সদস্য।

Ornithorhynchus anatinus
(প্লাটিপাস)

Macropus rufa
(কাঙ্গারু)

Pteropus gigantius
(বাদুর)

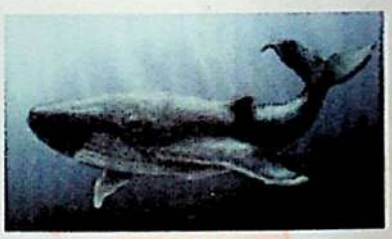
Balaenoptera musculus
(নীল তিমি)

Panthera leo
(সিংহ)

Panthera tigris
(বাঘ)

Dicerorhinus sumatrensis
(দ্বিশৃংগ গণ্ডার)

Homo sapiens
(মানুষ)

চিত্র ১.৩৮ : Mammalia শ্রেণির কয়েকটি প্রাণী

বৈশিষ্ট্য

১. দেহত্বক বিভিন্ন গ্রন্থিযুক্ত (ঘর্মগ্রন্থি, সেবাসিয়াস ইত্যাদি) এবং **লোম** (hair)-এ আবৃত (তিমি ব্যতীত)।
২. পরিণত স্ত্রী প্রাণীর কার্যকরি **স্তনগ্রন্থি** (mammary gland) থেকে ক্ষরিত মাতৃদুগ্ধে নবজাতক লালিত হয়।
৩. বহিঃকর্ণে **পিনা** (pinna) ও মধ্যকর্ণে তিনটি ক্ষুদ্রাস্থি থাকে। চোয়াল বিভিন্ন ধরনের দাঁতযুক্ত।
৪. মাংসল **ডায়াফ্রাম** (diaphragm) বা **মধ্যচ্ছদা** দিয়ে বক্ষ ও উদর গহ্বর পৃথক থাকে।
৫. পরিণত লোহিত রক্তকণিকা নিউক্লিয়াসবিহীন।
৬. হৃৎপিন্ড সম্পূর্ণ চারপ্রকোষ্ঠী।
৭. স্তন্যপায়ীরা আজ সবধরনের পরিবেশ ছাড়াও স্থলচর ও জলচর বাসস্থানে ব্যাপক বিস্তৃত। একটি উপগোষ্ঠী আবার উড্ডয়নেও সক্ষম (বাদুর)।
৮. এন্ডোথার্মিক (দেহের তাপমাত্রা পরিবেশের তাপমাত্রার সাথে উঠানামা করেনা) প্রাণী।

www.Educationblog24.Com

মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীর উল্লেখযোগ্য পার্থক্য		
আলোচ্য বিষয়	মেরুদণ্ডী প্রাণী	অমেরুদণ্ডী প্রাণী
১. মেরুদণ্ড	পৃষ্ঠ মধ্যরেখা বরাবর থাকে এবং কশেরুকাযুক্ত।	অনুপস্থিত।
২. স্নায়ুরজ্জু	ফাঁপা, দেহের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত।	নিরেট, দেহের অঙ্কীয়দেশে অবস্থিত।
৩. প্রতিসাম্য	দ্বিপার্শ্বীয়।	অপ্রতিসম, অরীয় বা দ্বিপার্শ্বীয়।
৪. হৃৎপিণ্ড	দেহের অঙ্কীয়দেশে।	যদি থাকে তবে পৃষ্ঠদেশে।
৫. হিমোগ্লোবিন	সবসময় লোহিত কণিকার অভ্যন্তরে।	যদি থাকে তবে রক্তরসে দ্রবীভূত অবস্থায়।
৬. মস্তিষ্ক	সবসময়ই থাকে এবং করোটির অভ্যন্তরে সুরক্ষিত।	যদি থাকে, তবে তা করোটি দিয়ে আবৃত নয়।
৭. অন্তঃকঙ্কাল	অস্থি ও তরুণাস্থি নিয়ে গঠিত।	থাকে না, থাকলেও অস্থি ও তরুণাস্থি দিয়ে তৈরি নয়।

মেরুদণ্ডী প্রাণিদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য					
বিষয়	মৎস্য	উভচর	সরিসৃপ	পাখি	স্তন্যপায়ী
১. ত্বক	ভেজা, গ্রন্থিময় ও সাধারণত ডার্মাল আঁইশযুক্ত।	ভেজা, গ্রন্থিময় ও নগ্ন।	শুষ্ক ও এপিডার্মাল আঁইশ দিয়ে আবৃত।	শুষ্ক ও পালক দিয়ে আবৃত।	শুষ্ক, গ্রন্থিময় ও লোম দিয়ে আবৃত।
২. চলন অঙ্গ	পাখনা।	দুজোড়া পদ।	দুজোড়া পদ।	একজোড়া ডানা ও একজোড়া পদ।	দুজোড়া পদ।
৩. শ্বসন অঙ্গ	ফুলকা।	ফুসফুস।	ফুসফুস।	ফুসফুস।	ফুসফুস।
৪. হৃৎপিণ্ড	দ্বিপ্রকোষ্ঠী।	তিন প্রকোষ্ঠী।	অসম্পূর্ণভাবে বিভক্ত চার প্রকোষ্ঠী।	সম্পূর্ণরূপে চার প্রকোষ্ঠী।	সম্পূর্ণরূপে চার প্রকোষ্ঠী।
৫. রক্ত	শীতল।	শীতল।	শীতল।	উষ্ণ।	উষ্ণ।
৬. করোটিক স্নায়ু	১০ জোড়া।	১০ জোড়া।	১২ জোড়া।	১২ জোড়া।	১২ জোড়া।
৭. অক্ষিপল্লব	থাকে না।	তিনটি।	তিনটি।	তিনটি	দুটি।
৮. অবসারণী	অনুপস্থিত।	উপস্থিত।	উপস্থিত।	উপস্থিত।	অনুপস্থিত।
৯. নিষেক	বহিঃনিষেক।	বহিঃনিষেক।	অন্তঃনিষেক।	অন্তঃনিষেক।	অন্তঃনিষেক।
১০. প্রসব	অনিষিক্ত ডিম।	অনিষিক্ত ডিম।	নিষিক্ত ডিম ও বাচ্চা।	নিষিক্ত ডিম।	বাচ্চা (হংসচঞ্চুতে নিষিক্ত ডিম)।

সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীই কর্ডেট, কিন্তু সকল কর্ডেট মেরুদণ্ডী নয়

কর্ডেট প্রাণীর তিনটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে–স্থিতিস্থাপক **নটোকর্ড**, পৃষ্ঠীয় ফাঁপা **স্নায়ুরজ্জু** এবং গলবিলীয় **ফুলকা রন্ধ্র**। এসব বৈশিষ্ট্য সবধরনের কর্ডেট প্রাণীর জীবনের যে কোনো দশায় কিংবা আজীবন পাওয়া যায়। Chordata পর্বের দুটি উপপর্ব যেমন–Urochordata ও Cephalochordata (অর্থাৎ Protochordata)-র সদস্যদের ক্ষেত্রে কর্ডাটার বৈশিষ্ট্যগুলো আজীবন পাওয়া যায়। কিন্তু Vertebrata উপপর্বের ক্ষেত্রে ভ্রূণাবস্থায় নটোকর্ড থাকলেও পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় তা কশেরুকা নির্মিত মেরুদণ্ড দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়। সেজন্য এদের **মেরুদণ্ডী প্রাণী** বলে। তাছাড়া স্নায়ুরজ্জুটি মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়; ফুলকা রন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায় এবং ফুলকা বা ফুসফুসের আবির্ভাব ঘটে। তাই বলা যায়– **সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীই কর্ডেট** (কারণ ভ্রূণাবস্থায় কর্ডাটার সকল বৈশিষ্ট্য থাকে) **কিন্তু সকল কর্ডেট মেরুদণ্ডী নয়** (কারণ Urochordata ও Cephalochordata উপপর্বের প্রাণিদের নটোকর্ড কখনোই মেরুদণ্ড দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয় না)।

www.Educationblog24.Com

নিচের ছকে Vertebrata উপপর্বের শ্রেণিগুলোর নাম, প্রধান বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ উল্লেখ করা হলো।

অধিশ্রেণি ১ : Cyclostomata (সাইক্লোস্টোমাটা) : প্রকৃত চোয়াল ও জোড় উপাঙ্গ অনুপস্থিত		
শ্রেণির নাম	**বৈশিষ্ট্য**	**উদাহরণ**
শ্রেণি–১ : Myxini	১. মুখ প্রান্তীয় ও ৪ জোড়া কর্ষিকাযুক্ত। ২. ৫–১৫ জোড়া গলবিলীয় ফুলকা রন্ধ্র থাকে।	*Myxine glutinosa* (আটলান্টিক হ্যাগফিশ) *Eptatretus stouti* (প্যাসিফিক হ্যাগফিশ)
শ্রেণি–২ : Petromyzontida	১. কেরাটিনময় দাঁতযুক্ত, চোষন ক্ষমতাসম্পন্ন মুখ। ২. ৭ জোড়া ফুলকা রন্ধ্র থাকে।	*Petromyzon marinus* (ল্যামপ্রে) *Lampetra tridentatus* (ল্যামপ্রে)

অধিশ্রেণি ২ : Gnathostomata (ন্যাথোস্টোমাটা) : প্রকৃত চোয়াল ও সাধারণত জোড় উপাঙ্গ (পাখনা/পদ) উপস্থিত		
শ্রেণির নাম	**বৈশিষ্ট্য**	**উদাহরণ**
শ্রেণি ১ : Chondrichthyes	১. অন্তঃকঙ্কাল তরুণাস্থিময় এবং দেহ অসংখ্য ক্ষুদ্র **প্ল্যাকয়েড** আঁইশে আবৃত। ২. লেজ **হেটেরোসার্কাল** অর্থাৎ পৌচ্ছিক পাখনার অংশদুটি অসমান।	*Hydrologus collei* (র‍্যাটফিশ) *Scoliodon laticaudus* (হাঙর মাছ) *Plesiobatis daviesi* (স্টিং রে)
শ্রেণি ২ : Actinopterygii	১. অন্তঃকঙ্কাল অস্থিময় এবং দেহ **সাইক্লয়েড** ও টিনয়েড ধরনের আঁইশে আবৃত। ২. লেজ **হোমোসার্কাল** ধরনের অর্থাৎ পৌচ্ছিক পাখনার অংশদুটি সমান।	*Tenualosa ilisha* (ইলিশ মাছ) *Labeo rohita* (রুই মাছ) *Channa punctatus* (টাকি মাছ)
শ্রেণি ৩ : Sarcopterygii	১. অন্তঃকঙ্কাল অস্থিময় এবং দেহ গ্যানয়েড ধরনের আঁইশে আবৃত। ২. লেজ **ডাইফিসার্কাল** ধরনের অর্থাৎ পৃষ্ঠীয় ও অংকীয় পাখনা একীভূত হয়ে অভিন্ন ও নমনীয় পাখনা হিসেবে লেজ ঘিরে অবস্থিত।	*Latimeria chalumnae* (সিলাকান্থ) *Neoceratodus forsteri* (অস্ট্রেলিয়ান লাংফিশ) *Protopterus annectens* (আফ্রিকান লাংফিশ)
শ্রেণি ৪ : Amphibia	১. দেহত্বক নগ্ন, গ্রন্থিময় ও সিক্ত। ২. অগ্রপদে ৪টি ও পশ্চাৎপদে ৫টি করে আঙ্গুল থাকে।	*Salamandra salamandra* (স্যালামান্ডার) *Hoplobatracus tigerinus* (সোনাব্যাঙ) *Fejervarya asmati* (আসমতিব্যাঙ) *Chiromantis simus* (গেছোব্যাঙ)
শ্রেণি ৫ : Reptilia	১. দেহ শুষ্ক এবং এপিডার্মিস উদ্ভূত **আঁইশ** বা শক্ত **প্লেট** দিয়ে আবৃত। ২. প্রতি পায়ে ৫টি করে নখরযুক্ত আঙ্গুল থাকে।	*Kachuga sylhetensis* (কড়িকাইট্টা) *Hemidactylus frenatus* (টিকটিকি) *Gavialis gangeticus* (ঘড়িয়াল)
শ্রেণি ৬ : Aves	১. দেহ **পালক**-এ আবৃত এবং অগ্রপদদুটি ডানায় রূপান্তরিত। ২. চোয়াল দন্তহীন চঞ্চুতে পরিণত হয়েছে।	*Francolinus gularis* (তিতির) *Copsychus saularis* (দোয়েল) *Centropus bengalensis* (কুকা)
শ্রেণি ৭ : Mammalia	১. দেহ **লোম**-এ আবৃত এবং বহিঃকর্ণ পিনাযুক্ত। ২. পরিণত স্ত্রী প্রাণীতে সক্রিয় **স্তনগ্রন্থি** থাকে।	*Panthera tigris* (বাঘ) *Homo sapiens* (মানুষ)

www.Educationblog24.Com

ব্যবহারিক অংশ : মিউজিয়াম স্পেসিমেন পর্যবেক্ষণ
(Study of Museum Specimen)

ড্রইং সিটে সাদা-কালো ছবি আঁকতে হবে

পাঠ্যসূচীতে ননকর্ডাটা (Nonchordata) থেকে যেকোন ৫টি এবং ভার্টিব্রাটা (Vertebrata) থেকে যে কোন ৫টি প্রাণী (মোট ১০টি প্রাণী) পর্যবেক্ষণের জন্য বলা হয়েছে। শিক্ষক মহোদয় ১০টি প্রাণী বাছাই করে দেবেন। ছাত্রছাত্রীরা প্রাণীগুলো পর্যবেক্ষণ করে শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যসহ ড্রইং সিটে পেন্সিল দিয়ে প্রাণীগুলোর ছবি এঁকে সেগুলো লেবেলিং করবে।

ননকর্ডাটা ও ভার্টিব্রাটার কতকগুলো প্রাণী পর্যবেক্ষণ

ননকর্ডাটা (Nonchordata)

Phylum - Porifera

স্কাইফা—*Scypha (= Sycon) gelatinosum*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum - Porifera
Class - Calcarea
Order - Heterocoela
Family - Sycettidae
Genus - *Scypha*
Species - *Scypha gelatinosum*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. ফুলদানি আকৃতির সরু দেহ।
২. প্রত্যেক ফুলদানির মধ্যভাগ স্ফীত।
৩. দেহপ্রাচীর **অস্টিয়া** নামক অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত।
৪. ফুলদানির মুক্ত ঊর্দ্ধপ্রান্ত **অসক্যুলাম** পথে উন্মুক্ত।
৫. ফুলদানির বদ্ধ নিম্নপ্রান্ত স্টোলনের সাহায্যে অবলম্বন বস্তুর সঙ্গে আবদ্ধ।

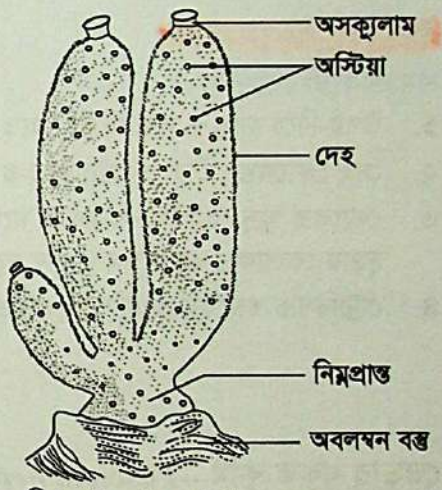

চিত্র : *Scypha gelatinosum*

Phylum – Cnidaria

হাইড্রা—*Hydra viridis*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum - Cnidaria
Class - Hydrozoa
Order - Hydroida
Family - Hydridae
Genus - *Hydra*
Species - *Hydra viridis*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. দেহ নলাকার; একপ্রান্ত খোলা ও অন্যপ্রান্ত বদ্ধ।
২. মুক্তপ্রান্তে অবস্থিত মোচাকার হাইপোস্টোমের চূড়ায় **মুখছিদ্র** অবস্থিত।
৩. হাইপোস্টোমকে ঘিরে কয়েকটি সুতাকৃতি **কর্ষিকা** রয়েছে।
৪. দেহের বদ্ধ (নিম্ন) প্রান্তে গোলাকার **পাদ-চাকৃতি** অবস্থিত।
৫. দেহে এক বা একাধিক শিশু *Hydra* বা **মুকুল** বিদ্যমান।

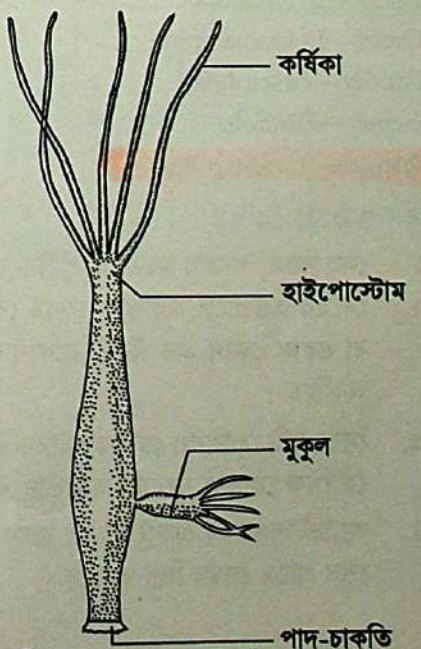

চিত্র : *Hydra viridis*

www.Educationblog24.Com

Phylum – Platyhelminthes

শূকরের ফিতাকৃমি-*Taenia solium*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Platyhelminthes
Class—Cestoda
Order—Cyclophyllidea
Family—Taeniidae
Genus—*Taenia*
Species—*Taenia solium*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. উপর-নিচে চাপা ও লম্বা ফিতার মতো দেহ।
২. দেহ **স্কোলেক্স**, গ্রীবা ও **স্ট্রোবিলা**-য় বিভক্ত।
৩. স্কোলেক্স ক্ষুদ্র, আলপিনের মাথার মতো; এতে ৪টি **চোষক**, চূড়ায় কোণাকার **রস্টেলাম** ও এর চতুর্দিকে **হুক** আছে।
৪. স্ট্রোবিলায় খন্ডকের মতো অসংখ্য **প্রোগ্লোটিড** রয়েছে।

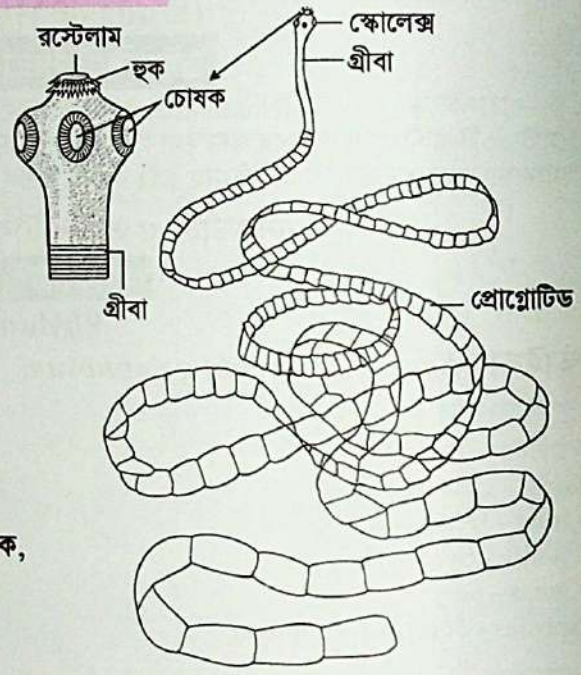

চিত্র : *Taenia solium*

ভেড়ার যকৃত কৃমি—*Fasciola hepatica*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Platyhelminthes
Class— Trematoda
Order—Echinostomida
Family—Fasciolidae
Genus—*Fasciola*
Species—*Fasciola hepatica*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. দেহ নরম, পাতার মতো ও পৃষ্ঠীয়-অঙ্কীয়ভাবে চাপা।
২. দেহের অগ্রপ্রান্তে অবস্থিত সুস্পষ্ট কৌণিক অভিক্ষেপ বা **ওরাল কোণ**-এর শীর্ষে ত্রিকোণাকার **মুখছিদ্র** অবস্থিত।
৩. দেহে দুটি পেশিময় চোষক থাকে; একটি অগ্রপ্রান্তে **মৌখিক চোষক**, অন্যটি অঙ্কীয়দেশে **অ্যাসিটাবুলাম**।
৪. অ্যাসিটাবুলামের একটু সামনে জনন ছিদ্র ও দেহের শেষ প্রান্তে **রেচন ছিদ্র** রয়েছে।

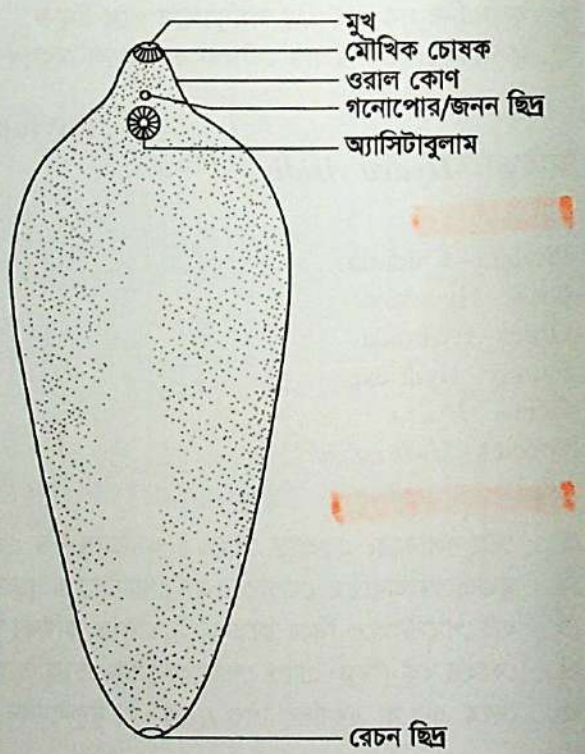

চিত্র : *Fasciola hepatica* (অঙ্কীয় দৃশ্য)

www.Educationblog24.Com

Phylum – Nematoda

কেঁচোকৃমি বা গোলকৃমি— *Ascaris lumbricoides*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Nematoda
Class—Phasmida
Order—Ascarida
Family—Ascaridae
Genus—*Ascaris*
Species—*Ascaris lumbricoides*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. দেহ নলাকার এবং দু'প্রান্ত সরু ও মধ্যভাগ চওড়া।
২. দেহ মসৃণ, শক্ত ও স্থিতিস্থাপক **কিউটিক্‌ল**-এ আবৃত।
৩. দেহের অগ্রপ্রান্তে তিনটি **ওষ্ঠ** দিয়ে পরিবৃত **মুখছিদ্র** রয়েছে।
৪. অগ্রপ্রান্তের সামান্য পেছনে অঙ্কীয়দেশে **রেচনরন্ধ্র** অবস্থিত।
৫. পুরুষ কৃমির পশ্চাৎপ্রান্ত বাঁকানো ও **পিনিয়াল সিটিযুক্ত**।

চিত্র : *Ascaris lumbricoides*
(বায়ে-পুরুষ এবং ডানে-স্ত্রী কৃমি)

Phylum – Annelida

কেঁচো—*Metaphire posthuma*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Annelida
Class—Oligochaeta
Order—Haplotaxida
Family—Megascolecidae
Genus—*Metaphire*
Species—*Metaphire posthuma*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. দেহ নলাকার ও অসংখ্য খন্ডক বা **সেগমেন্ট**-এ বিভক্ত যা আন্তঃখন্ডকীয় খাঁজের সাহায্যে পরস্পর পৃথক।
২. ১৪–১৬তম দেহ খন্ডকের উপরে চামড়ার মতো বেষ্টনী বা **ক্লাইটেলাম** আছে।
৩. ১৪তম দেহ খন্ডকের অঙ্কীয়দেশে একটি **স্ত্রী জননরন্ধ্র** এবং ১৮তম দেহ খন্ডকের অংকীয়দেশে একজোড়া **পুং জননরন্ধ্র** থাকে।
৪. প্রত্যেক খন্ডকে একসারি সূক্ষ্ম সুতার মতো **সিটি** দেখা যায়।
৫. ত্বক পাতলা হওয়ায় পৃষ্ঠীয় মধ্যরেখা বরাবর **পৃষ্ঠীয় রক্তনালি** দেখা যায়।

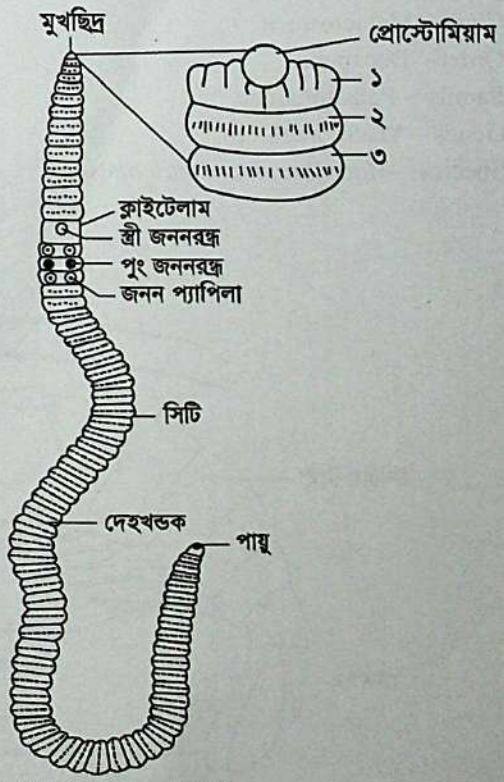

চিত্র : *Metaphire posthuma*

www.Educationblog24.Com

জোঁক—*Hirudinaria manillensis*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Annelida
Class—Hirudinea
Order—Gnathobdellida
Family—Hirudidae
Genus—*Hirudinaria*
Species—*Hirudinaria manillensis*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. পেশিবহুল দেহটি পৃষ্ঠ-অঙ্কীয়ভাবে চাপা ও ৩৩টি খন্ডকে বিভক্ত।
২. প্রত্যেক দেহখন্ডকে কয়েকটি অ্যানুলি আছে।
৩. অগ্রপ্রান্তের অঙ্কীয়দেশে একটি সম্মুখ চোষক থাকে।
৪. প্রথম ৫ দেহখন্ডকে ৫ জোড়া ওসেলি রয়েছে।
৫. পশ্চাৎপ্রান্তে একটি থালার মত পশ্চাৎ চোষক রয়েছে।

চিত্র : *Hirudinaria manillensis*

Phylum – Arthropoda

চিংড়ি—*Macrobrachium (= Palaemon) malcolmsonii*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Arthropoda
Class—Malacostraca
Order—Decapoda
Family—Palaemonidae
Genus—Macrobrachium
Species—*Macrobrachium malcolmsonii*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. দেহ লম্বাটে, দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম এবং দুটি অংশে বিভক্ত–শিরোবক্ষ ও উদর।
২. শিরোবক্ষ অখন্ডিত, শক্ত ও ক্যারাপেস দিয়ে আবৃত।
৩. ক্যারাপেসের অগ্রভাগে করাতের মতো রোস্ট্রাম আছে।
৪. দুজোড়া অ্যান্টেনা ও বৃন্তযুক্ত একজোড়া পুঞ্জাক্ষি বিদ্যমান।

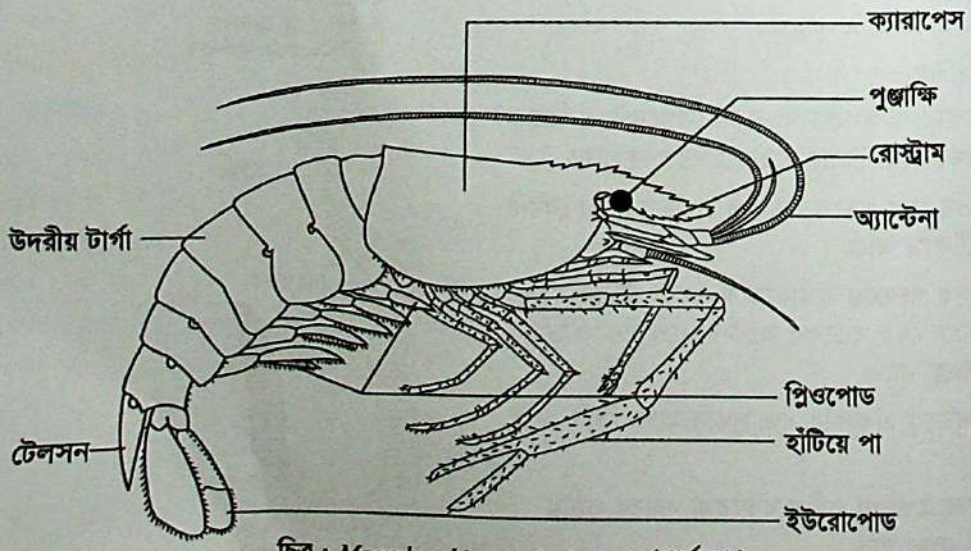

চিত্র : *Macrobrachium malcolmsonii* (পার্শ্বদৃশ্য)

www.Educationblog24.Com

কাঁকড়া—*Portunus pelagicus*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Arthropoda
Class—Malacostraca
Order—Decapoda
Family—Portunidae
Genus—*Portunus*
Species—*Portunus pelagicus*

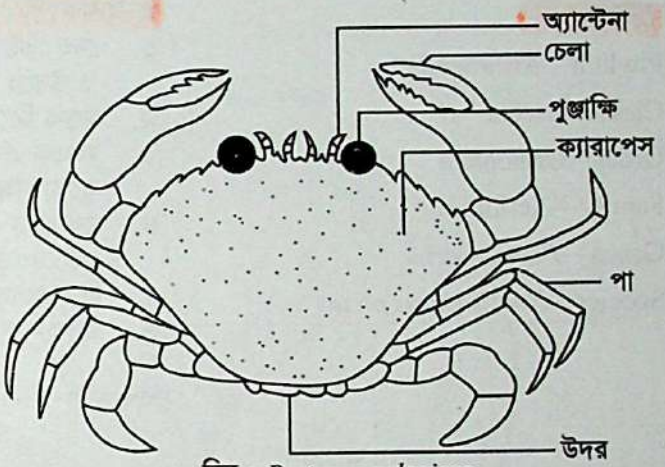

চিত্র : *Portunus pelagicus*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. দেহ ডিম্বাকার, চাপা ও শক্ত কিউটিকল-এ আবৃত।
২. ক্যারাপেস সমগ্র দেহ জুড়ে অবস্থিত।
৩. উদর ক্যারাপেসের অংকীয়ভাগে অবস্থিত।
৪. পাঁচজোড়া পায়ের মধ্যে প্রথম জোড়া সুগঠিত চিমটার মতো চেলাবিশিষ্ট।
৫. দুজোড়া অ্যান্টেনা ও একজোড়া বৃন্তযুক্ত পুঞ্জাক্ষি বিদ্যমান।

আরশোলা—*Periplaneta americana*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Arthropoda
Class—Insecta
Order—Dictyoptera
Family—Blattidae
Genus—*Periplaneta*
Species—*Periplaneta americana*

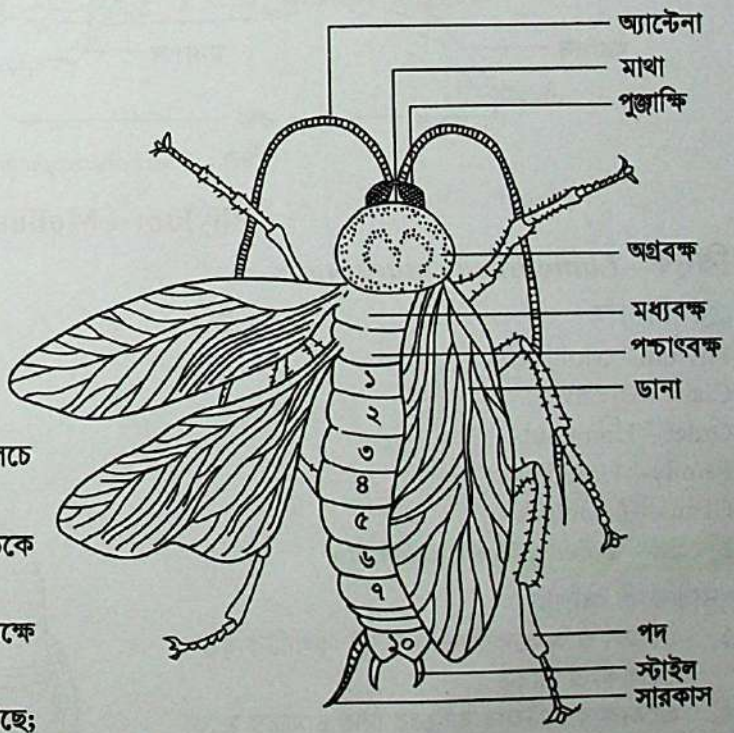

চিত্র : *Periplaneta americana*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. দেহ সরু, লম্বাটে, তেলেতেলে ও লালচে বাদামী বর্ণের।
২. দেহ কিউটিকল-এ আবৃত এবং নির্দিষ্ট খন্ডকে বিভক্ত।
৩. দেহ মস্তক, বক্ষ ও উদর-এ বিভক্ত; বক্ষে তিনটি ও উদরে ১০টি খন্ড রয়েছে।
৪. মাথায় দুটি পুঞ্জাক্ষি, দুটি অ্যান্টেনা আছে; বক্ষে তিন জোড়া পদ ও দুজোড়া ডানা রয়েছে।
৫. উদরের শেষ প্রান্তে অ্যানাল সারকি (একবচনে-সারকাস) রয়েছে।

www.Educationblog24.Com

ঘাস ফড়িং—*Poekilocerus pictus*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Arthropoda
Class—Insecta
Order—Orthoptera
Family—Acrididae
Genus—*Poekilocerus*
Species—*Poekilocerus pictus*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. দেহ কিউটিকলে আবৃত, হলদে-সবুজ রংয়ের এবং মস্তক, বক্ষ ও উদরে বিভক্ত।
২. মস্তক ত্রিকোণাকার ও নিম্নমুখী উল্লম্বভাবে অবস্থিত।
৩. মস্তকে একজোড়া পুঞ্জাক্ষি, ওসেলি ও অ্যান্টেনা এবং **চর্বনক্ষম মুখোপাঙ্গ** রয়েছে।
৪. মধ্যবক্ষে একজোড়া সরু ও শক্ত এবং পশ্চাৎবক্ষে একজোড়া বড়, চওড়া ও ঝিল্লিময় ডানা আছে।
৫. তিন জোড়া **সন্ধিল** পদ রয়েছে।
৬. উদর সরু, লম্বা ও ১১টি খন্ডকে বিভক্ত।

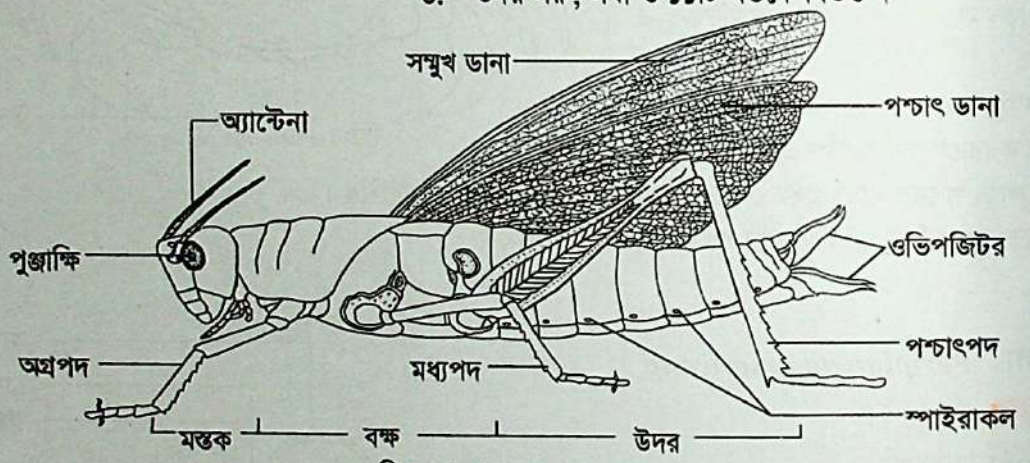

চিত্র : *Poekilocerus pictus*

Phylum – Mollusca

ঝিনুক—*Lamellidens marginalis*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Mollusca
Class—Bivalvia
Order—Unionoida
Family—Unionidae
Genus—*Lamellidens*
Species—*Lamellidens marginalis*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. কোমল ও অখন্ডকায়িত দেহ দুই কপাটিকাযুক্ত **খোলক**-এ আবৃত।
২. প্রত্যেক কপাটিকার বাইরের দিক চামচের মতো উত্তল ও অভ্যন্তর ভাগ অবতল।
৩. প্রত্যেক কপাটিকা দু'পাশে চাপা, পশ্চাদঅংশ সবচেয়ে বেশি স্থূল এবং কব্জা রেখায় সংযুক্ত।
৪. কব্জা রেখা সংলগ্ন পৃষ্ঠ-পার্শ্বভাগে আম্বো নামে একটি করে উঁচু অংশ আছে।
৫. আম্বোকে ঘিরে বৃদ্ধি রেখা অবস্থিত।

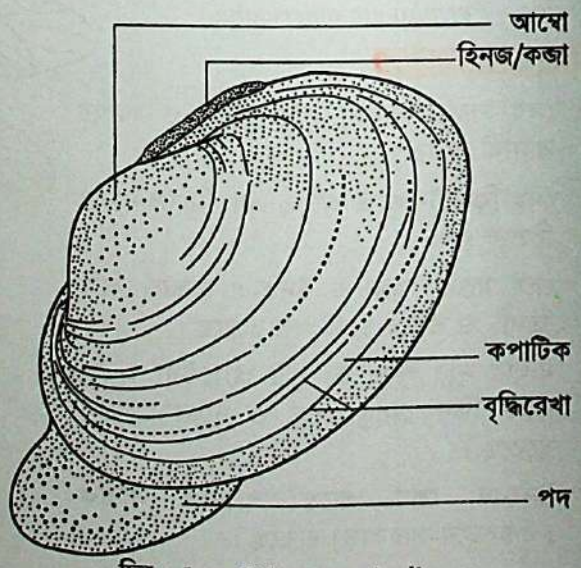

চিত্র : *Lamellidens marginalis*

www.Educationblog24.Com

আপেল শামুক—*Pila globosa*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Mollusca
Class—Gastropoda
Order—Mesogastropoda
Family—Pilidae
Genus—*Pila*
Species—*Pila globosa*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. কোমল দেহ একটি আপেল আকৃতির শক্ত **খোলক**-এ আবৃত।
২. খোলকের পৃষ্ঠদেশ ৪ আবর্তের প্যাঁচযুক্ত এবং শীর্ষে চূড়া অবস্থিত।
৩. খোলকের মুখে বাংলা '৫' সংখ্যার মতো **অপারকুলাম** নামে একটি ঢাকনা আছে।
৪. খোলকে ও অপারকুলামে **বৃদ্ধিরেখা** উপস্থিত।
৫. দেহের অঙ্কীয়দেশে মাংসল পিন্ডাকার পদ এবং পদের পৃষ্ঠদেশে **অপারকুলাম** যুক্ত।

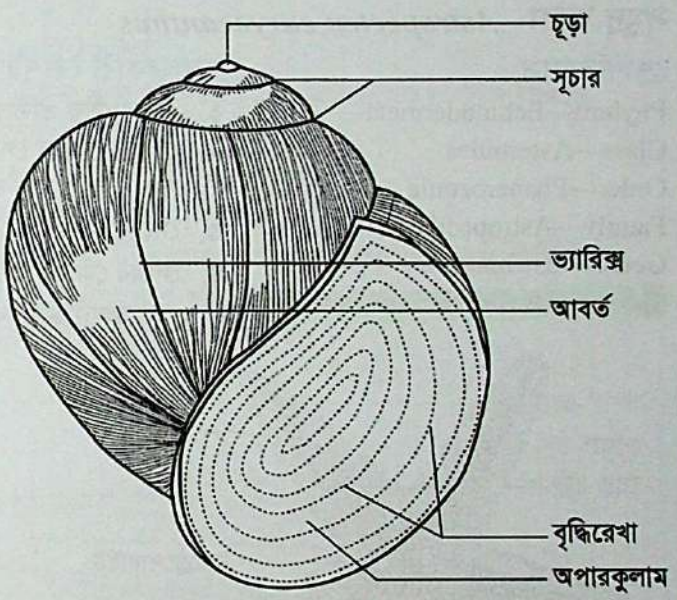

চিত্র : *Pila globosa*

ডেভিল ফিশ—*Octopus macropus*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Mollusca
Class—Cephalopoda
Order—Octopoda
Family—Octopodidae
Genus—*Octopus*
Species—*Octopus macropus*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১ দেহ **ম্যান্টল**-এ আবৃত, কোমল, ডিম্বাকার এবং প্রকৃত খোলকবিহীন।
২. মুখছিদ্র ৮টি **মৌখিক বাহুতে** পরিবৃত।
৩. বাহুগুলো শরীরের চেয়ে লম্বা, একই আকৃতির ও **চোষকযুক্ত** এবং গোড়ার দিকে পরস্পরের সাথে **লিপ্তপাদ** (web) দিয়ে যুক্ত।
৪. ডান পাশের ৩য় বাহুটি জননের উদ্দেশ্যে বিশেষ গড়নের (হেক্টোকটিল)।

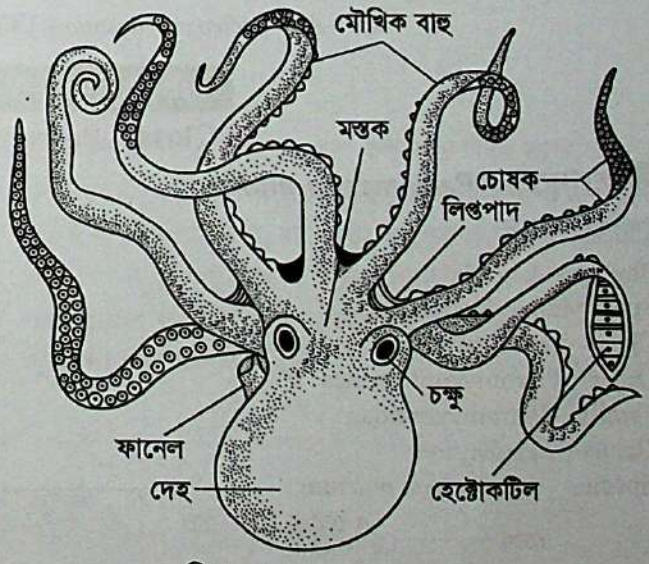

চিত্র : *Octopus macropus*

www.Educationblog24.Com

Phylum – Echinodermata

সমুদ্র তারা—*Astropecten euryacanthus*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Echinodermata
Class—Asteroidea
Order—Phanerozonia
Family—Astropectinidae
Genus—*Astropecten*
Species—*Astropecten euryacanthus*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. দেহ অরীয় প্রতিসম, চাপা ও তারকাসদৃশ এবং কাঁটাময় ত্বকে আবৃত।
২. দেহের কেন্দ্রে গোল **কেন্দ্রীয় চাকতি** থেকে পাঁচটি বাহু সমদূরত্বে পাঁচদিকে প্রসারিত।
৩. দেহের বিমৌখিক তলে **ম্যাড্রেপোরাইট** ও পায়ু রয়েছে।
৪. দেহের মৌখিক তলে প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য বরাবর **অ্যাম্বুল্যাক্রাল** খাদ আছে।
৫. **অ্যাম্বুল্যাক্রাল** খাদের উভয় পাশে সারিবদ্ধ **নালিকাপদ** অবস্থিত।

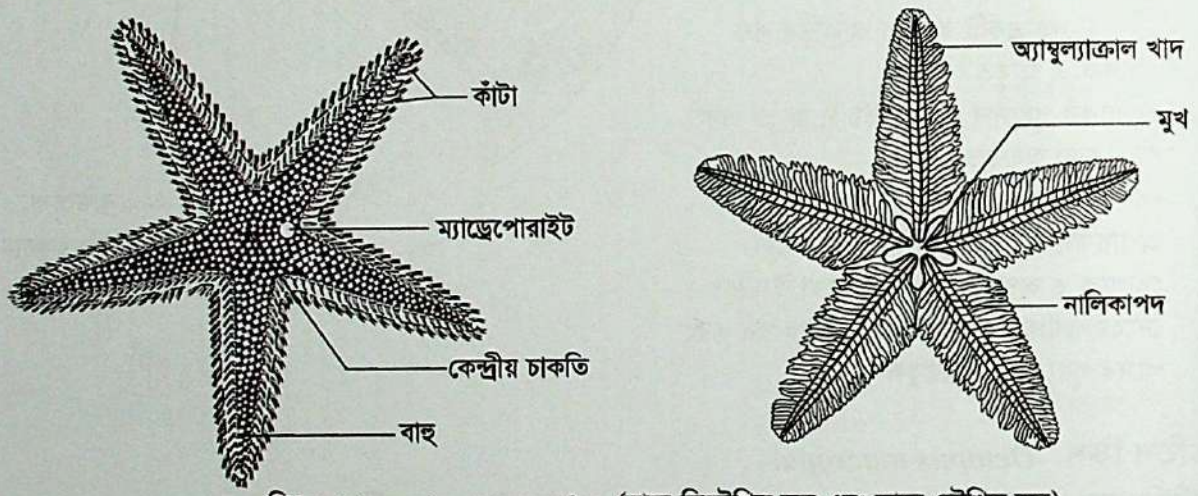

চিত্র : *Astropecten euryacanthus* (বায়ে-বিমৌখিক তল এবং ডানে-মৌখিক তল)

Subphylum–Vertebrata

Class – Petromyzontida

সী ল্যাম্প্রে— *Petromyzon marinus*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Chordata
Subphylum—Vertebrata
Class—Petromyzontida
Order—Petromyzontiformes
Family—Petromyzontidae
Genus—*Petromyzon*
Species—*Petromyzon marinus*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. দেহ নলাকার, **আঁইশ** ও **জোড় পাখনাবিহীন**।
২. মুখ **চোয়ালবিহীন**, তীক্ষ্ণ **হর্ণি দাঁত** যুক্ত।
৩. সাতজোড়া বৃত্তাকার **ফুলকারন্ধ্র** অবস্থিত।
৪. দুটি পৃষ্ঠ-পাখনাযুক্ত।

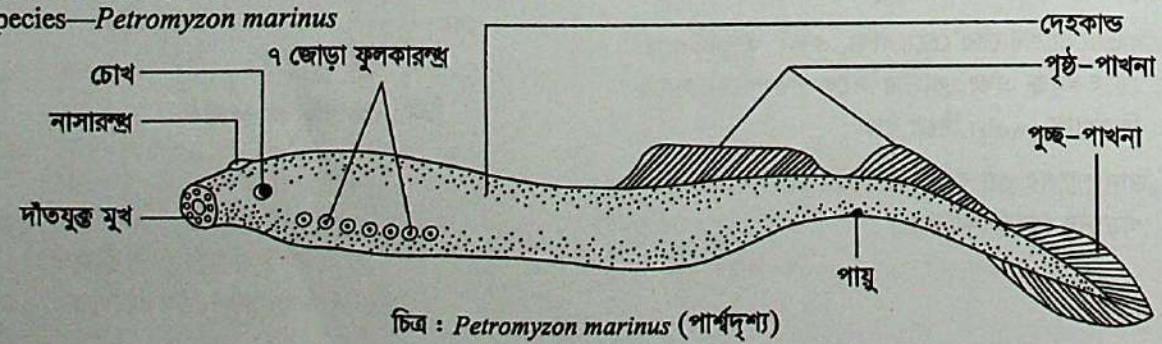

চিত্র : *Petromyzon marinus* (পার্শ্বদৃশ্য)

www.Educationblog24.Com

Class – Chondrichthyes

হাঙর—*Scoliodon laticaudus*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Chordata
Subphylum—Vertebrata
Class—Chondrichthyes
Order—Carcharhiniformes
Family—Carcharhinidae
Genus—*Scoliodon*
Species—*Scoliodon laticaudus*
(আগের নাম—*Scoliodon sorrakowah*)

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. দেহ লম্বা ও দুপাশে চাপা এবং মস্তক, ধড় ও লেজ অঞ্চলে বিভক্ত।
২. ত্বক প্লাকয়েড আঁইশে আবৃত।
৩. লেজ হেটেরোসার্কাল ধরনের।
৪. মস্তক উপর-নিচে চাপা এবং সম্মুখে সূঁচালো তুন্ডে সমাপ্ত।
৫. মাথার অঙ্কীয়দেশে মুখছিদ্র এবং চোখের পেছনে প্রতিপাশে পাঁচটি করে মোট পাঁচজোড়া ফুলকারন্ধ্র।

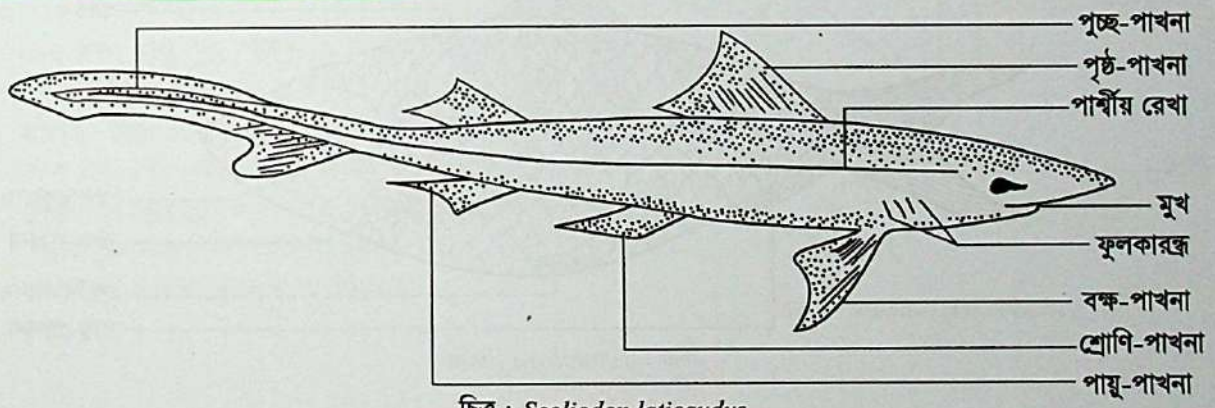

চিত্র : *Scoliodon laticaudus*

Class – Actinopterygii

টাকি মাছ—*Channa punctatus*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Chordata
Subphylum —Vertebrata
Class—Actinopterygii
Order—Channiformes
Family—Channidae
Genus—*Channa*
Species—*Channa punctatus*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. দেহ কালচে ধূসর রঙের, দুপাশ হল্‌দে ও উদর দাগযুক্ত।
২. দেহ লম্বাটে ও নলাকার এবং সাইক্লয়েড আঁইশ-এ আবৃত।
৩. মস্তক উপর-নিচে চাপা, অনেকটা সাপের মতো দেখতে।
৪. পৃষ্ঠ-পাখনা ও পায়ু-পাখনা অনেক লম্বা।
৫. বক্ষ-পাখনা ও শ্রোণি-পাখনা কাছাকাছি অবস্থিত।
৬. পুচ্ছ-পাখনা গোলাকার।

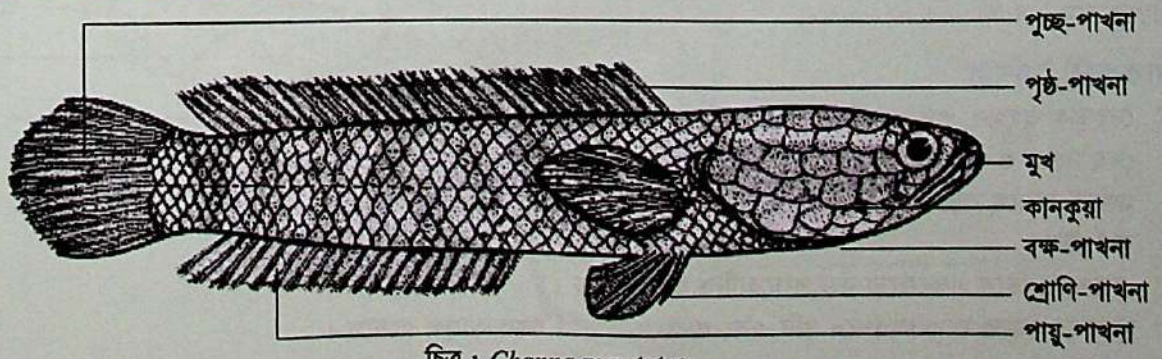

চিত্র : *Channa punctatus*

www.Educationblog24.Com

ইলিশ মাছ— *Tenualosa ilisha*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Chordata
Subphylum—Vertebrata
Class—Actinopterygii
Order—Clupeiformes
Family—Clupeidae
Genus—*Tenualosa*
Species—*Tenualosa ilisha*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম, চাপা, মাকুর মতো দেহ, ঝকঝকে **রূপালী রঙ**।
২. মাথা বেশ বড় ও চাপা, প্রান্তীয় মুখছিদ্রযুক্ত।
৩. চোখদুটি বেশ বড় ও স্বচ্ছ অ্যাডিপোজ আবরণী দিয়ে ঢাকা।
৪. উপরের চোয়ালের সম্মুখভাগে একটি খাঁজ আছে।
৫. পুচ্ছ-পাখনা **হোমোসার্কাল**।

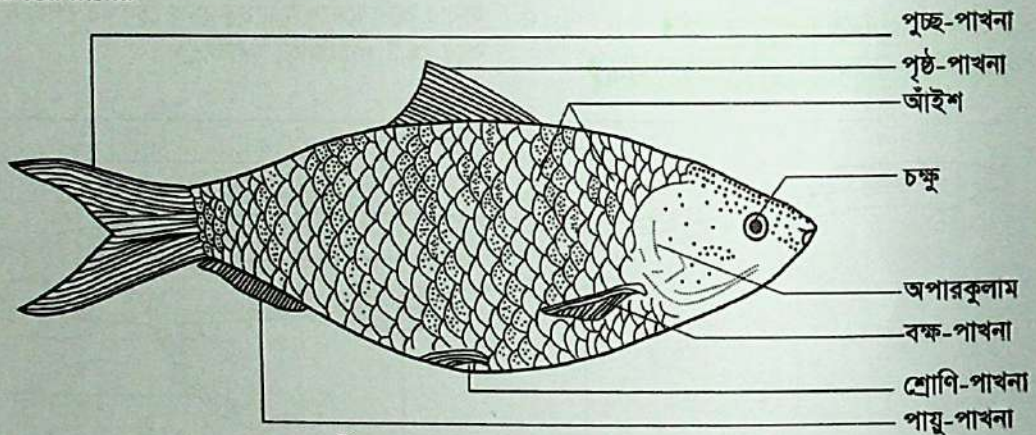

চিত্র : *Tenualosa ilisha*

Class – Amphibia

কুনোব্যাঙ—*Duttaphrynus melanostictus*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Chordata
Subphylum—Vertebrata
Class—Amphibia
Order—Anura
Family—Bufonidae
Genus—*Duttaphrynus*
Species—*Duttaphrynus melanostictus*
(আগের নাম—*Bufo melanostictus*)

চিত্র : *Duttaphrynus melanostictus*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. দেহত্বক অসমৃণ, শুষ্ক ও **আঁচিলযুক্ত**।
২. দেহ মস্তক ও ধড়-এ বিভক্ত।
৩. মস্তকে রয়েছে বড় ও উঁচু চোখ, নাসারন্ধ্র ও **কর্ণপটহ**।
৪. চোখের পেছনে একজোড়া বড় প্যারোটিড গ্রন্থি আছে।
৫. দুজোড়া পদের মধ্যে অগ্রপদে ৪টি এবং পশ্চাৎপদে ৫টি করে আঙ্গুল রয়েছে।

www.Educationblog24.Com

Class—Reptilia

টিকটিকি—*Hemidactylus brookii*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Chordata
Subphylum—Vertebrata
Class—Reptilia
Order—Squamata
Family—Gekkonidae
Genus—*Hemidactylus*
Species—*Hemidactylus brookii*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. দেহ সরু, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁইশ-এ আবৃত এবং তিনটি অংশে বিভক্ত-মাথা, দেহকান্ড ও লেজ।
২. মাথাটি ত্রিকোণাকার এবং একজোড়া চোখ, একজোড়া নাসারন্ধ্র এবং একজোড়া কর্ণপটহ বহন করে।।
৩. দেহকান্ডে দুজোড়া পা আছে। প্রতি পায়ে পাঁচটি করে প্যাডযুক্ত নখরবিশিষ্ট আঙ্গুল আছে।
৪. অবসারণী ছিদ্র আড়াআড়ি অবস্থিত।
৫. লেজ লম্বা।

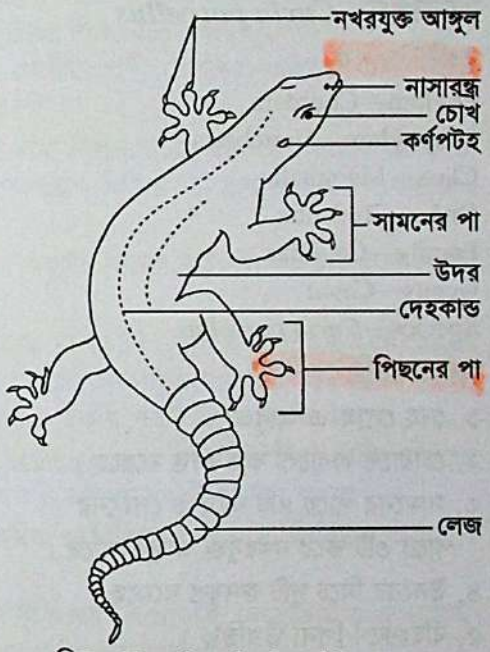

চিত্র : *Hemidactylus brookii*

Class – Aves

দোয়েল পাখি—*Copsychus saularis*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Chordata
Subphylum—Vertebrata
Class—Aves
Order—Passeriformes
Family—Muscicapidae
Genus—*Copsychus*
Species—*Copsychus saularis*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. দেহ পালক-এ আবৃত; পালকগুলো সাদা-কালো বর্ণযুক্ত (স্ত্রী দোয়েলে নীলচে-ধূসর)।
২. লেজ বেশ লম্বা ও তির্যকভাবে অবস্থিত।
৩. ডানা লম্বা সাদা দাগসহ কাল্‌চে-বাদামি।
৪. লেজ কালো, কিন্তু বাইরের পালক সাদা।
৫. গলা ও বুক নীলচে-কালো (স্ত্রী দোয়েলে নীলচে-ধূসর)।

চিত্র : *Copsychus saularis*

www.Educationblog24.Com

Class—Mammalia

গিনিপিগ—*Cavia porcellus*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Chordata
Subphylum—Vertebrata
Class—Mammalia
Order—Rodentia
Family—Caviidae
Genus—*Cavia*
Species—*Cavia porcellus*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. দেহ লোম-এ আবৃত।
২. চোয়ালে ধারালো কর্তনদন্ত রয়েছে।
৩. সামনের পায়ে ৪টি করে ও পেছনের পায়ে ৩টি করে নখরযুক্ত আঙ্গুল আছে।
৪. উদরের নিচে দুটি স্তনবৃন্ত রয়েছে।
৫. বহিঃকর্ণে পিনা উপস্থিত।

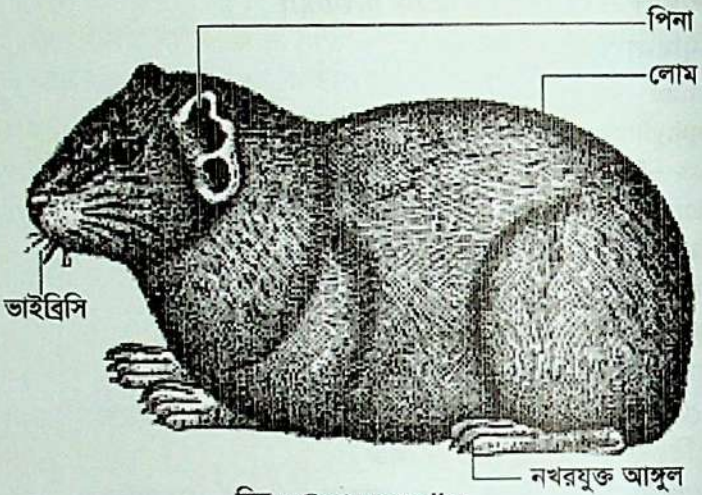

চিত্র : *Cavia porcellus*

বাদুড় (Fruit Bat)—*Pteropus giganteus*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Chordata
Subphylum—Vertebrata
Class—Mammalia
Order—Chiroptera
Family—Pteropodidae
Genus—*Pteropus*
Species—*Pteropus giganteus*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. দেহ লোমে আবৃত এবং পিনা ও স্তনগ্রন্থিযুক্ত।
২. অগ্রপদের আঙ্গুলগুলো লম্বা ও প্যাটাজিয়াম (patagium) নামক পর্দায় অবলম্বিত হয়ে ডানায় রূপান্তরিত।
৩. বড় আকৃতির, লেজবিহীন বাদুর।
৪. মাথা লালচে বাদামী, তুন্ড কালো।
৫. পায়ের আঙ্গুল বাঁকা ও ধারালো নখরযুক্ত।

চিত্র : *Pteropus giganteus*

www.Educationblog24.Com

প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

ট্যাক্সন : ট্যাক্সন হচ্ছে শ্রেণিবদ্ধগত একক। কোনো প্রাণীকে শ্রেণিবিন্যাসের কোনো স্তরে স্থান দিলে সেটি যে নাম প্রাপ্ত হয় তাই ঐ প্রাণীর ট্যাক্সন। যেমন-Mammalia, Primates ইত্যাদি।

ক্যাটাগরি : এটি শ্রেণিবিন্যাসের ধাপ। যে নির্দিষ্ট ধাপে বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রাণী (ট্যাক্সন) অবস্থান করে তাকে ক্যাটাগরি বলে। যেমন-Phylum, Class, Order ইত্যাদি।

প্রজাতি : প্রাকৃতিক পরিবেশে কোনো জীবগোষ্ঠী যদি নিজেদের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে জননক্ষম সন্তান উৎপাদনে সক্ষম হয় কিন্তু অন্য কোনো গোষ্ঠীর সাথে প্রজননগতভাবে বিচ্ছিন্ন বা আলাদা থাকে তখন সেই জীবগোষ্ঠীকে প্রজাতি বলে।

দ্বিপদ নামকরণ : জীবের নামকরণে আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে গণ ও প্রজাতি নামের দুটি পদ ব্যবহার করে প্রাণীর যে নামকরণ করা হয় তাকে দ্বিপদ নামকরণ বলে।

ত্রিপদ নামকরণ: অনেক সময় একটি প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে বৈচিত্র্য বা ভিন্নতা সুস্পষ্ট ও প্রকট হলে তাদের শ্রেণিবিন্যাসে উপ-প্রজাতি পদের প্রয়োজন হয়। উপ-প্রজাতির নামকরণে তিন পদ ব্যবহার করা হয়। প্রথম পদটি গণ-নাম, দ্বিতীয় পদটি প্রজাতি-নাম ও তৃতীয় পদটি উপ-প্রজাতি নাম।

ICZN : International Commission on Zoological Nomenclature. এটি পৃথিবীর প্রাণিসদস্যদের শ্রেণিকরণ ও নামকরণে প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকারী সর্বোচ্চ সংস্থা।

লিনিয়ান হায়ারার্কি: প্রাণী শ্রেণিবিন্যাসে ব্যবহৃত বিভিন্ন স্তরবিশিষ্ট অনুক্রমিক শ্রেণিবিন্যাস কাঠামো লিনিয়ান হায়ারার্কি নামে পরিচিত।

ভ্রূণস্তর : একটি প্রাণিভ্রূণে গ্যাস্ট্রুলেশন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তিনটি মৌলিক স্তর (এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম ও এন্ডোডার্ম) যা থেকে প্রাণীর বিভিন্ন অঙ্গ ও টিস্যু সৃষ্টি হয় সেই স্তরগুলির নাম ভ্রূণস্তর।

খণ্ডকায়ন : সদৃশ দেহখণ্ডের রৈখিক বা অনুদৈর্ঘ্যিক পুনরাবৃত্তিকে খণ্ডকায়ন বা মেটামেরিজম বলে।

প্রতিসাম্য : অক্ষের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রাণিদেহের বিভিন্ন অঙ্গের সুষম বণ্টনকে প্রতিসাম্য বলে।

সিলোম : পৌষ্টিকনালি ও দেহপ্রাচীরের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান, যা মেসোডার্মাল পেরিটোনিয়ামে আবৃত থাকে তাকে সিলোম বলে।

অঞ্চলায়ন : কিছু প্রাণিদেহ বাহ্যিকভাবে খণ্ডায়িত হলেও অনেকক্ষেত্রে খণ্ডগুলো স্পষ্ট নয়। বরং খণ্ডকগুলো একত্রে মিলিত হয়ে দেহে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চল বা ট্যাগমায় বিভক্ত হয়। এ ধরনের বিভাজনকে অঞ্চলায়ন বা ট্যাগমাটাইজেশন বলে।

পলিপ : Cnidaria-র জীবনচক্রের নিশ্চল দশাকে পলিপ বা অযৌন দশা বলে। এর দণ্ডাকার দেহের একপ্রান্ত ভিত্তির সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং অন্যপ্রান্ত কর্ষিকায় ঘেরা মুখছিদ্র বহন করে।

মেডুসা : Cnidaria-র জীবনচক্রের সাঁতারু দশাকে মেডুসা বা যৌন দশা বলে।

সিলেন্টেরন : Cnidaria পর্বের প্রাণীর দেহের অভ্যন্তরে যে লম্বাকার একটি গহ্বর থাকে তাকে সিলেন্টেরন বা গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার গহ্বর বলে।

নিডোসাইট : Cnidaria পর্বের প্রাণীর এপিডার্মিসে অবস্থিত নেমাটোসিস্ট বহনকারী, শিকার ধরা ও আত্মরক্ষায় সাহায্যকারি বিশেষ ধরনের কোষ হচ্ছে নিডোসাইট।

নেফ্রিডিয়া : Annelida পর্বের প্রাণিদের রেচন অঙ্গকে নেফ্রিডিয়া বলে।

পুঞ্জাক্ষী : Arthropoda পর্বের প্রাণিদের মস্তকের একজোড়া উত্তল, কালো অংশকে পুঞ্জাক্ষী বলে।

সাইক্লয়েড আঁইশ : যে ধরনের আঁইশ চাকতির মতো, প্রায় গোলাকার এবং মসৃণ কিনারাযুক্ত হয়, সে ধরনের আঁইশকে সাইক্লয়েড আঁইশ বলে। যেমন– রুই, কাতল, মৃগেল, ইলিশ ইত্যাদি মাছের আঁইশ।

ডায়াফ্রাম : যে মাংসল স্থিতিস্থাপক অনুপ্রস্থ পর্দা স্তন্যপায়ী প্রাণীর বক্ষ গহ্বরকে উদর গহ্বর থেকে পৃথক করে রাখে তার নাম ডায়াফ্রাম। এটি প্রাণীর শ্বাসকার্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

www.Educationblog24.Com

লাল-সবুজে দাগানো

TEXT BOOK

প্রাণিবিজ্ঞান

উন্মেষ
মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল এডমিশন কেয়ার

www.Educationblog24.Com

২.২ প্রতীক প্রাণী : ঘাসফড়িং (The Grasshopper, *Poekilocerus pictus*)

আরশোলার মতো ঘাসফড়িংও একটি অতিপরিচিত **পতঙ্গ** (insect)। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সবখানে সবুজ শস্যক্ষেত বা সবজির বাগানে বিভিন্ন ধরনের ঘাসফড়িং একা বা দলবদ্ধ হয়ে বিচরণ করে। ঘাসফড়িং-এর কিছু প্রজাতি **পঙ্গপাল** (locust) নামে পরিচিত। এগুলো বাদামি বর্ণের মাঝারি আকৃতির পতঙ্গ এবং ঝাঁক বেঁধে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় ঘুরে বেড়ায়। কখনও কখনও এদের সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে মুহূর্তের মধ্যে একটি ক্ষেতের সমস্ত ফসল খেয়ে সাবাড় করে ফেলতে পারে। পঙ্গপাল গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশের শস্যক্ষেতের জন্য মারাত্মক হুমকি।

ঘাসফড়িং যেহেতু একটি করে কাইটিনময় **বহিঃকঙ্কাল**, একটি তিনখণ্ডবিশিষ্ট দেহ (মস্তক, বক্ষ ও উদর), তিনজোড়া সন্ধিযুক্ত পা, জটিল **পুঞ্জাক্ষি** এবং একজোড়া **অ্যান্টেনা** বহন করে সে কারণে এদের **Insecta** শ্রেণিভুক্ত সদস্য বা পতঙ্গ নামে অভিহিত করা হয়। ঘাস ও লতাপাতার মধ্যে থেকে সেখানেই লাফিয়ে চলে, তাই এর নাম হয়েছে "ঘাসফড়িং"। ঘাসফড়িং দুধরনের, যথা–লম্বা অ্যান্টিনাযুক্ত ঘাসফড়িং-এরা Tettinonidae গোত্রের এবং খাটো অ্যান্টেনাযুক্ত ঘাসফড়িং–এরা Acrididae গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত *Poekilocerus pictus* আমাদের দেশের খাটো অ্যান্টিনাযুক্ত ঘাসফড়িংয়ের অন্যতম।

পৃথিবীতে প্রায় বিশ হাজার প্রজাতির ঘাসফড়িং শনাক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যে বিশ প্রজাতির ঘাসফড়িংয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলো হচ্ছে–*Acrida exaltata, Phlaeoba infumata, Choroedocus robustus, Xenocatantops humilis, Chondracris rosea, Cyrtacanthacris tatarica, Eyprepocnemis rosea, Aulacobothrus luteipes, Hieroglyphus banian, Gastrimargus marmoratus, Oedaleus abruptus, Sphingonotus longipennis, Trilophidia annulata, Gesonula punctifrons, Oxya fuscovittata, Spathosternum prasiniferum, Atractomorpha crenulata, Chrotogonus trachypterus,* এবং *Poekilocerus pictus.*

[***Reference:*** Srinivasan, G. and Prabakar, D. 2013. A Pictorial Handbook on Grasshoppers of Western Himalayas.]

শ্রেণিতাত্ত্বিক অবস্থান

Phylum : Arthropoda (সন্ধিপদী, কাইটিননির্মিত বহিঃকঙ্কাল)
Class : Insecta (তিনজোড়া সন্ধিযুক্ত পদ)
Subclass : Pterygota (ডানাবিশিষ্ট পতঙ্গ)
Order : Orthoptera (দুজোড়া ডানাবিশিষ্ট)
Family : Acrididae (খাটো অ্যান্টেনা)
Genus : *Poekilocerus*
Species : *Poekilocerus pictus*

চিত্র ২.২.১ : *Poekilocerus pictus* (প্রাকৃতিক পরিবেশে)

বাসস্থান (Habitat) : ঘাসফড়িং যেহেতু ঘাস, পাতা, শস্য ও শস্যের কচিপাতা আহার করে সে কারণে এমন ধরনের নিচু বসতি এদের পছন্দ। মূলত সব ধরনের আবাসেই (তৃণভূমি, বারিবন, চারণভূমি, মাঠ, মরুভূমি, জলাভূমি প্রভৃতি) বিভিন্ন প্রজাতির ঘাসফড়িং দেখা যায়। স্বাদুপানির ও ম্যানগ্রোভ জলাশয়ে যেহেতু পানির উঠানামা বেশি হয় এবং ডিম পাড়ার জায়গা প্লাবিত হয়ে যায় সে কারণে এসব বসতিতে ঘাসফড়িং কম বাস করে। প্রতিকূল আবহাওয়ায় ঘাসফড়িং বিপুল সংখ্যায় পরিযায়ী (migratory) হয়, তখন দিনে প্রায় ১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত যেতে পারে।

খাদ্য (Food) : ঘাসফড়িং তৃণভোজী বা **শাকাশী** (herbivorous) প্রাণী। ডিম থেকে ফোটার পরপরই, নিম্ফ অবস্থায় ঘাসফড়িং চার পাশের যে কোন ছোট ছোট, সহজপাচ্য গাছ, ঘাস বা নতুন কোমল শাখা-প্রশাখা খেতে শুরু করে। দু'একবার খোলস মোচনের পর একটু বড় হলে শক্ত উদ্ভিজ খাবার গ্রহণ করে। তরুণ ঘাসফড়িং পূর্ণাঙ্গদের মতোই নির্দিষ্ট উদ্ভিজ খাবার গ্রহণ করে। তখন খাদ্য তালিকায় ঘাস, পাতা ও শস্য প্রধান খাবার হিসেবে উঠে আসে। বেশির ভাগ ঘাসফড়িং অনেক প্রজাতির উদ্ভিদ থেকে আহার সংগ্রহ করে, দু'একটি প্রজাতি সুনির্দিষ্ট উদ্ভিদ থেকে আহার গ্রহণ করে।

www.Educationblog24.Com

বাহ্যিক অঙ্গসংস্থান (External Morphology)

ঘাসফড়িং-এর দেহ সরু, লম্বাটে, বেলনাকার (cylindrical) এবং দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম। পূর্ণাঙ্গ প্রাণী লম্বায় ৮ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। দেহের রঙ অনেকটা হলদে-সবুজ (yellowish green) ধরনের অথবা বাদামি রঙের মাঝে নানা ধরনের ফোঁটা (spots) বা ডোরাকাটা (markings) হতে পারে। মিশ্রিত এ রঙ তাদের পরিবেশের সাথে মানিয়ে চলতে এমনকি শত্রুর হাত থেকেও রক্ষা করতে সাহায্য করে। এছাড়াও কিছু ঘাসফড়িং আছে উজ্জ্বল নীল-হলুদ রঙের (যেমন-*Poekilocerus pictus*)।

ঘাসফড়িং-এর সারাদেহ কাইটিনযুক্ত **কিউটিকল** (cuticle)-এ আবৃত। বহিঃকঙ্কাল **হাইপোডার্মিস** (hypodermis) নিঃসৃত পদার্থে সৃষ্ট এবং প্রত্যেক দেহখন্ডকে **স্ক্লেরাইট** (sclerite) নামক কঠিন প্লেটের মতো গঠন সৃষ্টি করে। স্ক্লেরাইটগুলোর সংযোগস্থল **সূচার** (suture) নামে পাতলা নরম ঝিল্লিতে আবৃত। সূচারের উপস্থিতির কারণে দেহখণ্ডক ও উপাঙ্গগুলো সহজেই নড়াচড়া করতে পারে। কিউটিকলের ভিতরে ও নিচে নানা ধরনের রঞ্জক পদার্থ (pigments) থাকায় ঘাসফড়িং-এ বর্ণময়তা দেখা যায়।

চিত্র ২.২.২ : ঘাসফড়িং-এর বাহ্যিক গঠন (পার্শ্বদৃশ্য)

ঘাসফড়িং-এর দেহ খণ্ডকায়িত এবং অন্যসব পতঙ্গের মতো তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত, যেমন–

ক. মস্তক (Head)–পুঞ্জাক্ষি, অ্যান্টেনা ও মুখোপাঙ্গ বহন করে।

খ. বক্ষ (Thorax)–তিনজোড়া পা ও দুজোড়া ডানার সংযোগ সাধন করে এবং বহন করে।

গ. উদর (Abdomen)-শ্বাসরন্ধ্র বা স্পাইরাকল (spiracle) এবং জনন অঙ্গসমূহ (genitaliae) ধারণ করে।

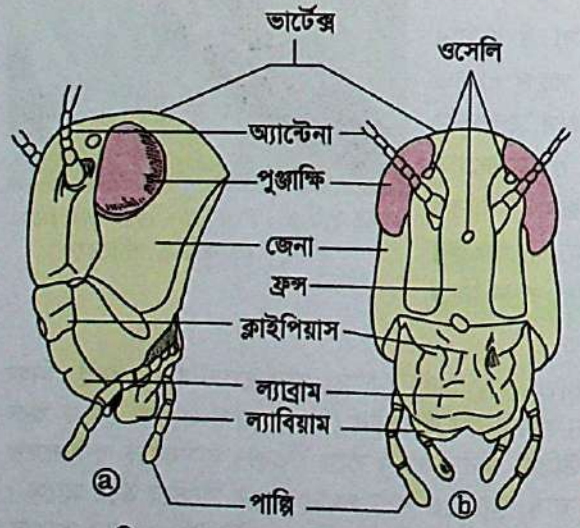

চিত্র ২.২.৩ : ঘাসফড়িং-এর মস্তক;
a. পার্শ্বদৃশ্য এবং b. সম্মুখদৃশ্য

ক. মস্তক (Head)

বাইরে থেকে অখণ্ডকিত (একক) মনে হলেও মূলত ৬টি ভ্রূণীয় খণ্ডকের (embryonic segments) সমন্বয়ে মস্তক গঠিত। এটি দেখতে নাশপাতি আকৃতির এবং হাইপোগন্যাথাস (hypognathous) ধরনের অর্থাৎ মুখছিদ্র নিম্নমুখী হয়ে মস্তকের নিচে অবস্থান করে। মস্তক একটি ছোট ও স্থিতিস্থাপক গ্রীবার সাহায্যে বক্ষলগ্ন হয়ে দেহের সমকোণে অবস্থান করে। ঘাসফড়িং গ্রীবার মাধ্যমে মস্তককে বিভিন্ন দিকে ঘোরাতে পারে। মস্তকের বহিঃকঙ্কালের নাম **হেড ক্যাপস্যুল** (head capsule) বা **এপিক্রেনিয়াম** (epicranium)। মস্তকের বহিঃকঙ্কাল কয়েকটি অংশে বিভক্ত, যেমন– পৃষ্ঠদেশের ত্রিকোণাকার অঞ্চলটি **ভার্টেক্স** (vertex), দুপাশে অবস্থিত **জেনা** (gena), কপালের দিকে চওড়া **ফ্রন্স** (frons) এবং ফ্রন্সের নিচে আয়তাকার প্লেটটি **ক্লাইপিয়াস** (clypeus)। ঘাসফড়িং-এর মস্তক একজোড়া পুঞ্জাক্ষি, তিনটি

www.Educationblog24.Com

সরলাক্ষি বা ওসেলি (ocilli), একজোড়া অ্যান্টেনা (antenna) ও এক সেট মুখোপাঙ্গ বহন করে। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

১. **পুঞ্জাক্ষি** (Compound eye) : ঘাসফড়িং-এর মস্তকের উভয়দিকে পৃষ্ঠ-পার্শ্বদেশে, ১ম খণ্ডকে একজোড়া পুঞ্জাক্ষি থাকে। এগুলো অবৃন্তক এবং মস্তকের এক বিরাট অংশ দখল করে থাকে। দৃষ্টিশক্তির দিক থেকে ঘাসফড়িং যে কোনো আর্থোপোড অপেক্ষা উন্নত। এরা সম্ভবত রঙিন বস্তুও সঠিকভাবে দেখতে পায়। গঠনগত ও কার্যকারিতার দিক থেকে ঘাসফড়িং-এর পুঞ্জাক্ষি আরশোলা, চিংড়ি প্রভৃতি আর্থোপোড প্রাণীর মতো। অসংখ্য ওমাটিডিয়া (ommatidia)-র সমন্বয়ে একেকটি পুঞ্জাক্ষি গঠিত হয়। ওমাটিডিয়াই পুঞ্জাক্ষির গঠন ও কাজের একক।

২. **ওসেলি** (Ocelli; একবচনে-ocellus) : ঘাসফড়িং-এর দুটি পুঞ্জাক্ষির মাঝখানে তিনটি সরলাক্ষি বা ওসেলি থাকে। প্রত্যেক ওসেলাস পুরু, স্বচ্ছ কিউটিকলনির্মিত লেন্স ও একগুচ্ছ আলোক সংবেদী কোষ নিয়ে গঠিত। প্রতিটি কোষ রঞ্জক পদার্থসমৃদ্ধ। ওসেলাসের তলদেশে মস্তিষ্কে গমনকারী স্নায়ুতন্তু (nerve fibre) অবস্থিত। এর অভ্যন্তরে আলোক সংবেদী কোষ থাকে যারা রেটিনার মতো কাজ করে।

৩. **অ্যান্টেনা** (Antenna; বহুবচনে-antennae) বা **শুঙ্গ** : ঘাসফড়িং-এর পুঞ্জাক্ষির সামনে, মাথার দুপাশে দুটি লম্বা অ্যান্টেনি প্রসারিত থাকে। অ্যান্টেনিদুটি সামনে রেখে চলাফেরা করে এবং ইচ্ছামতো এগুলোকে নাড়াতে পারে। এদুটি নাড়িয়ে এরা স্পর্শ, ঘ্রাণ ও শব্দতরঙ্গ অনুভব করে। স্কেপ, পেডিসেল ও ফ্লাজেলাম-এ তিনটি অংশ নিয়ে প্রত্যেক অ্যান্টেনা গঠিত। পেডিসেল খাটো ও অবিভক্ত। ফ্লাজেলাম বেশ লম্বা ও প্রায় ২৫টি খণ্ডকে বিভক্ত।

৪. **মুখোপাঙ্গ** (Mouth parts) : মুখের চারদিক ঘিরে অবস্থিত নড়নক্ষম, সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গগুলোকে একত্রে মুখোপাঙ্গ বলে। ঘাসফড়িং-এর মুখোপাঙ্গ মস্তকের অঙ্কীয়দেশে অবস্থিত। কচিপাতা বা কাণ্ড চর্বনে ব্যবহৃত হয় বলে ঘাসফড়িং-এর মুখোপাঙ্গকে চর্বন-উপযোগী (chewing) বা ম্যান্ডিবুলেট (mandibulate) মুখোপাঙ্গ বলে। পাঁচটি অংশের সমন্বয়ে মুখোপাঙ্গ গঠিত– ল্যাব্রাম, ম্যান্ডিবল, ম্যাক্সিলা, ল্যাবিয়াম ও হাইপোফ্যারিংক্স।

ঘাসফড়িং-এর মুখোপাঙ্গের বিভিন্ন অংশ

❐ **ল্যাব্রাম** (Labrum) : এটি দেখতে অনেকটা চাপা চাকতির মতো এবং উপরের ওষ্ঠ (lip) গঠন করে। রঙ সবুজ, বাদামি বা অন্য ধরনের হতে পারে। এর মাঝ বরাবর অংশে একটি খাঁজ দেখা যায়। খাঁজটি খাবার ধরে রাখতে, ম্যান্ডিবলের দিকে ঠেলে দিতে ও স্বাদ নিতে সাহায্য করে।

❐ **ম্যান্ডিবল** (Mandible) : মুখছিদ্রের দুপাশে অবস্থিত, তিনকোণা ও কালো বা বাদামি রঙের বেশ শক্ত ও ভিতরের দিকে সুঁচালো করাতের মতো দাঁতযুক্ত দুটি উপাঙ্গের নাম ম্যান্ডিবল বা চোয়াল। খাদ্য কেটে চিবানোয় চোয়াল সাহায্য করে।

❐ **ম্যাক্সিলা** (Maxilla) : ম্যান্ডিবলের পিছনে ও বাইরের দিকে প্রতিপাশে একটি করে লম্বাকার ম্যাক্সিলা থাকে। প্রত্যেক ম্যাক্সিলা কয়েকটি খন্ডে বিভক্ত। সবচেয়ে গোড়ার খণ্ডটিকে কার্ডো (cardo) ও এরপর অবস্থিত খণ্ডককে স্টাইপস (stipes) বলে। স্টাইপসের অগ্রভাগে নখের মতো ল্যাসিনিয়া (lacinia) ও ঢাকনির মতো গ্যালিয়া (galea) নামক দুটি খণ্ড পাশাপাশি অবস্থান করে। গ্যালিয়ার পাশে পাঁচ অংশবিশিষ্ট ম্যাক্সিলারি পাল্প (maxillary palp) রয়েছে। এর উপর থাকে সূক্ষ্ম রোম। খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ, এটি ধরে রাখতে, মুখের ভিতর প্রবেশ করাতে এবং খাদ্য চূর্ণকরণে সাহায্য করা ম্যাক্সিলার কাজ। ম্যাক্সিলারি পাল্প অ্যান্টেনা ও পায়ের অগ্রভাগ পরিষ্কারে অংশ নেয়, খাদ্যবস্তু হরণ প্রতিরোধ করে এবং সংবেদী অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।

চিত্র : ২.২.৪ : ঘাসফড়িং-এর মুখোপাঙ্গের বিভিন্ন অংশের অবস্থান

❐ **ল্যাবিয়াম** (Labium) : ঘাসফড়িং-এর মুখছিদ্রের নিচে মধ্যাংশ বরাবর স্থানে বহুসন্ধিল একটি ল্যাবিয়াম বা অধঃওষ্ঠ রয়েছে। ল্যাবিয়ামকে দ্বিতীয় জোড়া ম্যাক্সিলির প্রতিনিধি মনে করা হয়। এটি মূলত

www.Educationblog24.Com

দুটি খণ্ডে বিভক্ত, যথা–**মেন্টাম** (mentum) ও **সাবমেন্টাম** (submentum)। প্রতিপাশে মেন্টামের মুক্ত প্রান্তে দুটি নড়নশীল **লিগুলি** (ligulae) এবং তিন সন্ধিযুক্ত **ল্যাবিয়াল পাল্প** (labial palp) থাকে। এটি খাবার ফসকে যাওয়া রোধ করে ও চর্বিত খাদ্য মুখে প্রবেশ করায়। ল্যাবিয়াল পাল্প সংবেদনশীল অঙ্গ হিসেবে কাজ করায় এটি উপযুক্ত খাদ্য নির্বাচনে সাহায্য করে।

চিত্র ২.২.৫ : ঘাসফড়িং-এর মুখোপাঙ্গের বিভিন্ন অংশের চিত্ররূপ

□ **হাইপোফ্যারিংক্স** (Hypopharynx) : ল্যাব্রামের নিচে ক্ষুদ্র, মাংসল হাইপোফ্যারিংক্স বা উপজিহ্বাটি অবস্থিত। এটি চারদিকে ম্যান্ডিবল, ম্যাক্সিলা ও ল্যাবিয়াম দিয়ে পরিবৃত থাকে। ল্যাবিয়ামের ভিতরের কিনারা থেকে সৃষ্ট একটি ঝিল্লি হাইপোফ্যারিংক্সের অংকীয়তলের সাথে যুক্ত থাকে। খাদ্যবস্তুকে নাড়াচাড়া করে লালার সাথে মেশাতে সাহায্য করাই এর কাজ।

খ. বক্ষ (Thorax)

মস্তকের পিছনে মাংসল বক্ষ একটি খাটো, সরু ও নমনীয় **গ্রীবা** (neck)-র সাহায্যে যুক্ত। ঘাসফড়িং-এর বক্ষাঞ্চল তিনটি অংশে বিভক্ত; যথা–**অগ্রবক্ষ** (prothorax), **মধ্যবক্ষ** (mesothorax) এবং **পশ্চাৎবক্ষ** (metathorax)। প্রত্যেক অংশের পৃষ্ঠদেশ **টার্গাম** (tergum), অঙ্কীয়দেশ **স্টার্নাম** (sternum) ও পার্শ্বদেশ **প্লিউরন** (pleuron)-এ গঠিত। এগুলো পাতলা কিউটিকলের পর্দা দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত। অগ্রবক্ষের টার্গাম অংশটি বেশ বড়, চওড়া এবং পিছনে ও পাশে প্রসারিত। এর নাম **প্রোনোটাম** (pronotum)। বক্ষাঞ্চলে রয়েছে শ্বাসরন্ধ্র, ডানা ও পা।

১. শ্বাসরন্ধ্র বা স্পাইরাকল (Spiracle) : বক্ষের অঙ্কীয়-পার্শ্বদেশে দুজোড়া শ্বাসরন্ধ্র বা স্পাইরাকল অবস্থিত। প্রথম জোড়া প্রোনোটামের নিচে অগ্র ও মধ্যবক্ষের মাঝে এবং দ্বিতীয় জোড়া মধ্য ও পশ্চাৎবক্ষের মাঝে অবস্থিত।

২. ডানা (Wings) : মধ্য ও পশ্চাৎবক্ষের পিঠের দিকে অর্থাৎ টার্গাম ও প্লিউরনের মধ্যবর্তীস্থান থেকে একজোড়া করে, মোট দুজোড়া পাতলা কিউটিকল নির্মিত ডানা রয়েছে। ডানাগুলো প্রথম অবস্থায় দ্বিস্তরবিশিষ্ট প্রাচীর হিসেবে থলির মতো সৃষ্টি হয়, পরে পূর্ণাঙ্গ ডানায় পরিণত হয়। প্রত্যেক ডানা অসংখ্য ছোট নালির মতো ও রক্তে পূর্ণ শিরা-উপশিরায় গঠিত। দুজোড়া ডানার গঠন ও কাজ পৃথক ধরনের। মধ্যবক্ষীয় (mesothoracic) ডানা অর্থাৎ সামনের ডানাদুটি বেশ শক্ত, ছোট, সরু এবং কখনও উড়তে সাহায্য করে না। এগুলো পিছনের দুই ডানাকে ঢেকে রাখে। সেজন্য এগুলোকে **এলিট্রা** (elytra), ডানার আবরণ (wing covers) বা **টেগমিনা** (tegmina) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। পিছনের বা পশ্চাৎবক্ষীয় (metathoracic) ডানাদুটি বেশ বড়, চওড়া, পর্দার মতো (membranous), স্বচ্ছ এবং উড়তে সাহায্য করে। বিশ্রামের সময় পিছনের ডানাজোড়া অগ্র ডানার নিচে গুটানো থাকে।

চিত্র ২.২.৬ : ঘাসফড়িং-এর ডানা

www.Educationblog24.Com

৩. পা (Legs) : বক্ষের প্রত্যেক অংশে একজোড়া করে মোট **তিনজোড়া পা** রয়েছে। প্রতিটি পা পাঁচখণ্ডে বিভক্ত: একেবারে গোড়ায় স্থূল, তিনকোণা **কক্সা** (coxa); এর পরের ত্রিভুজাকার ক্ষুদ্র **ট্রোক্যান্টার** (trochanter); পরের লম্বা, নলাকার ও দৃঢ় **ফিমার** (femur); তার পরবর্তী সরু **টিবিয়া** (tibia); এবং সবশেষে **টার্সাস** (tarsus)। টার্সাস তিনটি ছোট উপখণ্ডকে বিভক্ত। এগুলোকে **টার্সোমিয়ার** (tarsomeres) বলে। টার্সাসের মাথায় সূঁচালো **নখর** (claws) থাকে। এ ছাড়াও প্রত্যেক পায়ের টিবিয়া ও টার্সাস অংশের পার্শ্বদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূঁচালো **কাঁটা** থাকে। ঘাসফড়িং-এর পা হাঁটা ও আরোহণে ব্যবহৃত হয়। তবে ফিমার অংশ অনেক বড় ও মাংসল গড়নের হওয়ায় এরা লাফিয়ে দূরের পথ অতিক্রম করতে পারে। টিবিয়া ও টার্সাস শক্ত কাঁটাযুক্ত হওয়ায় খাদ্য ধরতে সাহায্য করে।

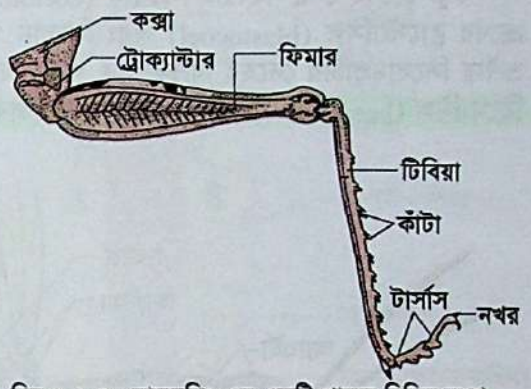

চিত্র ২.২.৭ : ঘাসফড়িং-এর একটি পায়ের বিভিন্ন অংশ

গ. উদর (Abdomen)

ঘাসফড়িং-এর উদর বেশ লম্বা, সরু এবং ১১টি খণ্ডকে বিভক্ত। প্রত্যেক খণ্ডকের পৃষ্ঠদেশে **টার্গাম** (tergum) এবং অঙ্কীয়দেশে **স্টার্নাম** (sternum) থাকে, কোন প্লিউরন থাকে না। ১ম উদরীয় খণ্ডকটি অসম্পূর্ণ; কারণ, এর স্টার্নাম পশ্চাৎবক্ষের সাথে যুক্ত থাকে। এতে শুধু টার্গাম থাকে।

ঘাসফড়িং-এর উদরাঞ্চল নিচে বর্ণিত অঙ্গসমূহ বহন করে।

১. টিমপেনাম (Tympanum) : ১ম খণ্ডকের প্রতিপাশে একটি করে পর্দা রয়েছে যা শ্রবণ অঙ্গ বা **শ্রবণ থলি** (auditory sac)-কে আবৃত রাখে। এর নাম **টিমপেনিক পর্দা** বা টিমপেনাম।

২. শ্বাসরন্ধ্র (Spiracle) : ১ম থেকে ৮ম দেহখণ্ডক পর্যন্ত প্রতিটি খন্ডকের পার্শ্বদেশে একজোড়া করে মোট আটজোড়া শ্বাসরন্ধ্র বা স্পাইরাকল থাকে যার প্রথমটি অন্যগুলো হতে আকারে বড়।

৩. পায়ু ও বহিঃজনন অঙ্গ : ৯ম ও ১০ম উদরীয় খণ্ডকের টার্গাম আংশিকভাবে ও স্টার্নাম পুরোপুরি একীভূত। ১১শ খণ্ডকের টার্গাম পায়ুর উপরে প্লেটের মতো একটি আবরণ (supra anal plate) তৈরি করে। পুরুষ ও স্ত্রী ঘাসফড়িংয়ের উদর অঞ্চলের গঠনে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। পুরুষ ঘাসফড়িং-এর ১০ম খন্ডের পেছন দিকের উভয় পাশে একজোড়া ছোট প্রক্ষেপক রয়েছে যা **অ্যানাল সারকাস** (anal cercus; বহুবচনে anal cerci) নামে পরিচিত। স্ত্রী ঘাসফড়িং-এর ৯ম স্টার্নাম লম্বাকৃতির যা স্ত্রীজননরন্ধ্র ধারণ করে। এদের উদরের শেষ প্রান্তে ৮ম ও ৯ম খন্ড অঙ্কীয়ভাবে একটি নলাকৃতি বিশেষ অঙ্গ তৈরি করে, যার নাম **ওভিপজিটর** (ovipositor)।

পুরুষ ও স্ত্রী ঘাসফড়িংয়ের পার্থক্য

পুরুষ ঘাসফড়িং	স্ত্রী ঘাসফড়িং
১. পুরুষ ঘাসফড়িং তুলনামূলকভাবে আকারে ছোট।	১. স্ত্রী ঘাসফড়িং তুলনামূলকভাবে আকারে বড়।
২. পুরুষ ঘাসফড়িংয়ের উদর সরু।	২. স্ত্রী ঘাসফড়িংয়ের উদর কিছুটা প্রশস্ত।
৩. পুরুষ ঘাসফড়িংয়ের উদরের ৯ম খণ্ডাংশে পুংজনন ছিদ্র বিদ্যমান।	৩. স্ত্রী ঘাসফড়িংয়ের উদরের ৮ম ও ৯ম খণ্ডাংশ মিলে জননছিদ্র গঠন করে।
৪. পুরুষ ঘাসফড়িংয়ের নবম খণ্ডকের স্টার্নাম প্রলম্বিত হয়ে **সাবজেনিটাল প্লেট** গঠন করে যা উক্ত খণ্ডকের শেষে বিদ্যমান জনন ছিদ্রকে ঢেকে রাখে।	৪. স্ত্রী ঘাসফড়িংয়ের নবম খণ্ডকের স্টার্নাম প্রলম্বিত ও রূপান্তরিত হয়ে ডিম পাড়ার অঙ্গ **ওভিপজিটর** (ovipositor) গঠন করে।
ক. পৃষ্ঠীয় দৃশ্য খ. পার্শ্বীয় দৃশ্য	গ. পৃষ্ঠীয় দৃশ্য ঘ. পার্শ্বীয় দৃশ্য

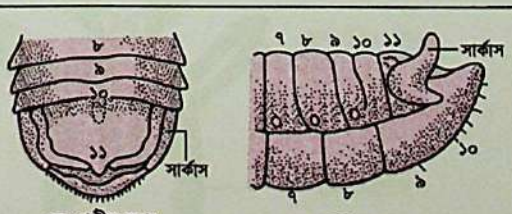

www.Educationblog24.Com

ঘাসফড়িং-এর সিলোম ও অন্তর্গঠন (Coelom and Internal structures of Grasshopper)

শুধু ভ্রূণেই দেহ গহ্বরটি **সিলোম** (coelom) আকারে অবস্থান করে। পরিণত প্রাণীতে যে গহ্বর দেখা যায় তা ভ্রূণের **ব্লাস্টোসিল** (blastocoel) এবং সিলোম গহ্বরের সংযুক্তির ফলে সৃষ্ট। এর নাম **মিক্সোসিল** (mixocoel)। ভ্রূণীয় সিলোমপ্রাচীর দেহের বিভিন্ন অঙ্গ গঠনে ব্যবহৃত হয়। মিক্সোসিলের ভিতর দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হয় বলে এটি **হিমোসিল** (haemocoel) নামে অভিহিত এবং প্রবাহমান তরল পদার্থ হচ্ছে **হিমোলিম্ফ** (haemolymph)।

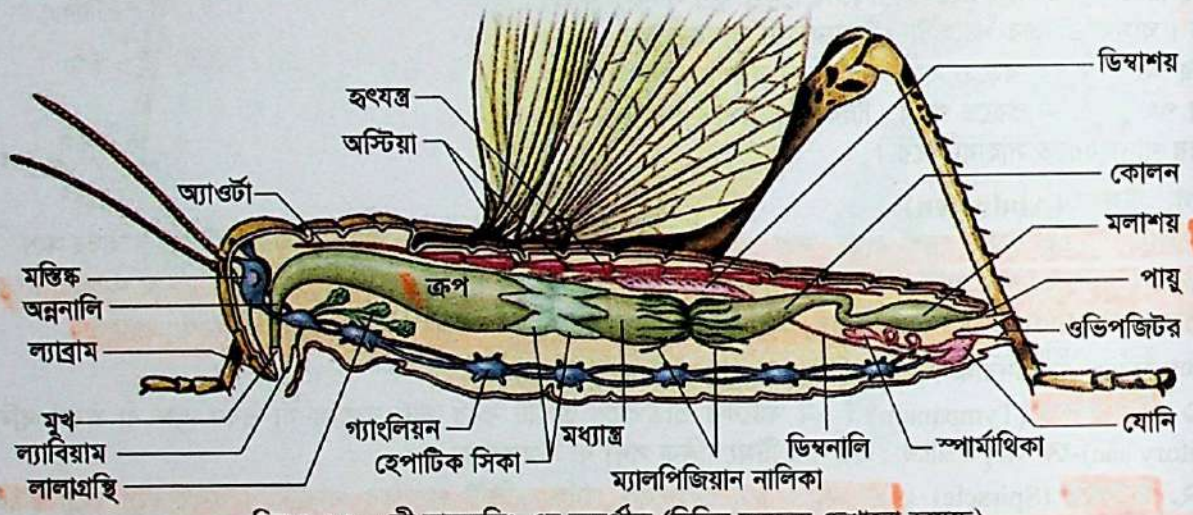

চিত্র ২.২.৮ : স্ত্রী ঘাসফড়িং-এর অন্তর্গঠন (বিভিন্ন অঙ্গতন্ত্র দেখানো হয়েছে)

দেহের পৃষ্ঠদেশে রক্ত সংবহনতন্ত্রের **অ্যাওর্টা** ও **হৃৎযন্ত্র**; অঙ্কীয়দেশে **স্নায়ুরজ্জু** এবং দেহের মাঝ বরাবর পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন অংশ অবস্থান করে। সম্মুখ অংশের তলদেশে **লালাগ্রন্থি** প্রসারিত থাকে। মধ্য ও পশ্চাৎ-পৌষ্টিকনালির সংযোগস্থলে অসংখ্য সুতার মতো **ম্যালপিজিয়ান নালিকা** হিমোসিলে বিস্তৃত। হিমোসিলের অভ্যন্তরে অন্যান্য অঙ্গাণু দেখা যায়।

ঘাসফড়িং-এর পৌষ্টিকতন্ত্র (Digestive System of Grasshopper)

ঘাসফড়িং-এর খাদ্যাভ্যাসের সাথে পৌষ্টিকতন্ত্র অভিযোজিত এবং প্রধান দুটি অংশ নিয়ে গঠিত। যথা-**পৌষ্টিকনালি** ও **পৌষ্টিকগ্রন্থি**। ছকের মাধ্যমে পৌষ্টিকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ দেখানো হলো।

www.Educationblog24.Com

নিচে ঘাসফড়িং-এর পৌষ্টিকতন্ত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

পৌষ্টিকনালি (Alimentary Canal)

ঘাসফড়িং-এর পৌষ্টিকনালি সরল প্রকৃতির এবং মুখছিদ্র থেকে পায়ুছিদ্র পর্যন্ত দেহের মধ্যরেখা বরাবর সোজা নালি হিসেবে অবস্থিত। বর্ণনার সুবিধার জন্য পৌষ্টিকনালিকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে: স্টোমোডিয়াম, মেসেন্টেরন ও প্রোক্টোডিয়াম।

১. স্টোমোডিয়াম বা অগ্র-পৌষ্টিকনালি (Stomodaeum or Foregut) : এটি মুখছিদ্র থেকে গিজার্ড পর্যন্ত বিস্তৃত পৌষ্টিকনালির প্রথম অংশ। ভ্রূণীয় এক্টোডার্ম থেকে উদ্ভূত এ অংশটির অন্তঃপ্রাচীর কাইটিন (chitin) নির্মিত শক্ত আবরণে আবৃত। এটি প্রধানত নিচে উল্লেখিত অংশগুলো নিয়ে গঠিত।

ক. মুখছিদ্র (Mouth) : এটি প্রাকমৌখিক প্রকোষ্ঠ (preoral cavity) বা সিবেরিয়াম (cibarium) নামক প্রকোষ্ঠের গোড়ায় অবস্থিত ছিদ্রবিশেষ। প্রকোষ্ঠটি মুখোপাঙ্গে বেষ্টিত থাকে।

কাজ : সিবেরিয়ামে খাদ্যবস্তু গৃহীত হয় এবং মুখছিদ্র পথে খাদ্য দেহে প্রবেশ করে।

খ. গলবিল (Pharynx) : মুখছিদ্রটি ছোট নলাকার ও পেশিবহুল গলবিলে উন্মুক্ত।

কাজ : এর মাধ্যমে খাদ্যবস্তু গ্রাসনালিতে প্রবেশ করে।

গ. গ্রাসনালি (Oesophagus) : এটি গলবিলের পিছনে সরু, সোজা, নলাকার পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট নালি।

কাজ : খাদ্যবস্তু মুখ থেকে বহন করে ক্রপে পৌঁছায়।

ঘ. ক্রপ (Crop) : গ্রাসনালি স্ফীত হয়ে মোচাকার থলির মতো ও পাতলা প্রাচীরযুক্ত ক্রপ গঠন করে।

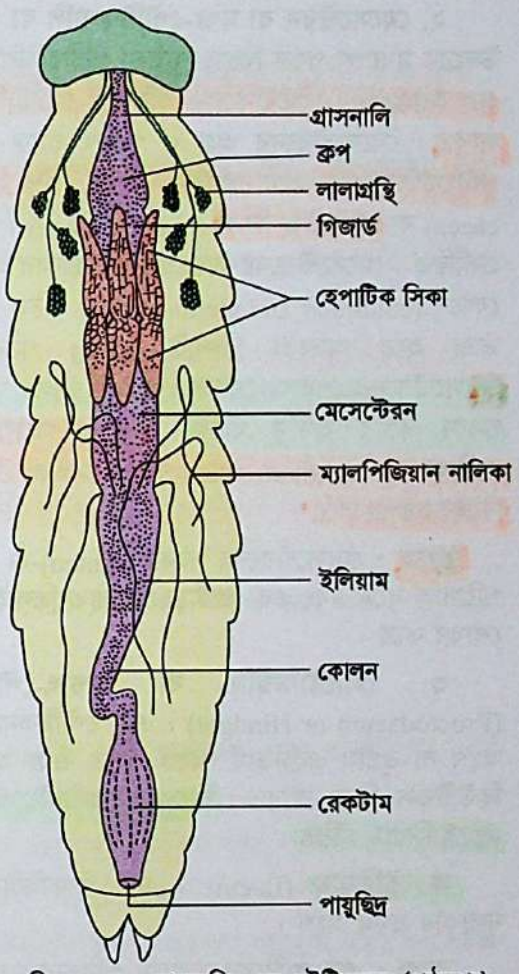

চিত্র ২.২.৯ : ঘাসফড়িং-এর পৌষ্টিকতন্ত্র (পৃষ্ঠদৃশ্য)

চিত্র ২.২.১০ : স্টোমোডিয়াম ও মেসেন্টেরনের লম্বচ্ছেদ

কাজ : খাদ্যবস্তু কিছু সময়ের জন্য এখানে জমা থাকে। ক্রপের সংকোচন প্রসারণে খাদ্য কিছুটা চূর্ণ হয় এবং লালার এনজাইম পরিপাকের সূত্রপাত ঘটায়।

ঙ. গিজার্ড বা প্রোভেন্ট্রিকুলাস (Gizzard or Proventriculus): এটি ক্রপের পরবর্তী ত্রিকোণাকার বেশ শক্ত, পুরু প্রাচীরবিশিষ্ট এবং অন্তঃপ্রাচীরের কাইটিনময় ছটি দাঁত ও ছটি অনুলম্ব ভাঁজ নিয়ে গঠিত অংশ। দাঁতের পিছনে চুল ও ছটি প্যাড থাকে। এর পরের অংশে থাকে পিছনে প্রসারিত কপাটিকা।

কাজ : গিজার্ডের দৃঢ় সংকোচন-প্রসারণ খাদ্যকে চূর্ণ করে; প্যাডের চুলগুলো খাদ্যকণাকে মেসেন্টেরনে প্রবেশের সময় ছাঁকনির কাজ করে; এবং কপাটিকাগুলো খাদ্যকে বিপরীতদিকে আসতে বাধা দেয়।

www.Educationblog24.Com

২. মেসেন্টেরন বা মধ্য-পৌষ্টিকনালি বা পাকস্থলি (Mesenteron or Midgut) : গিজার্ডের পর থেকে শুরু করে উদরের মধ্যাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট অংশটি মেসেন্টেরন। এটি ভ্রূণীয় এন্ডোডার্ম স্তর থেকে সৃষ্টি হয় এবং এর অন্তঃপ্রাচীর কিউটিকলের পরিবর্তে **পেরিট্রফিক পর্দা** (peritrophic membrane) নামক বৈষম্যভেদ্য পর্দা দিয়ে আবৃত। মেসেন্টেরনের অগ্র ও পশ্চাৎ প্রান্তে **পেশির বলয়** বা **স্ফিংক্টার** (sphincter) থাকে। মেসেন্টেরন এবং স্টোমোডিয়ামের সংযোগস্থলে ৬ জোড়া ফাঁপা, লম্বা মোচাকার থলি থাকে। সেগুলো হচ্ছে **গ্যাস্ট্রিক সিকা** (gastric caeca) বা **হেপাটিক সিকা** (hepatic caeca)। প্রতিজোড়া হেপাটিক সিকার একটি সামনের দিকে অন্যটি পিছন দিকে প্রসারিত। মেসেন্টেরনের অন্তঃপ্রাচীর স্তম্ভাকার অন্তঃত্বকীয় কোষে (columnar endodermal cells) গঠিত এবং এটি ভাঁজ হয়ে অসংখ্য **ভিলাই** (villi) গঠন করে। মেসেন্টেরনের শেষ অংশে অসংখ্য সূক্ষ্ম চুলের মতো এবং হলদে বর্ণের অঙ্গাণু থাকে। এগুলো **ম্যালপিজিয়ান নালিকা** (malpighian tubules) যা মূলত রেচন অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।

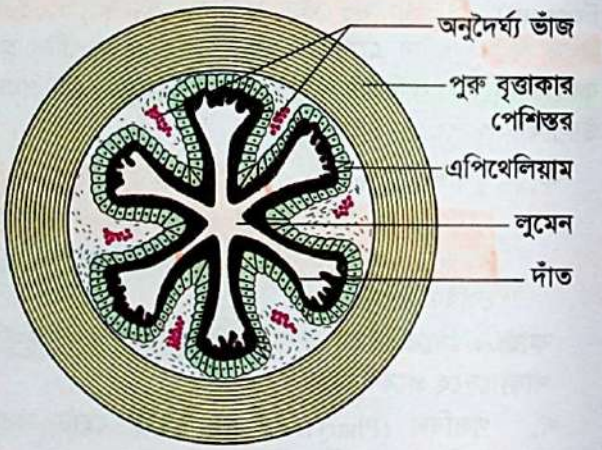

চিত্র ২.২.১১ : গিজার্ডের প্রস্থচ্ছেদ

কাজ : মেসেন্টেরনের গহ্বর (lumen)-এ খাদ্যবস্তুর পরিপাক ঘটে এবং এর প্রাচীরে অবস্থিত ভিলাই খাদ্যরস শোষণ করে।

৩. প্রোক্টোডিয়াম বা পশ্চাৎ-পৌষ্টিকনালি (Proctodaeum or Hindgut) : এটি পৌষ্টিকনালির শেষ অংশ যা ভ্রূণীয় এক্টোডার্ম থেকে উদ্ভূত এবং অন্তঃপ্রাচীর কিউটিকল দিয়ে আবৃত। নিচে বর্ণিত ৪টি অংশ নিয়ে প্রোক্টোডিয়াম গঠিত।

ক. ইলিয়াম (Iluem) : এটি প্যাঁচবিহীন, চওড়া নলাকার প্রথম অংশ।

কাজ : এর প্রাচীরের মাধ্যমে পরিপাককৃত খাদ্যরস শোষিত হয়।

খ. কোলন (Colon) : এটি ইলিয়ামের পিছনে অবস্থিত সরু নলাকার অংশ।

কাজ : পাচিত খাদ্যবস্তুর অবশিষ্টাংশ পানিসহ শোষিত হয়।

গ. রেকটাম বা মলাশয় (Rectum) : এটি পৌষ্টিকনালির সর্বশেষ স্ফীত ও পুরু প্রাচীরযুক্ত অংশ। এর অন্তঃস্থ প্রাচীরে ছয়টি **রেকটাল প্যাপিলা** (rectal papilla; বহুবচনে-papillae) নামক অনুলম্ব ভাঁজ রয়েছে।

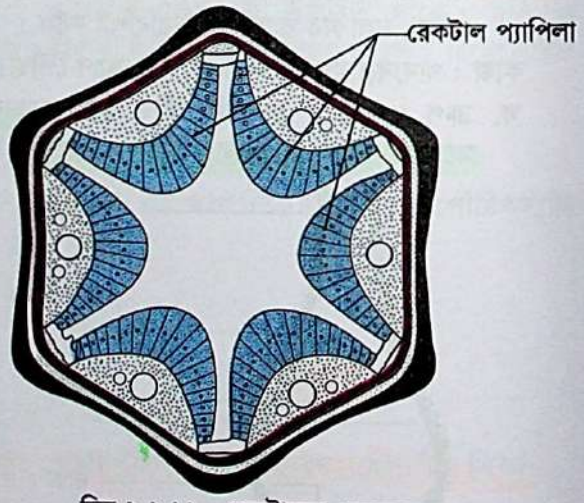

চিত্র ২.২.১২ : রেকটামের প্রস্থচ্ছেদ

কাজ : মল থেকে অতিরিক্ত পানি, খনিজ লবণ, অ্যামিনো এসিড শোষণ করা এবং অপাচ্য অংশ সাময়িক জমা রাখা এর কাজ।

ঘ. পায়ুছিদ্র (Anus) : এটি মলাশয়ের শেষপ্রান্তে অবস্থিত ছিদ্রপথ। এটি দশম দেহখণ্ডকের অঙ্কীয়দেশে উন্মুক্ত হয়।

কাজ : অপাচ্য অংশ মল (faeces) হিসেবে দেহ থেকে অপসারণ করা।

www.Educationblog24.Com

পৌষ্টিকগ্রন্থি (Digestive Glands)

ঘাসফড়িং-এর লালাগ্রন্থি, মেসেন্টেরনের অন্তঃআবরণ এবং হেপাটিক সিকা পৌষ্টিকগ্রন্থি হিসেবে কাজ করে। নিচে এসব অংশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

১. লালাগ্রন্থি (Salivary glands) : এটি ঘাসফড়িং-এর প্রধান পৌষ্টিকগ্রন্থি। ক্রপের নিচে ক্ষুদ্র, শাখাপ্রশাখা-যুক্ত একজোড়া লালাগ্রন্থি অবস্থিত। লালাগ্রন্থির নালি ল্যাবিয়ামের গোড়ায় গলবিলে উন্মুক্ত হয়।

কাজ : লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালরস (saliva) খাদ্য গলাধঃকরণ ও চর্বণে সাহায্য করে। কিছু শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাকেও এটি ভূমিকা পালন করে।

২. মেসেন্টেরন বা মধ্য-পৌষ্টিকনালির অন্তঃআবরণ : মেসেন্টেরনের অন্তঃপ্রাচীরে বেশ কিছু ক্ষরণকারী কোষ (secretary cells) আছে যা থেকে পাচকরস ক্ষরিত হয়।

কাজ : ক্ষরিত পাচকরস খাদ্য পরিপাকে অংশ নেয়।

৩. হেপাটিক সিকা (Hepatic caeca) : অগ্র ও মধ্য-পৌষ্টিকনালির সংযোগস্থলে অবস্থিত কোণ (cone) আকৃতির ছয়জোড়া লম্বা স্বচ্ছ নালিকাকে হেপাটিক বা গ্যাস্ট্রিক সিকা বলে।

কাজ : হেপাটিক সিকার অন্তঃপ্রাচীরে অবস্থিত ক্ষরণকারী কোষ থেকে পাচকরস ক্ষরিত হয়ে খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে।

খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাক (Feeding & Digestion)

খাদ্য : ঘাসফড়িং সম্পূর্ণ তৃণভোজী বা শাকাশী (herbivorous) প্রাণী। ঘাস, শস্যদানা, লতা-পাতা খেয়ে এরা জীবনধারণ করে। এদের খাবারে শর্করা, আমিষ ও স্নেহজাতীয় সমস্ত উপাদানই থাকে।

খাদ্য গ্রহণ পদ্ধতি : ঘাসফড়িংয়ের যে মুখোপাঙ্গ তা শুধু চিবানোর কাজে ব্যবহৃত হয় বলে, এদের খাদ্য গ্রহণকে চর্বণ (chewing) এবং মুখোপাঙ্গকে চর্বণ-উপযোগী বা ম্যান্ডিবুলেট (chewing or mandibulate) মুখোপাঙ্গ বলে।

ঘাসফড়িং প্রথমে ম্যাক্সিলারি ও ল্যাবিয়াল পাল্পের মাধ্যমে খাদ্য নির্বাচন করে। অগ্রপদ, ল্যাব্রাম এবং ল্যাবিয়াম খাদ্যবস্তু আটকে ধরে। ম্যান্ডিবল এবং ম্যাক্সিলি খাদ্যবস্তুর ক্ষুদ্র অংশ কেটে চোষণ করে।

পরিপাক : খাদ্য প্রাকমৌখিক প্রকোষ্ঠে পৌঁছার পরই লালাগ্রন্থি নিঃসৃত লালারস-এর সাথে মিশ্রিত হয়। লালারসে অ্যামাইলেজ, কাইটিনেজ ও সেলুলেজ এনজাইম থাকে যা বিভিন্ন ধরনের শর্করাকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করে। খাদ্যবস্তু প্রাকমৌখিক প্রকোষ্ঠ থেকে ক্রপে পৌঁছায়, এখান থেকে গিজার্ডে প্রেরিত হয়। আংশিক পরিপাককৃত খাদ্য গিজার্ডে প্রবেশ করলে কাইটিনময় দাঁতে পিষ্ট হয়ে অতি সূক্ষ্ম কণাসমৃদ্ধ পেস্ট (paste)-এ পরিণত হয়। এগুলো গিজার্ডে অবস্থিত সূক্ষ্ম রোমে পরিস্রুত হয়ে মেসেন্টেরনে প্রবেশ করে। মেসেন্টেরনের অন্তঃগাত্র এবং হেপাটিক সিকা ক্ষরণ ও শোষণতলরূপে কাজ করে। মেসেন্টেরনে মলটেজ, ট্রিপটেজ, অ্যামাইলেজ, ইনভার্টেজ, লাইপেজ প্রভৃতি এনজাইমের উপস্থিতিতে খাদ্যবস্তু সরল, তরল খাদ্যরসে পরিণত হয়। পরিপাককৃত খাদ্যবস্তু মেসেন্টেরনের কোষীয় প্রাচীরের মাধ্যমে পরিশোধিত হয়ে হিমোসিলে প্রবেশ করে সারা দেহে পরিবাহিত হয়।

অজীর্ণ খাদ্যবস্তু কোলনের ভিতর দিয়ে মলাশয়ে পৌঁছার আগেই কোলনের প্রাচীর তা থেকে পানি, লবণ, অ্যামিনো এসিড ও অজৈব আয়ন শোষণ করে নেয়। পরে কঠিন অপাচ্য বস্তু মলরূপে পায়ু পথে বাইরে নির্গত হয়।

www.Educationblog24.Com

ব্যবহারিক অংশ

আরশোলা ও ঘাসফড়িং-এর মুখোপাঙ্গ পর্যবেক্ষণ

ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি

১. ঘাসফড়িং বা আরশোলার মাথাটি বাম হাতের বৃদ্ধ ও তর্জনী আঙ্গুলের মাঝখানে চেপে ধরে প্রথমেই বিভিন্ন উপাঙ্গগুলোকে শনাক্ত করতে হবে।

২. একটি চিমটার সাহায্যে প্রতিটি উপাঙ্গের গোড়ায় চাপ দিয়ে প্রথমে ল্যাব্রাম, পরে একে একে ম্যান্ডিবল ম্যাক্সিলা, হাইপোফ্যারিংক্স এবং সর্বশেষে ল্যাবিয়াম তুলে ফেলতে হবে।

৩. একটি স্লাইডে আগে থেকে রক্ষিত কিছু গ্লিসারিনে এগুলো ডুবিয়ে রাখতে হবে।

৪. সরল অণুবীক্ষণযন্ত্রে স্লাইডটি স্থাপন করে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে চিহ্নিত চিত্র আঁকতে হবে।

ঘাসফড়িং-এর মুখোপাঙ্গের চিত্রঃ ২.২.৫

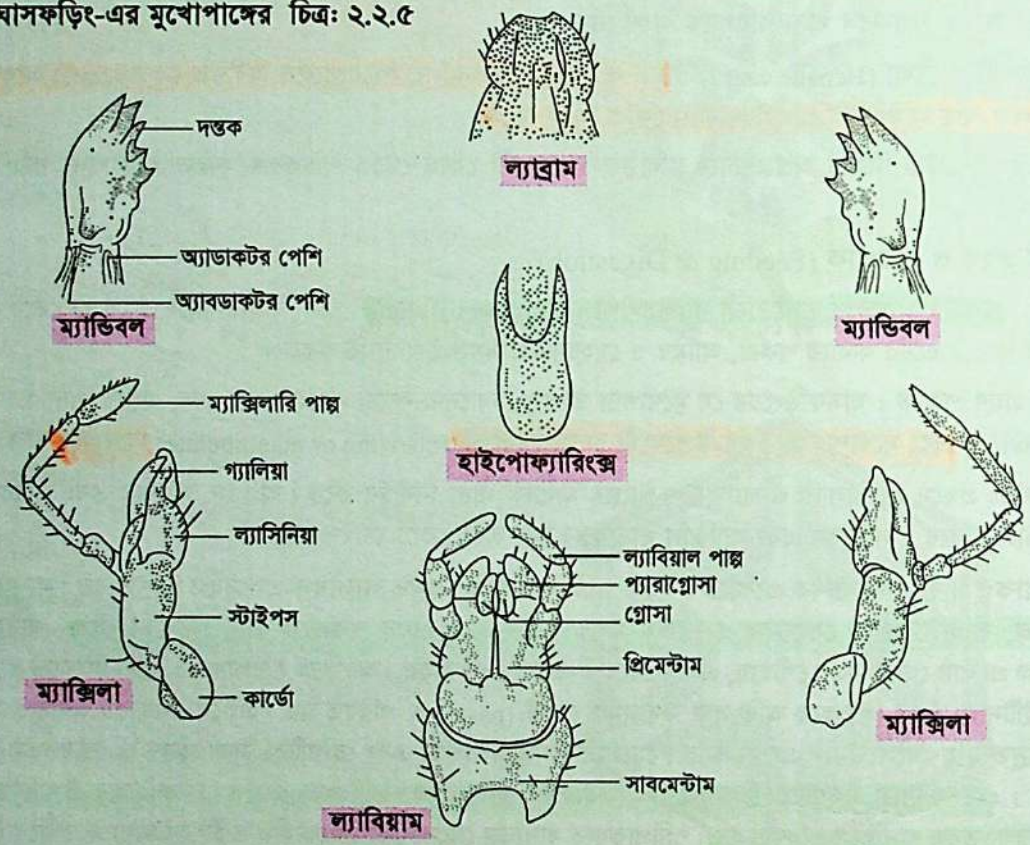

চিত্র ২.২.১৩ : আরশোরার মুখোপাঙ্গ

পর্যবেক্ষণ

১. **ল্যাব্রাম :** এটি চওড়া পাতের মতো এবং মস্তকের সম্মুখে আটকানো থাকে।

২. **ম্যান্ডিবল :** এরা শক্ত, মজবুত, বাঁকা ও দাঁতযুক্ত।

৩. **প্রথম ম্যাক্সিলা:** এটি ম্যান্ডিবলের পিছনে অবস্থিত। এর গোড়ার অংশ কার্ডো, স্টাইপস ও ল্যাসিনিয়া নিয়ে গঠিত।

৪. **দ্বিতীয় ম্যাক্সিলা বা ল্যাবিয়াম :** ১ম ম্যাক্সিলার পিছনে অবস্থিত। সাবমেন্টাম, মেন্টাম ইত্যাদি নিয়ে গঠিত। ল্যাবিয়াল পাল্প দেখা যায়।

৫. **হাইপোফ্যারিংক্স :** এটি লম্বা নলের মতো উপজিহ্বা।

www.Educationblog24.Com

ঘাসফড়িং / আরশোলার পৌষ্টিকতন্ত্র পর্যবেক্ষণ

একটি সদ্যমৃত বা নিস্তেজ ঘাসফড়িং বা আরশোলার ডানা কেটে বাম হাতে ধরে বক্ষ উদরের টার্গা ও স্টার্ণা পৃথক করার জন্য দেহের দুপাশ বরাবর সূক্ষ্ম কাঁচি প্রবেশ করিয়ে কাটতে হবে। প্রাণিটিকে এখন পানিপূর্ণ ট্রেতে পিঠ উপরে রেখে পিন দিয়ে আটকে দিতে হবে। চিমটার সাহায্যে একটির পর একটি টার্গা ছাড়াতে হবে। এভাবে বক্ষ ও উদর উন্মুক্ত করার পর ব্যবহৃত পানি ফেলে পরিষ্কার পানি দিয়ে ট্রে ভর্তি করতে হবে। পৌষ্টিকনালিকে একটু টেনে একপাশে পিন দিয়ে আটকে বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণ (তত্ত্বীয় অংশে বিশদ বর্ণনা দেয়া হয়েছে) করে চিত্র এঁকে চিহ্নিত করতে হবে। **ঘাসফড়িং-এর পৌষ্টিকতন্ত্রের চিত্র নং-২.২.৯।**

লালাগ্রন্থি পর্যবেক্ষণ

পৌষ্টিকনালি ব্যবচ্ছেদ করার সময় অন্ননালি পর্যন্ত বের করে ধীরে ধীরে সুঁচ এবং চিমটার সাহায্যে চর্বি ও মাংসপেশিগুলো ছাড়াতে হবে। সাদা পাতার মতো দেখতে **লালাগ্রন্থি** দেখার সাথে সাথে লালাগ্রন্থি নালির অবস্থান লক্ষ করে ধীরে ধীরে উপরের দিকে উপ-জিহ্বা (হাইপোফ্যারিংক্স) পর্যন্ত অগ্রসর হতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে যে

চিত্র ২.২.১৪ : আরশোলার লালাগ্রন্থি

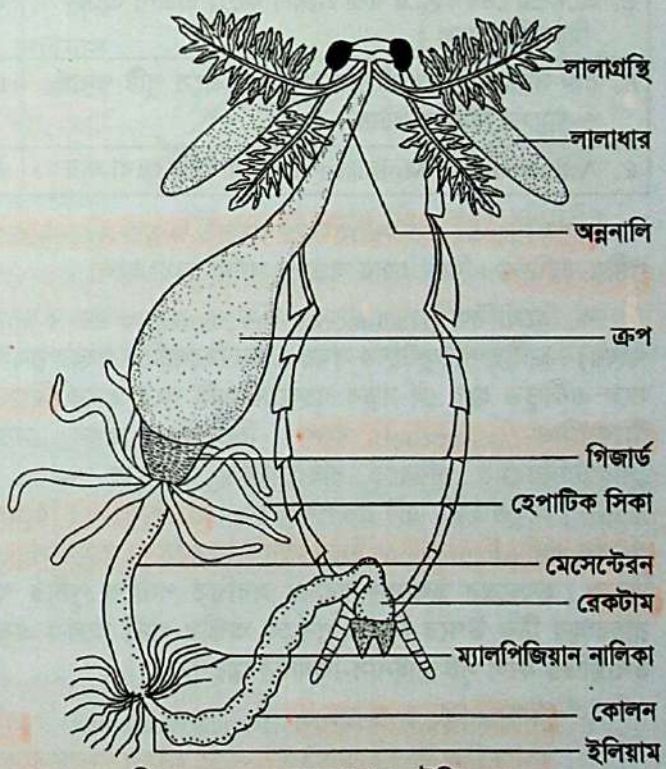

চিত্র ২.২.১৫ : আরশোলার পৌষ্টিকতন্ত্র

লালাগ্রন্থিগুলোর মাঝখানে উভয় পাশে একটি করে বেলুনের মতো যে **লালাধার** রয়েছে তা যেন ছিঁড়ে না যায়। **হাইপোফ্যারিংক্সসহ অভিন্ন লালাগ্রন্থি নালি, লালাগ্রন্থি ও লালাধার** তুলে একটি স্লাইডে রাখতে হবে। এবার স্লাইডকে সরল অণুবীক্ষণযন্ত্রের নিচে রেখে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে চিহ্নিত চিত্র আঁকতে হবে।

ঘাসফড়িং-এর রক্ত সংবহনতন্ত্র (Blood Circulatory System)

জীবদেহের প্রয়োজনীয় উপাদান, পুষ্টি দ্রব্য, হরমোন ইত্যাদি রক্তের মাধ্যমে দেহকোষে পৌছানো এবং দেহকোষ থেকে বিপাকে সৃষ্ট বর্জ্য একইভাবে রেচন অঙ্গে নিয়ে আসার প্রক্রিয়ার নামই **সংবহন**। রক্তের পথ অনুসারে প্রাণিদেহে দুধরনের রক্ত সংবহনতন্ত্র দেখা যায়, যেমন-**মুক্ত** (open) বা **ল্যাকুনার** (lacunar) এবং **বদ্ধ** (closed) সংবহনতন্ত্র।

www.Educationblog24.Com

মুক্ত সংবহন : যে সংবহনতন্ত্রে রক্ত হৃৎযন্ত্র থেকে নালিকা পথে বেরিয়ে উন্মুক্ত দেহগহ্বরে প্রবেশ করে এবং দেহগহ্বর থেকে পুনরায় নালিকা পথে হৃৎযন্ত্রে ফিরে আসে তার নাম মুক্ত সংবহন। অর্থাৎ রক্ত সবসময় রক্তবাহিকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় না। চিংড়ি, পতঙ্গ, মলাস্কা প্রভৃতি প্রাণীর দেহে এ ধরনের সংবহন দেখা যায়।

বদ্ধ সংবহন : যে সংবহনতন্ত্রে রক্ত সবসময় রক্তবাহিকা ও হৃৎযন্ত্রের মাধ্যমে সম্পূর্ণ আবদ্ধ থেকে প্রবাহিত হয় এবং কখনোই দেহ গহ্বরে মুক্ত হয় না তাকে বলে বদ্ধ সংবহন। অ্যানিলিড জাতীয় ননকর্ডেট প্রাণিদেহে এবং কর্ডেট প্রাণীতে এ ধরনের সংবহন দেখা যায়।

মুক্ত ও বদ্ধ সংবহনতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য

মুক্ত সংবহনতন্ত্র	বদ্ধ সংবহনতন্ত্র
১. এ ধরনের সংবহনতন্ত্রে রক্ত হৃৎযন্ত্র, রক্তবাহিকা ও বিভিন্ন সাইনাসে অবস্থান করে।	১. এ ধরনের সংবহনতন্ত্রে রক্ত হৃৎযন্ত্র ও রক্তবাহিকার অভ্যন্তরে অবস্থান করে।
২. হৃৎযন্ত্র, সংক্ষিপ্ত রক্তনালি ও সাইনাস নিয়ে এটি গঠিত।	২. হৃৎযন্ত্র, শিরা, ধমনি ও কৈশিকজালিকা সমন্বয়ে এটি গঠিত।
৩. এক্ষেত্রে দেহগহ্বরে রক্ত প্রবেশ করে; এজন্য একে হিমোসিল বলে।	৩. এক্ষেত্রে দেহগহ্বরে রক্ত প্রবেশ করে না।
৪. রক্ত সরাসরি কোষ-টিস্যুর সংস্পর্শে এসে পুষ্টি পদার্থ ও গ্যাসের বিনিময় ঘটায়।	৪. রক্ত কোষ-টিস্যুর সরাসরি সংস্পর্শে আসে না। টিস্যুরসের মাধ্যমে পুষ্টি পদার্থ ও গ্যাসের বিনিময় ঘটে।
৫. Arthropoda ও Mollusca পর্বের প্রাণীতে দেখা যায়।	৫. Annelida ও Chordata পর্বের প্রাণীতে দেখা যায়।

ঘাসফড়িং-এর রক্ত সংবহনতন্ত্র অনুন্নত ও মুক্ত ধরনের এবং তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত–হিমোসিল, হিমোলিম্ফ ও পৃষ্ঠীয় বাহিকা। নিচে এসব অংশের বর্ণনা দেয়া হলো।

ক. হিমোসিল (Haemocoel; গ্রিক, *haima* = রক্ত + *koiloma* = গহ্বর) : ভ্রূণীয় পরিস্ফুটনের সময় প্রধান সিলোমিক গহ্বর ব্লাস্টোসিলের সঙ্গে একীভূত হয়ে যে নতুন গহ্বরের সৃষ্টি করে তাকে **হিমোসিল বা মিক্সোসিল** (mixocoel) বলে। হিমোসিল তখন মেসোডার্মাল পেরিটোনিয়ামের পরিবর্তে বহিঃকোষীয় মাতৃকায় (extra cellular matrix) আবৃত হয়। এটি রক্তপূর্ণ থাকে। ঘাসফড়িং-এর হিমোসিল দুটি অনুপ্রস্থ পর্দা (diaphragm) দিয়ে তিনটি প্রকোষ্ঠ বা সাইনাস (sinus)-এ বিভক্ত। হৃৎযন্ত্রের তলদেশ বরাবর অবস্থিত পর্দাকে পৃষ্ঠীয় পর্দা এবং স্নায়ুরজ্জুর ঠিক উপরে বিস্তৃত পর্দাকে অঙ্কীয় পর্দা বলে। এসব পর্দার উপস্থিতির ফলে সৃষ্ট সাইনাস-তিনটি নিম্নরূপ–

i. **পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস** (Pericardial sinus) : এটি পৃষ্ঠীয় পর্দার ঠিক উপরে অবস্থিত। এতে হৃৎযন্ত্র অবস্থান করে।

ii. **পেরিভিসেরাল সাইনাস** (Perivisceral sinus) : এটি পৃষ্ঠীয় পর্দার নিচে অবস্থিত এবং পৌষ্টিকনালিকে ধারণ করে।

iii. **পেরিনিউরাল সাইনাস** (Perineural sinus) : এটি অঙ্কীয় পর্দার নিচে অবস্থিত গহ্বর। এতে স্নায়ুরজ্জু অবস্থান করে।

পর্দাগুলো ছিদ্রযুক্ত হওয়ায় রক্ত প্রয়োজন মতো এক সাইনাস থেকে অন্য সাইনাসে যাতায়াত করতে পারে। অঙ্কীয় পর্দাটি পায়ের ভিতরেও বিস্তৃত।

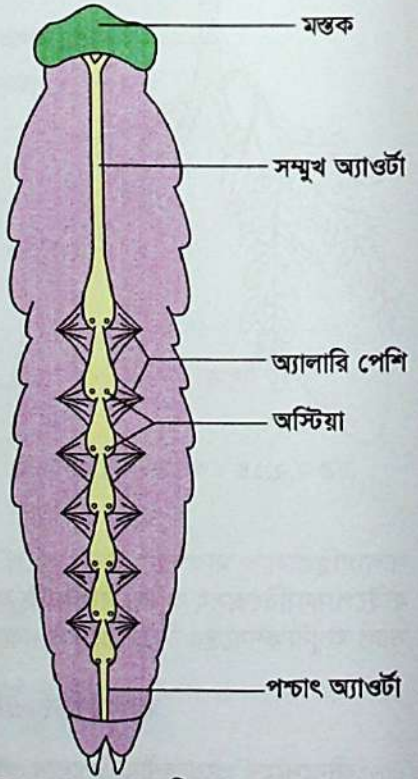

চিত্র ২.২.১৬ : ঘাসফড়িং-এর রক্ত সংবহনতন্ত্র

কাজ : হিমোসিল দেহের বিভিন্ন অঙ্গ, রক্ত ও লসিকা ধারণ করে। এর মাধ্যমে খাদ্যরস ও বর্জ্যবস্তু পরিবাহিত হয়।

www.Educationblog24.Com

খ. হিমোলিম্ফ (Haemolymph) বা রক্ত : বর্ণহীন প্লাজমা এবং এর মধ্যে ভাসমান অসংখ্য বর্ণহীন রক্তকণিকা বা **হিমোসাইট** (haemocyte) নিয়ে ঘাসফড়িং-এর রক্ত গঠিত। রক্ত হিমোসিল নামক গহ্বরে **লসিকা** (lymph)-র সাথে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে বলে ঘাসফড়িংসহ বিভিন্ন পতঙ্গের রক্তকে **হিমোলিম্ফ** বলে। হিমোগ্লোবিন বা অন্য কোন ধরনের শ্বাসরঞ্জক না থাকায় এর রক্ত বর্ণহীন, শ্বসনে তেমন কোন ভূমিকা রাখে না।

কাজ : খাদ্যসার, রেচনদ্রব্য, হরমোন ইত্যাদি পরিবহনে; অ্যামিনো এসিড, কার্বোহাইড্রেট প্রভৃতি জমা রাখা; জীবাণু ধ্বংস করা; তঞ্চনে সাহায্য করা এবং ডানার সঞ্চালন ও খোলস মোচনে সহায়তা করা হিমোলিম্ফের কাজ।

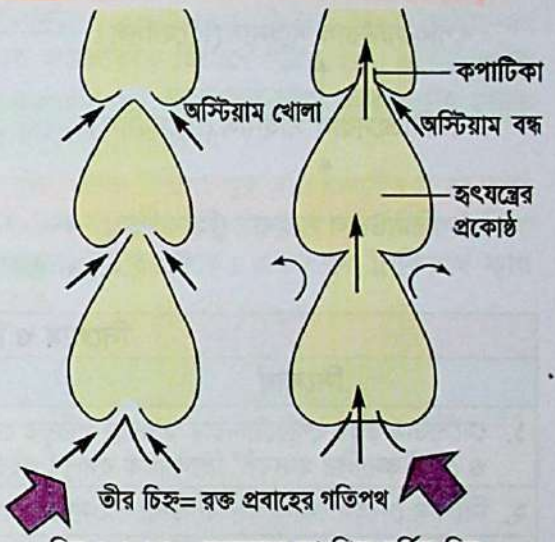

চিত্র ২.২.১৭ : হৃৎযন্ত্রের আংশিক বর্ধিত চিত্র

গ. পৃষ্ঠীয় বাহিকা (Dorsal vessel) : দেহের মধ্য-পৃষ্ঠীয় অবস্থানে রক্ষিত এটি প্রধান **স্পন্দনশীল অঙ্গ**। এ অঙ্গ দুটি অংশে বিভক্ত– (i) অস্টিয়াবিহীন সোজা নলাকার **সম্মুখ ও পশ্চাৎ অ্যাওর্টা** এবং (ii) **হৃৎযন্ত্র**। ঘাসফড়িং-এ একটি লম্বাটে, নলাকার হৃৎযন্ত্র থাকে। এটি বক্ষ ও উদরীয় অঞ্চলের পৃষ্ঠদেশে মাঝ বরাবর যে গহ্বরে থাকে তাকে **পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস** (pericardial sinus) বলে। হৃৎযন্ত্রটি সাতটি ফানেল আকার প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। প্রতিটি প্রকোষ্ঠে পার্শ্বীয় দিকে একটি করে মোট একজোড়া ছিদ্র রয়েছে। ছিদ্রগুলোকে **অস্টিয়া** (ostia, একবচনে- ostium) বলে। প্রতিটি অস্টিয়ামে **কপাটিকা** (valve) থাকে, যা রক্তকে হৃৎযন্ত্রে শুধু প্রবেশ করতে দেয়, বের হতে দেয় না। টারগামের অঙ্কীয় তলের দুপাশ থেকে **অ্যালারি পেশি** (alary muscle) নামক ত্রিকোণাকার পাখার মতো বিশেষ ধরনের পেশি উৎপন্ন হয়ে পেরিকার্ডিয়াল সাইনাসের প্রাচীরে যুক্ত হয় এবং হৃৎযন্ত্রের পার্শ্বীয়-অঙ্কীয় দেশেও যুক্ত থাকে। ঘাসফড়িংয়ে ৬ জোড়া অ্যালারি পেশি থাকে। এগুলোর সংকোচন-প্রসারণ রক্ত সংবহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

রক্ত সংবহন প্রক্রিয়া (Mechanism of Blood Circulation)

হৃৎযন্ত্র ও অ্যালারি পেশির সংকোচন-প্রসারণের ফলেই ঘাসফড়িং-এর দেহের বিভিন্ন অঞ্চলে রক্ত প্রবাহিত হয়। হৃৎযন্ত্রের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ ক্রমাগত ঢেউয়ের মতো সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। ঘাসফড়িং-এর হৃৎযন্ত্রের স্পন্দন প্রতি মিনিটে ১০০ থেকে ১১০ বার। রক্ত সংবহন প্রক্রিয়াটি নিম্নোক্তভাবে সম্পাদিত হয়।

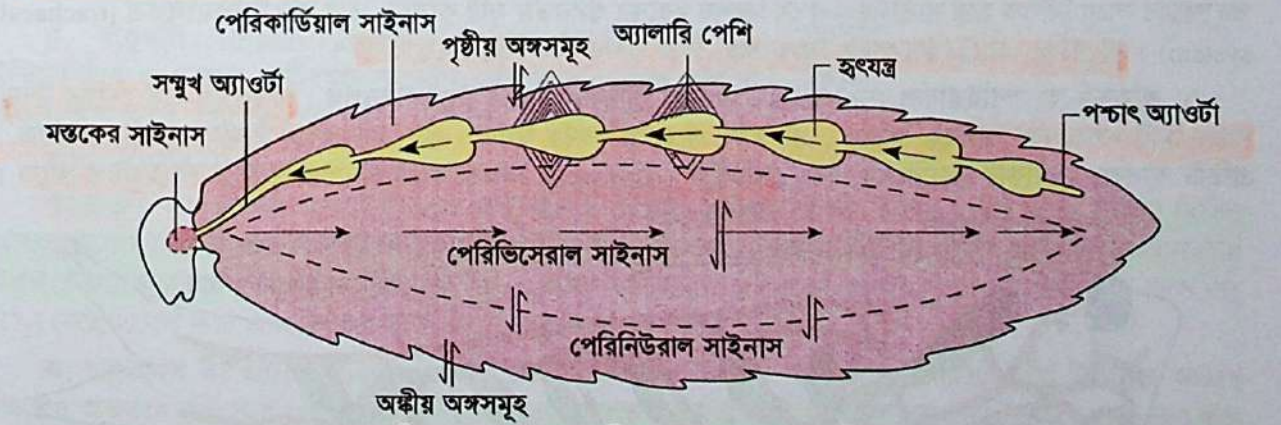

চিত্র ২.২.১৮ : ঘাসফড়িং-এর রক্ত সংবহন প্রক্রিয়া

অ্যালারি পেশির সংকোচনের ফলে রক্ত পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস থেকে অস্টিয়ার মাধ্যমে হৃৎযন্ত্রে প্রবেশ করে। পরে হৃৎযন্ত্র পর্যায়ক্রমে পিছন দিক থেকে সামনের দিকে সংকুচিত হওয়ায় রক্ত সম্মুখে প্রবাহিত হয় এবং অ্যাওর্টার ভিতর দিয়ে হিমোসিলে পৌঁছে। অস্টিয়ায় কপাটিকা থাকায় রক্ত হৃৎযন্ত্র থেকে বাইরে আসতে পারে না। একইভাবে হৃৎযন্ত্রের

www.Educationblog24.Com

প্রকোষ্ঠসমূহের সংযোগস্থলে কপাটিকা থাকায় রক্ত পিছন দিকে প্রবাহিত হতে পারে না। রক্ত প্রথমে মস্তকে প্রবেশ করে এবং ধীরে ধীরে পিছন দিকে প্রবাহিত হয়। হৃৎযন্ত্র যখন আবার প্রসারিত হয় তখন হিমোসিল থেকে পেরিকার্ডিয়ামের প্রাচীরের ছিদ্রপথে রক্ত পেরিকার্ডিয়াল সাইনাসে ফিরে আসে।

ঘাসফড়িং-এর সমগ্র দেহে একবার রক্তপ্রবাহ সম্পন্ন হতে ৩০ থেকে ৬০ মিনিট সময় লাগে।

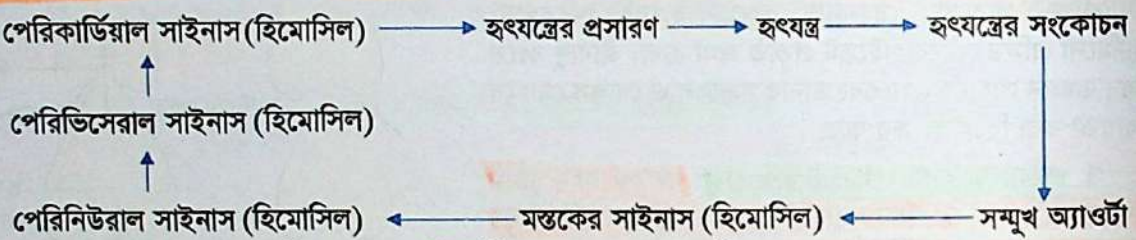

চিত্র ২.২.১৯ : ঘাসফড়িং-এর রক্ত প্রবাহের গতিপথ

সিলোম ও হিমোসিল-এর মধ্যে পার্থক্য

সিলোম	হিমোসিল
১. মেসোডার্ম উদ্ভূত পেরিটোনিয়াম আবরণে পরিবৃত দেহপ্রাচীর ও পৌষ্টিকনালির মধ্যবর্তী সিলোমিক রসপূর্ণ গহ্বর।	১. মেসোডার্ম উদ্ভূত পেরিটোনিয়াম আবরণবিহীন দেহপ্রাচীর ও পৌষ্টিকনালির মধ্যবর্তী রক্তপূর্ণ গহ্বর।
২. সিলোম দেহের কোন অঙ্গ বা উপাঙ্গে প্রসারিত হয় না।	২. হিমোসিল দেহের সকল উপাঙ্গে প্রসারিত হয়।
৩. সিলোম রক্ত সংবহনতন্ত্রের অংশ গঠন করে না।	৩. হিমোসিল রক্ত সংবহনতন্ত্রের অংশ গঠন করে।
৪. সিলোমে পুষ্টি পদার্থ পরিবাহিত হয় না।	৪. হিমোসিলে পুষ্টি পদার্থ পরিবাহিত হয়।
৫. Annelida ও Chordata পর্বের প্রাণীতে সিলোম পাওয়া যায়।	৫. Arthropoda ও Mollusca পর্বের প্রাণীতে হিমোসিল পাওয়া যায়।

ঘাসফড়িং-এর শ্বসনতন্ত্র (Respiratory system)

অন্যান্য স্থলচর পতঙ্গের মতো ঘাসফড়িংও শ্বসনের জন্য বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে। এদের শ্বসনতন্ত্র বেশ উন্নত হওয়ায় রক্তের অক্সিজেন বহনে অক্ষমতার ঘাটতি অনেকখানি পূরণ হয়েছে। ট্রাকিয়া নামক এক ধরনের সূক্ষ্ম শ্বাসনালির শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে পরিবেশ থেকে গৃহীত অক্সিজেন সরাসরি দেহকোষে প্রবেশ করে এবং দেহকোষে উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড একই পথে দেহনির্গত হয়। শ্বসন সম্পাদনের জন্য ট্রাকিয়া ও এর শাখা-প্রশাখাগুলো পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে ঘাসফড়িং-এ যে বিশেষ ধরনের শ্বসনতন্ত্র সৃষ্টি করেছে, তার নাম ট্রাকিয়ালতন্ত্র (trachaeal system)। ঘাসফড়িং-এর ট্রাকিয়ালতন্ত্র (শ্বসনতন্ত্র) নিচে বর্ণিত অঙ্গগুলো নিয়ে গঠিত।

১. শ্বাসরন্ধ্র বা স্পাইরাকল (Spiracle) : এগুলো ট্রাকিয়ালতন্ত্রের উন্মুক্ত ছিদ্রপথ। ঘাসফড়িং-এর দেহের উভয় পাশে মোট দশজোড়া শ্বাসরন্ধ্র রয়েছে। এর মধ্যে দুজোড়া বক্ষীয় অঞ্চলে এবং আটজোড়া উদরীয় অঞ্চলে অবস্থিত। প্রতিটি শ্বাসরন্ধ্র ডিম্বাকার ছিদ্রবিশেষ এবং পেরিট্রিম (peritreme) নামক কাইটিননির্মিত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত থাকে।

চিত্র ২.২.২০ : ঘাসফড়িং-এর শ্বসনতন্ত্র (পার্শ্ব দৃশ্য)

www.Educationblog24.Com

রন্ধ্রগুলোর মুখে সূক্ষ্ম রোমযুক্ত ছাঁকনি যন্ত্র (filtering apparatus) থাকায় ধূলাবালি, জীবাণু, পানি ইত্যাদি ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। পেশি নিয়ন্ত্রিত কপাটিকার সাহায্যে রন্ধ্রগুলো খোলে বা বন্ধ হয়। শ্বাসরন্ধ্র বন্ধ থাকলে দেহ থেকে জলীয় বাষ্প বেরোতে পারে না।

২. **শ্বাসনালি বা ট্রাকিয়া** (Tracheae) : প্রতিটি শ্বাসরন্ধ্র অ্যাট্রিয়াম (atrium) নামক একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে উন্মুক্ত। এখান থেকেই উৎপন্ন হয় সূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখাযুক্ত, স্থিতিস্থাপক, বহিঃত্বকীয় (ectodermal) ট্রাকিয়া যা ঘাসফড়িং-এর প্রধান শ্বসন অঙ্গ এবং সারাদেহে জালিকাকারে বিস্তৃত। ট্রাকিয়া ত্বকের অন্তঃপ্রবর্ধক হিসেবে গঠিত হয়। এদের প্রাচীর তিন স্তরবিশিষ্ট। বাইরের এপিডার্মিস গঠিত ভিত্তিঝিল্লি (basement membrane), মাঝখানে চাপা বহুভূজাকার কোষে গঠিত এপিথেলিয়াম (epithelium) এবং ভিতরের কিউটিকল নির্মিত ইন্টিমা (intima)।

ট্রাকিয়ার অন্তঃস্থ গহ্বর দিয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়। এ গহ্বরে কিছুটা পরপর ইন্টিমা পুরু হয়ে আংটির মতো বলয় গঠন করে। এগুলোর নাম টিনিডিয়া (ctenidia)। টিনিডিয়া থাকায় ট্রাকিয়া কখনও চুপসে যায় না। দেহে ট্রাকিয়া জালিকাকারে বিন্যস্ত থাকলেও প্রধান কয়েকটি নালি অনুদৈর্ঘ্য ও অনুপ্রস্থ বিন্যস্ত থাকে। এগুলোকে ট্রাকিয়াল কাণ্ড (tracheal trunk) বলে। মোট তিনজোড়া অনুদৈর্ঘ্য ট্রাকিয়াল কাণ্ড দেহের দৈর্ঘ্য বরাবর বিস্তৃত থাকে। যেমন–

- একজোড়া পার্শ্বীয় অনুদৈর্ঘ্য ট্রাকিয়াল কাণ্ড (lateral longitudinal tracheal trunk),
- একজোড়া পৃষ্ঠীয় অনুদৈর্ঘ্য ট্রাকিয়াল কাণ্ড (dorsal longitudinal tracheal trunk) এবং
- একজোড়া অঙ্কীয় অনুদৈর্ঘ্য ট্রাকিয়াল কাণ্ড (ventral longitudinal tracheal trunk)।

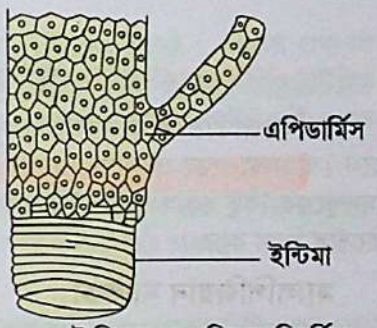

চিত্র ২.২.২১ : ট্রাকিয়ার অংশবিশেষ বিবর্ধিত

দেহের প্রতিপাশে অবস্থিত পার্শ্বীয় ট্রাকিয়াল কাণ্ড থেকে পৃষ্ঠীয় ও অঙ্কীয়দিকে কতগুলো অনুপ্রস্থ ট্রাকিয়াল কাণ্ড (transeverse tracheal trunk) সৃষ্টি হয়ে যথাক্রমে পৃষ্ঠীয় ও অঙ্কীয় ট্রাকিয়াল কাণ্ডকে যুক্ত করে। ট্রাকিয়া সমগ্র দেহে শ্বসনিক গ্যাস পরিবহন করে।

৩. **ট্রাকিওল** (Tracheole) : ট্রাকিয়া থেকে ট্রাকিওল নামে সূক্ষ্ম শাখা সৃষ্টি হয়। এগুলো এককোষী নালিকা, মাত্র ১μm ব্যাসবিশিষ্ট, প্রাচীর ইন্টিমা ও টিনিডিয়াবিহীন কিন্তু এগুলোর অভ্যন্তর টিস্যুরসে পূর্ণ থাকে। এ টিস্যুরসই অন্যান্য প্রাণীর রক্তের মতো শ্বসনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে। এ রসের মাধ্যমে দেহকোষে গ্যাসীয় আদান-প্রদান ঘটে।

৪. **বায়ুথলি** (Air sac) : ট্রাকিয়ার কিছু শাখা প্রসারিত হয়ে বড়, ইন্টিমাবিহীন ও পাতলা প্রাচীরযুক্ত বায়ুথলি গঠন করে। এসব থলিতে বাতাস জমা থাকে এবং শ্বসনের সময় বায়ু প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে।

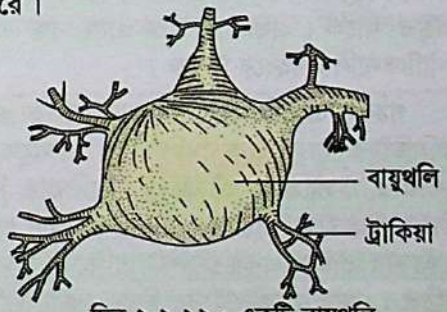

চিত্র ২.২.২২ : একটি বায়ুথলি

শ্বসন পদ্ধতি (Process of Respiration)

শ্বাসরঞ্জক না থাকায় ঘাসফড়িং-এর রক্ত শ্বসনে তেমন ভূমিকা পালন করতে পারে না। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে জালিকার মতো ছড়িয়ে থাকা ট্রাকিয়া ও ট্রাকিওলের মাধ্যমে গ্যাসীয় বিনিময় ঘটে। শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ উভয় প্রক্রিয়া প্রধানত শ্বাসরন্ধ্র দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। পেশির কার্যকারিতায় উদরের ছন্দময় সংকোচন-প্রসারণের ফলে বায়ু (O_2) দেহে প্রবেশ করে এবং ট্রাকিয়ালতন্ত্র থেকে বায়ু (CO_2) বেরিয়ে আসে।

ক. শ্বাসগ্রহণ বা প্রশ্বাস (Inspiration) : পেশির প্রসারণে উদরীয় খণ্ডকগুলো প্রসারিত হলে ট্রাকিয়ার অন্তঃস্থ গহ্বরও আয়তনে বৃদ্ধি পায়। এ সময় প্রথম চারজোড়া শ্বাসরন্ধ্র অর্থাৎ প্রশ্বাসী শ্বাসরন্ধ্রগুলো (inhalatory spiracle) খুলে যায় ফলে O_2-যুক্ত বায়ু প্রথমে শ্বাসরন্ধ্রের মাধ্যমে ট্রাকিয়ায় পৌঁছে, পরে সেখান থেকে ট্রাকিওল (টিস্যুরসে দ্রবীভূত হয়) ও বায়ুথলির মাধ্যমে অন্তঃকোষীয় স্থানে পৌঁছায়।

খ. শ্বাসত্যাগ বা নিঃশ্বাস (Expiration) : দেহকোষে বিপাকের ফলে সৃষ্ট CO_2 ব্যাপন প্রক্রিয়ায় বায়ুথলি ও ট্রাকিওল হয়ে ট্রাকিয়ায় প্রবেশ করে। এসময় পেশির সংকোচনে উদরীয় খণ্ডকগুলো সংকুচিত হলে ট্রাকিয়ার অন্তঃস্থ

www.Educationblog24.Com

গহ্বরের আয়তন কমে যায় এবং বাকি ছয়জোড়া শ্বাসরন্ধ্র অর্থাৎ নিঃশ্বাসী শ্বাসরন্ধ্রগুলো (exhalatory spiracle) খুলে যায়। ফলে ট্রাকিয়ায় অবস্থিত CO_2 সজোরে শ্বাসরন্ধ্র পথে বাইরে নির্গত হয়।

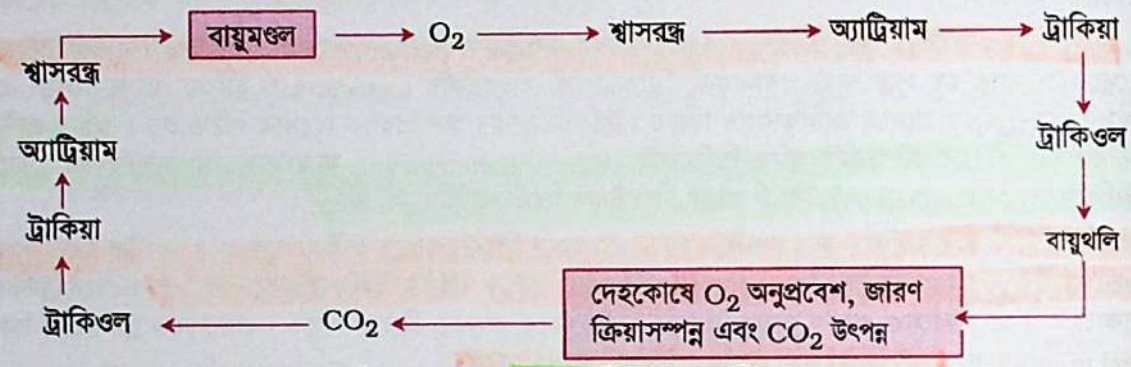

চিত্র ২.২.২৩ : শ্বসনের গতিপথের রেখাচিত্র

ঘাসফড়িং-এর রেচন তন্ত্র (Excretory System)

আমিষজাতীয় খাদ্য বিপাকে সৃষ্ট নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের প্রক্রিয়াকে রেচন (excretion) বলে। অন্যসব পতঙ্গের মতো ঘাসফড়িং-এর প্রধান রেচন অঙ্গও ম্যালপিজিয়ান নালিকা (malpighian tubule)। তবে মেদপুঞ্জের কিছু কোষ অর্থাৎ ইউরেট কোষ, ইউরিকোজ গ্রন্থি, নেফ্রোসাইট এবং কিউটিকল অতিরিক্ত রেচন অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।

ম্যালপিজিয়ান নালিকা

নামকরণ : Marcello Malpighi (1628–1694) নামক এক ইতালীয় চিকিৎসক ও জীববিজ্ঞানী সর্বপ্রথম ১৬৬৯ সালে এ নালিকা আবিষ্কার করলে তাঁর নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়।

অবস্থান : মধ্য ও পশ্চাৎ-পৌষ্টিকনালির সংযোগস্থলে অসংখ্য সুতার মতো ম্যালপিজিয়ান নালিকা হিমোসিলে বিস্তৃত থাকে। এগুলোর মুক্ত প্রান্ত বদ্ধ এবং হিমোসিল গহ্বরে হিমোলিম্ফের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। অন্যপ্রান্ত পৌষ্টিকনালির গহ্বরে উন্মুক্ত।

গঠন : প্রতিটি ম্যালপিজিয়ান নালিকা প্রায় ২৫ মিলিমিটার লম্বা, এক মিলিমিটার ব্যাসযুক্ত, সরু, নলাকার, ইলাস্টিক ও ফাঁপা। নালিকার ভিতরের ফাঁপা গহ্বরকে **লুমেন** (lumen) বলে। প্রতিটি নালিকার প্রাচীর একস্তরবিশিষ্ট এপিথেলিয়াম কোষে গঠিত। কোষস্তরের বাইরের দিক একটি ভিত্তি পর্দা (basement membrane)-য় এবং ভিতরের দিক অসংখ্য মাইক্রোভিলাই (microvilli) দিয়ে আবৃত। মাইক্রোভিলাই সম্মিলিতভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্রাশ বর্ডার (brush border) গঠন করে। নালিকাগুলো নিজে ততটা নড়নক্ষম নয় বরং হিমোসিলে হিমোলিম্ফের আন্দোলনে এগুলো রেচন সম্পন্ন করে।

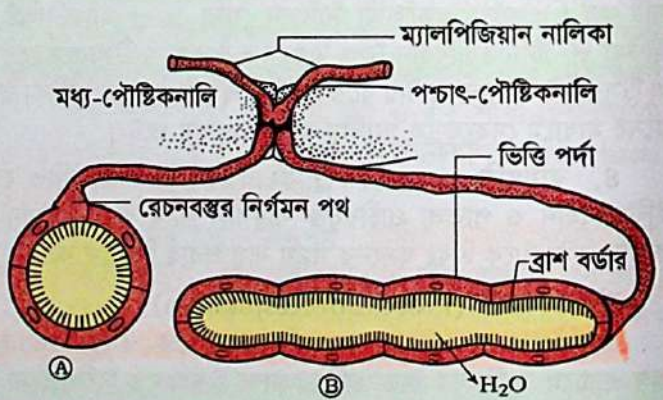

চিত্র ২.২.২৪ : ম্যালপিজিয়ান নালিকার গঠন; Ⓐ প্রস্থচ্ছেদ এবং Ⓑ লম্বচ্ছেদ

রেচন প্রক্রিয়া : ম্যালপিজিয়ান নালিকার বদ্ধ প্রান্ত হিমোলিম্ফে ভাসমান অবস্থায় থেকে রক্ত থেকে পানি ও কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে। পরে পটাসিয়াম ইউরেট নালিকার কোষের মধ্যে পানি ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে, পটাসিয়াম বাই-কার্বনেট ও ইউরিক এসিড উৎপন্ন করে। পটাসিয়াম বাইকার্বনেট ও পানি পুনঃশোষিত হয়ে হিমোলিম্ফে ফিরে আসে। কিন্তু ইউরিক এসিড নালিকার গহ্বর বা লুমেন (lumen)-এ রয়ে যায়। ইউরিক এসিড সিলিয়ার আন্দোলনের ফলে ম্যালপিজিয়ান নালিকার গোড়ার অংশ হয়ে পৌষ্টিকনালিতে প্রবেশ করে এবং পশ্চাৎঅন্ত্রে গমন করে। মলাশয়ে অবস্থানকালে ইউরিক এসিড থেকে অতিরিক্ত পানি শোষণের ফলে শুষ্ক ইউরিক এসিড দানা হিসেবে মলের সাথে বেরিয়ে যায়।

www.Educationblog24.Com

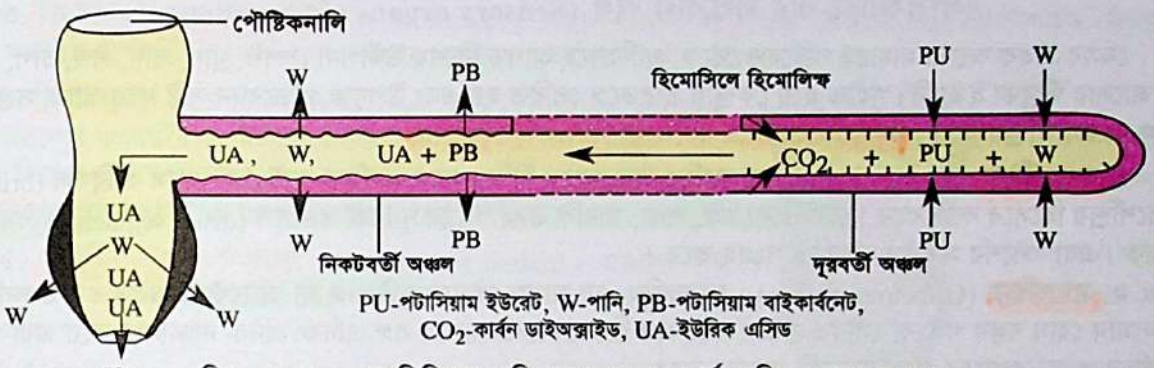

চিত্র ২.২.২৫ : ম্যালপিজিয়ান নালিকার লম্বচ্ছেদে কার্যপদ্ধতি দেখানো হয়েছে

অতিরিক্ত বা আনুষঙ্গিক রেচন অঙ্গ (Accessory Excretory Organ)

i. ইউরেট কোষ (Urate cell) : ঘাসফড়িং-এর দেহে অসংখ্য ফ্যাট বডি বা চর্বিকোষ থাকে। এগুলো প্রধানত শর্করা, আমিষ ও স্নেহ জাতীয় খাদ্যকে পরিবর্তিতরূপে জমা রাখে। তাছাড়া এগুলো হিমোলিম্ফে বিদ্যমান কিছু ইউরিক এসিড ও ইউরেট কোষের মধ্যেই আজীবন জমা করে রাখে। এসব পদার্থ সঞ্চয়ের কারণে কোষগুলো **ইউরেট কোষ** নামে পরিচিত।

ii. ইউরিকোজ গ্রন্থি (Uricose glands) : পুরুষ ঘাসফড়িংয়ের মাশরুম গ্রন্থিতে ইউরিকোজ গ্রন্থি অবস্থান করায় হিমোসিল থেকে রেচন দ্রব্য শোষণ করে ইউরিক এসিডরূপে জমা করে। সংগমের সময় এসব বর্জ্য শুক্রাণুর সাথে বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়।

iii. নেফ্রোসাইট (Nephrocyte) : পেরিকার্ডিয়াল সাইনাসে হৃৎযন্ত্রের পার্শ্বদেশে অবস্থিত নেফ্রোসাইট রেচন দ্রব্য সংগ্রহ করে রক্তের মাধ্যমে নিষ্কাশন করে।

iv. কিউটিকল (Cuticle) : নিম্ফ দশায় হিমোসিলে ভাসমান অ্যামিবা সদৃশ কিছু **অ্যামিবোসাইট** (amoebocyte) কোষ রক্ত থেকে রেচন দ্রব্য সংগ্রহ করে কিউটিকলের নিচে সঞ্চয় করে। খোলস মোচনের সময় পুরাতন কিউটিকলসহ সঞ্চিত রেচন দ্রব্য পরিত্যক্ত হয়।

ম্যালপিজিয়ান নালিকা ও ম্যালপিজিয়ান বডির মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	ম্যালপিজিয়ান নালিকা	ম্যালপিজিয়ান বডি
১. প্রকৃতি	ঘাসফড়িংসহ সকল পতঙ্গের প্রধান রেচন অঙ্গ।	মানুষসহ সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীর রেচন অঙ্গের অংশ।
২. অবস্থান	প্রাণীর অন্ত্রের প্রাচীরে গুচ্ছাকারে অবস্থান করে।	প্রাণীর বৃক্কের নেফ্রনে এককভাবে অবস্থান করে।
৩. সংখ্যা	অল্প, প্রতি ঘাসফড়িংয়ে প্রায় ১০০টি।	অসংখ্য, মানুষের দুই বৃক্কে প্রায় ২০ লক্ষ।
৪. গঠন	সূক্ষ্ম সুতার মতো, নলাকার; এপিথেলিয়াম আবরণ ও ভিত্তি পর্দা নিয়ে গঠিত।	গোলাকার; কাপের মতো বোম্যানস ক্যাপস্যুল এবং কৈশিকজালিকার পিণ্ড গ্লোমেরুলাস নিয়ে গঠিত।
৫. সংযুক্তি	এর একপ্রান্ত হিমোসিলে মুক্ত থাকে, অন্যপ্রান্ত অন্ত্রের সাথে সংযুক্ত থাকে।	এর একপ্রান্ত নেফ্রনের প্রক্সিমাল প্যাঁচানো নালিকার সাথে এবং অন্যপ্রান্ত রক্তনালিকার সাথে যুক্ত থাকে।
৬. কার্যপদ্ধতি	হিমোসিলে বিদ্যমান হিমোলিম্ফ থেকে রেচনবর্জ্য সংগ্রহ করে পৌষ্টিকনালিতে প্রেরণ করে।	রক্ত থেকে সূক্ষ্ম ছাঁকনের মাধ্যমে রেচনবর্জ্যসহ অনেক প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করে নেফ্রন নালিকায় প্রেরণ করে।

www.Educationblog24.Com

ঘাসফড়িং-এর সংবেদী অঙ্গ (Sensory organs of Grasshopper)

যেসব গ্রাহক অঙ্গের মাধ্যমে পরিবেশ থেকে প্রাণিদেহে আগত বিশেষ উদ্দীপনা (স্পর্শ, ঘ্রাণ, স্বাদ, শব্দ, চাপ, তাপ ও আলোর তীব্রতা ইত্যাদি) গৃহীত হয়ে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে প্রেরিত হয় এবং উপযুক্ত প্রতিবেদন সৃষ্টি করে তাকে **সংবেদী অঙ্গ** বা **জ্ঞানেন্দ্রিয়** বলে। ঘাসফড়িংয়ে নিচে বর্ণিত সংবেদী অঙ্গ দেখা যায় –

১. **স্পর্শেন্দ্রিয়** (Tactile organs) : ঘাসফড়িং-এর দেহের বিভিন্ন অঙ্গে অবস্থিত ছোট ছোট রোম ও ব্রিসল (bristle) স্পর্শেন্দ্রিয় হিসেবে কাজ করে। রোমগুলো শুঙ্গ, পাল্প, সারকি এবং পায়ের দূরবর্তী খণ্ডাংশে (distal segments) বিদ্যমান থাকে। এরা স্পর্শের মাধ্যমে অনুভূতি সংগ্রহ করে।

২. **ঘ্রাণেন্দ্রিয়** (Olfactory organs) : ঘাসফড়িং-এর মাথার সামনে দুটি শুঙ্গ বা অ্যান্টেনা অবস্থিত। শুঙ্গদুটিতে বিদ্যমান রোম বস্তুর গন্ধ বা সৌরভ সংগ্রহকারী অঙ্গ হিসেবে কাজ করে। শুঙ্গ এদিক ওদিক নাড়াচাড়া করে এরা খাদ্য নির্বাচন ও তা সংগ্রহের প্রয়োজানুভূতি অনুভব করে।

৩. **স্বাদেন্দ্রিয়** (Gustatory organs) : ঘাসফড়িং অতি সহজেই খাদ্যবস্তুর স্বাদ নিতে পারে। এদের স্বাদগ্রহণ ক্ষমতা বেশ প্রখর। স্বাদানুভূতি অঙ্গ প্রধানত মুখোপাঙ্গে থাকে। ম্যাক্সিলারি পাল্প ও ল্যাবিয়ামে অবস্থিত রোমের মাধ্যমে এরা খাদ্যবস্তুর স্বাদ গ্রহণ করে।

৪. **দর্শনেন্দ্রিয়** (Visual organs) : ঘাসফড়িং-এ দর্শনাঙ্গ হিসেবে ওসেলি ও পুঞ্জাক্ষি উভয়ই উপস্থিত থাকে। ওসেলির সাহায্যে ঘাসফড়িং আলোর তীব্রতার পরিবর্তন অনুধাবন করে। পুঞ্জাক্ষিতে দর্শনীয় বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।

৫. **শ্রবণেন্দ্রিয়** (Auditory organs) : ঘাসফড়িং-এর ১ম উদরীয় খণ্ডকের প্রতিপাশে একটি করে ডিম্বাকার টিমপেনিক পর্দা (tympanic membrane) রয়েছে যা শ্রবণের জন্য ব্যবহৃত শ্রবণ থলি বা টিমপেনাম (tympanum)কে ঢেকে রাখে। এছাড়া পায়ু সারকিতে অবস্থিত রোমও শ্রবণানুভূতি স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে প্রেরণ করে।

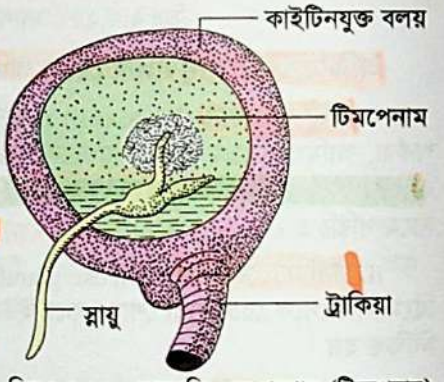

চিত্র ২.২.২৬ : ঘাসফড়িং-এর শ্রবণাঙ্গ (টিমপেনাম)

ঘাসফড়িং-এর পুঞ্জাক্ষি (Compound Eye) — গঠন ও দর্শন কৌশল

ঘাসফড়িংয়ের মাথার পৃষ্ঠভাগের উভয় পাশে অবস্থিত বড়, বৃন্তহীন, বৃক্কাকার, উত্তল, কালো অংশকে পুঞ্জাক্ষি বলে। প্রত্যেক পুঞ্জাক্ষি প্রায় দুহাজার (প্রজাতিভেদে সংখ্যা বিভিন্ন) ষড়ভূজাকার ওমাটিডিয়া (ommatidia) নিয়ে গঠিত। প্রতিটি ওমাটিডিয়াম (একবচনে) একেকটি দর্শন একক হিসেবে কাজ করে। সমগ্র পুঞ্জাক্ষির উপরিভাগ স্বচ্ছ কিউটিকল (cuticle)-এ আবৃত থাকে। পুঞ্জাক্ষিতে অবস্থিত প্রতিটি ওমাটিডিয়ামের গঠন ও কার্যপদ্ধতি অভিন্ন ধরনের। নিচে একটি ওমাটিডিয়ামের গঠন ও এর বিভিন্ন অংশের কাজ উল্লেখ করা হলো।

১. **কর্নিয়া** (Cornea) : এটি ওমাটিডিয়ামের বাইরের দিকের বর্ণহীন, স্বচ্ছ, উত্তল ও ছয়কোণা কিউটিকল আবরণী। এটি লেন্সের মতো কাজ করে।

২. **কর্নিয়াজেন কোষ** (Corneagen cell) : এরা কর্নিয়ার নিচে একজোড়া চাপা ও পাশাপাশি অবস্থিত কোষ। এদের ক্ষরণ থেকে কর্নিয়া সৃষ্টি হয়।

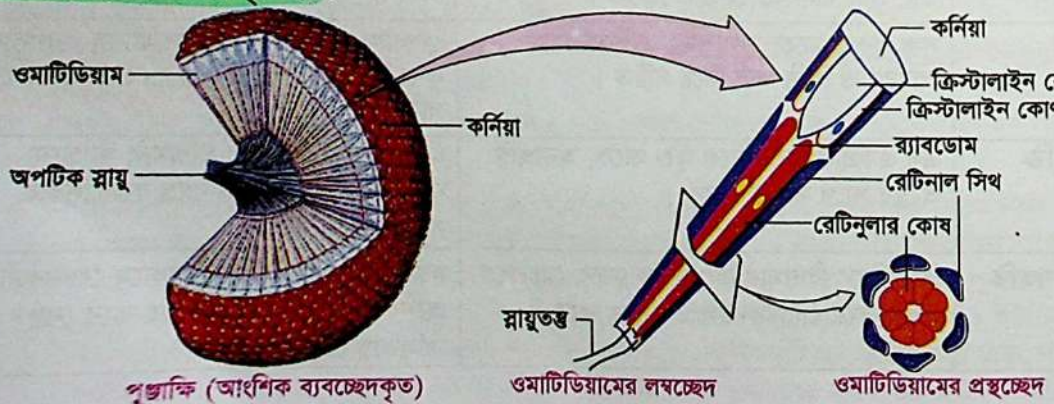

চিত্র ২.২.২৭ : ঘাসফড়িং-এর পুঞ্জাক্ষি (বায়ে) এবং একটি ওমাটিডিয়াম (ডানে)

www.Educationblog24.Com

৩. **ক্রিস্টালাইন কোণ কোষ** (Crystalline cone cell): এগুলো কর্নিয়াজেন কোষের নিচে ক্রিস্টালাইন কোণকে ঘিরে অবস্থিত দীর্ঘ ৪টি কোষ। এসব কোষের ক্ষরণ থেকে ক্রিস্টালাইন কোণ গঠিত হয়।

৪. **ক্রিস্টালাইন কোণ** (Crystalline cone) : এটি কোণ কোষে পরিবেষ্টিত এবং এগুলোর মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থিত একটি স্বচ্ছ, মোচাকৃতি অঙ্গ। কোণ কোষ থেকে নিঃসৃত পদার্থে ক্রিস্টালাইন কোণ গঠিত হয়। এটি প্রতিসরণশীল অঙ্গ হিসেবে কাজ করে ওমাটিডিয়ামে আলো প্রবেশে সাহায্য করে।

৫. **আইরিশ রঞ্জক আবরণী** (Iris pigment sheath) : এগুলো দীর্ঘ রঙিন (কালো কণিকা বহনকারী) কোষ যা কোণ কোষগুলোকে ঘিরে রাখে। তীব্র আলোতে এ আবরণ প্রসারিত হয়ে কোণ কোষগুলোকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করে, আবার মৃদু আলোকে সংকুচিত হয়ে আংশিক উন্মুক্ত রাখে।

৬. **রেটিনুলার কোষ** (Retinular cell) : কোণ কোষগুলোর নিচে বৃত্তাকারে ৭/৮টি লম্বা রেটিনুলার কোষ অবস্থিত। এগুলোর নিউক্লিয়াস কোণ কোষ সংলগ্ন প্রান্তে অবস্থিত। এসব কোষ একদিকে কোণ কোষের সাথে অন্যদিকে স্নায়ুতন্তুর সাথে যুক্ত। এসব কোষের ক্ষরণ থেকে র‍্যাবডোম গঠিত। তাছাড়া এগুলো আলোক সংবেদীও বটে।

৭. **র‍্যাবডোম** (Rhabdome) : ক্রিস্টালাইন কোণের নিচে অবস্থিত স্বচ্ছ প্রলম্বিত এ অংশটি অনুপ্রস্থভাবে রেখান্বিত। একে ঘিরে অবস্থিত রেটিনুলার কোষগুলোর ক্ষরণ থেকেই র‍্যাবডোম গঠিত ও পুষ্ট হয়। এর মাধ্যমে আলো গৃহীত হয়।

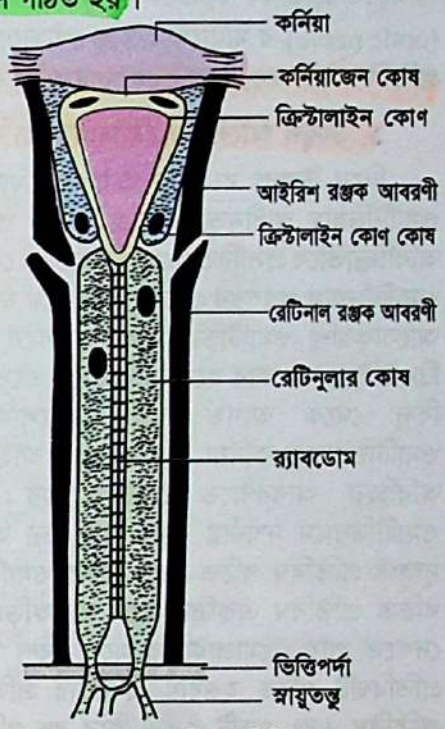

চিত্র ২.২.২৮ : একটি ওমাটিডিয়াম (লম্বচ্ছেদ)

৮. **রেটিনাল রঞ্জক আবরণী** (Retinal pigment sheath) : এটি রেটিনুলার কোষকে ঘিরে রঞ্জকময় কোষে গঠিত কালো পর্দার একটি আবরণ। এটি প্রত্যেক ওমাটিডিয়ামকে পরস্পর থেকে পৃথক করে রাখে। এ পর্দার রঞ্জক পদার্থ আলোর তীব্রতার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন দিকে সঞ্চালিত হতে পারে।

৯. **ভিত্তিপর্দা** (Basal membrane) : ওমাটিডিয়াম যে পাতলা পর্দার উপর অবস্থান করে তার নাম ভিত্তিপর্দা। এটি ওমাটিডিয়ামকে ধারণ করে।

১০. **স্নায়ুতন্তু** (Nerve fibre) : প্রতিটি রেটিনুলার কোষ থেকে স্নায়ুতন্তু বেরিয়ে অপটিক স্নায়ুর সাথে যুক্ত হয়। এসব তন্তু ওমাটিডিয়ার মাধ্যমে গৃহীত প্রতিবিম্ব মস্তিষ্কে প্রেরণ করে।

পুঞ্জাক্ষি (জটিল চোখ) এবং সরলাক্ষি (সরল চোখ)-র মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	পুঞ্জাক্ষি	সরলাক্ষি
১. অবস্থান	আর্থ্রোপোডদের মাথার পৃষ্ঠ বা পার্শ্ব দিকে।	মেরুদন্ডী প্রাণিদের মাথার দুপাশে, কোটরের ভিতরে।
২. গঠন	গোল বা বৃক্কাকার, অসংখ্য ওমাটিডিয়া একক নিয়ে গঠিত।	প্রায় গোল, সরলাক্ষি নিজেই একটি একক।
৩. এককের উপাদান	কর্নিয়া, কর্নিয়াজেন কোষ, কোণ কোষ, ক্রিস্টালাইন কোণ, আইরিশ আবরণী, রেটিনাল আবরণী, র‍্যাবডোম ইত্যাদি।	কর্নিয়া, আইরিশ, লেন্স, রেটিনা, কোরয়েড, স্ক্লেরা, পেশি, প্রকোষ্ঠ ইত্যাদি।
৪. আইরিশ আবরণী	অসংখ্য ও লম্বা।	একটি এবং গোল।
৫. স্ক্লেরা ও কোরয়েড	অনুপস্থিত।	উপস্থিত।
৬. প্রতিবিম্ব	মৃদু আলো ও উজ্জ্বল আলোতে ভিন্ন ধরনের প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।	সবক্ষেত্রে একই ধরনের প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।

দর্শন কৌশল (Mechanism of Vision)

প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে প্রাণী বস্তুকে অবলোকন করে। ঘাসফড়িং **দিবাচর শস্যভোজী** প্রাণী। দিনের **উজ্জ্বল (তীব্র)** আলো ও দিনের শেষে **স্তিমিত** (মৃদু) আলো– দুসময়েই এদের দৃষ্টিশক্তি কার্যকর থাকে। এজন্য দুটো ভিন্ন দর্শন কৌশল রয়েছে। এরা মানুষের চেয়ে স্পষ্টভাবে কোনো চলমান বস্তু দেখতে পারে। সাধারণত ঘাসফড়িং একটি ওমাটিডিয়াম

www.Educationblog24.Com

দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বস্তুকে দেখতে পায়না। প্রতিটি ওমাটিডিয়ামে বস্তুর খণ্ডিত প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। সকল ওমাটিডিয়ামের সম্মিলিত প্রতিবিম্ব বস্তুটিকে সম্পূর্ণরূপে দেখতে সাহায্য করে। সম্পূর্ণভাবে গঠিত প্রতিবিম্বের সংবেদন **অপটিক স্নায়ু** (optic nerve)-র মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌছালে ঘাসফড়িং তা দেখতে পায়। **আলোর তীব্রতা অনুসারে পুঞ্জাক্ষিতে দুধরনের প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়, যথা– মোজাইক প্রতিবিম্ব এবং সুপারপজিশন প্রতিবিম্ব।**

১. উজ্জ্বল আলোতে মোজাইক বা অ্যাপোজিশন প্রতিবিম্ব (Mosaic or Apposition Image)

দিনে উজ্জ্বল বা তীব্র আলোতে ঘাসফড়িং-এর ওমাটিয়ামে **মোজাইক প্রতিবিম্ব** সৃষ্টি হয় এবং এতে **প্রত্যেক** ওমাটিডিয়াম স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। উজ্জ্বল আলোতে আইরিশ রঞ্জক আবরণী ও রেটিনাল রঞ্জক আবরণী অবিচ্ছিন্নভাবে প্রসারিত হয়ে কর্নিয়াজেন কোষ ও ক্রিস্টালাইন কোণ কোষগুলোকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করে। ফলে প্রতিটি ওমাটিডিয়াম পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায়। এ অবস্থায় দর্শনীয় বস্তুর কোন বিন্দু থেকে আগত কেবল লম্বভাবে পতিত আলোকরশ্মি ওমাটিডিয়ামে প্রবেশ করে এবং কর্নিয়া ও ক্রিস্টাইলাইন কোণ হয়ে র‍্যাবডোমে এসে পড়ে। কিন্তু ঐ বিন্দু থেকে আগত তির্যক আলোকরশ্মি পার্শ্ববর্তী ওমাটিডিয়ামের কর্নিয়া ভেদ করলেও আইরিশ ও রেটিনাল অবিচ্ছিন্ন আবরণীতে শোষিত হয়। ফলে প্রতিটি ওমাটিডিয়ামে দর্শনীয় বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অংশের পৃথক ও সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। সকল ওমাটিডিয়ামের এসব খন্ডিত প্রতিবিম্ব একত্রিত হলে ঘাসফড়িং বস্তুটিকে স্পষ্ট দেখতে পায়। মোজাইকের মতো বিন্দু বিন্দু করে পুরো প্রতিবিম্বটি গঠিত হওয়ায় এধরনের প্রতিবিম্ব **মোজাইক প্রতিবিম্ব** এবং একটি একটি করে বহু প্রতিবিম্বের সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবিম্ব তৈরি হওয়ায় এধরনের প্রতিবিম্বকে **অ্যাপোজিশন প্রতিবিম্ব** বলা হয়ে থাকে।

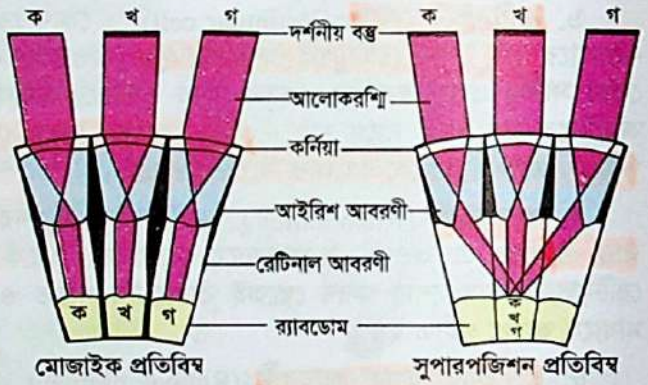

চিত্র ২.২.২৮ : ঘাস ফড়িংয়ের দর্শন কৌশল

২. অনুজ্জ্বল বা স্তিমিত আলোতে সুপারপজিশন প্রতিবিম্ব (Superposition Image)

সাধারণত বিকেলে, সন্ধ্যায় বা রাতে অর্থাৎ অনুজ্জ্বল আলোতে ঘাসফড়িং-এর ওমাটিডিয়ামে **সুপারপজিশন প্রতিবিম্ব** সৃষ্টি হয়। অনুজ্জ্বল বা স্তিমিত আলোতে ওমাটিডিয়ামের আইরিশ রঞ্জক আবরণী কর্নিয়ার দিকে এবং রেটিনাল রঞ্জক আবরণী ভিত্তি পর্দার দিকে সংকুচিত হয়ে যায়। ফলে পুরো ওমাটিডিয়াম অর্থাৎ ক্রিস্টালাইন কোণ ও র‍্যাবডোম অনাবৃত হয়ে যায়। এসময় দর্শন বস্তু হতে সরাসরি আসা আলোকরশ্মি সোজাসুজি কর্নিয়া, ক্রিস্টালাইন কোণ হয়ে র‍্যাবডোমে পৌছায়। আবার দর্শন বস্তু থেকে তির্যকভাবে আসা আলোকরশ্মি একটি ওমাটিডিয়ামের কর্নিয়ার মাধ্যমে প্রবেশ করে পাশের ওমাটিডিয়ামের র‍্যাবডোমে এসে পড়ে। রঞ্জক আবরণীদুটির বাধা না থাকায় আলোকরশ্মির এধরনের চলাচল সম্ভব হয়। ফলে একটি ওমাটিডিয়ামে একাধিক দিক থেকে আসা আলোকরশ্মি দিয়ে একের উপর আরেকটি এভাবে একাধিক প্রতিবিম্ব পড়ে। ফলে সম্পূর্ণ বস্তুর একটি অস্পষ্ট ও ঝাপসা প্রতিবিম্ব তৈরি হয়। একটির উপর আরেকটি প্রতিবিম্ব পড়ার ফলে সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হওয়ায় এধরনের প্রতিবিম্বকে **সুপারপজিশন প্রতিবিম্ব** বলা হয়ে থাকে।

সুপারপজিশন প্রতিবিম্ব ও অ্যাপোজিশন প্রতিবিম্বের তুলনা

তুলনীয় বিষয়	সুপারপজিশন প্রতিবিম্ব	মোজাইক প্রতিবিম্ব
১. আলোর অবস্থা	মৃদু বা স্তিমিত আলোতে প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।	তীব্র বা উজ্জ্বল আলোতে প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।
২. রঞ্জক আরবণী	রেটিনাল ও আইরিশ আবরণী সংকুচিত হয়।	রেটিনাল ও আইরিশ আবরণী প্রসারিত হয়।
৩. আলোকরশ্মি	তির্যক ও উলম্বিক উভয় আলোকরশ্মি ওমাটিডিয়ামে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে।	কেবল উলম্বিক আলোকরশ্মি ওমাটিডিয়ামে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে।
৪. প্রতিবিম্বের ধরণ	বস্তুর সম্পূর্ণ অংশের অস্পষ্ট, সামগ্রিক ও ঝাপসা প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।	বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অংশের পৃথক ও সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।

www.Educationblog24.Com

ঘাসফড়িং-এর প্রজনন প্রক্রিয়া ও রূপান্তর (Process of Reproduction and Metamorphosis)

প্রজননতন্ত্র (Reproductive System)

ঘাসফড়িং একলিঙ্গ প্রাণী। এদের যৌন দ্বিরূপতা সুস্পষ্ট। একটি পুরুষ ও স্ত্রী ঘাসফড়িং বাইরে থেকে দেখে খুব সহজে চেনা যায়। স্ত্রী ফড়িং-এর উদরের **ওভিপজিটর** (ovipositor) দেখে পুরুষ সদস্য আলাদা করা হয়। নিচে ঘাসফড়িং-এর পুরুষ ও স্ত্রী জননতন্ত্র সম্বন্ধে আলাদাভাবে বর্ণনা করা হলো।

চিত্র ২.২.২৯ : পুংজননতন্ত্র

পুংজননতন্ত্র : ঘাসফড়িং-এর পুংজননতন্ত্র একজোড়া করে শুক্রাশয়, শুক্রনালি বা ভাস ডিফারেন্স, সহায়ক গ্রন্থি, সেমিনাল ভেসিকল, একটি করে ক্ষেপননালি ও পুরুষাঙ্গ নিয়ে গঠিত। **শুক্রাশয়** (testis) পুংজননতন্ত্রের মুখ্য অঙ্গ। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম উদর খণ্ডকে অন্ত্রের উপরে একটি **মিডিয়ান লিগামেন্ট** (median ligament) দ্বারা পৃষ্ঠীয় প্রাচীরের সাথে শুক্রাশয় সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। প্রতিটি শুক্রাশয় কতগুলো ক্ষুদ্র স্বচ্ছ **ফলিকল** (follicle) নিয়ে গঠিত। ফলিকলের মধ্যে উৎপন্ন শুক্রাণু সূক্ষ্ম নালিকার (ভাসা ইফারেন্সিয়া) মাধ্যমে লম্বা শুক্রনালি বা **ভাস ডিফারেন্স** (vas deferens)-এ প্রবেশ করে। নবম উদর খণ্ডকে দুপাশের দুটি ভাসা ডিফারেন্সিয়া (বহুবচনে) মিলিত হয়ে একটি **ক্ষেপননালি** (ejaculatory duct) গঠন করে। এটি পুরুষাঙ্গে অবস্থিত ছিদ্রের মাধ্যমে বাইরে উন্মুক্ত হয়। একজোড়া **সহায়ক গ্রন্থি** (accessory gland) ক্ষেপন নালিতে উন্মুক্ত হয়ে তরল পদার্থ ক্ষরণ করে। এ তরলে শুক্রাণু নিমজ্জিত থাকে। সহায়ক গ্রন্থির সঙ্গে প্যাঁচানো, লম্বা **সেমিনাল ভেসিকল** (seminal vesicle) যুক্ত থাকে।

চিত্র ২.২.৩০ : স্ত্রীজননতন্ত্র

স্ত্রীজননতন্ত্র : স্ত্রীজননতন্ত্র ডিম্বাশয়, ডিম্বনালি, যোনি, স্পার্মাথিকা বা সেমিনাল রিসেপ্টেকল, স্ত্রীজননরন্ধ্র ও আনুষঙ্গিক গ্রন্থি নিয়ে গঠিত। দুটি **ডিম্বাশয়** (ovary) স্ত্রীজননতন্ত্রের মুখ্য অঙ্গ এবং অন্ত্রের উপরে **মিডিয়ান লিগামেন্ট** (median ligament) দ্বারা পৃষ্ঠীয় প্রাচীরের সাথে আটকানো থাকে। প্রতিটি ডিম্বাশয় নলের মতো অনেক অণুডিম্বাশয় বা **ওভারিওল** (ovarioles) নিয়ে গঠিত। অণুডিম্বাশয়গুলো একত্রে মিলিত হয়ে একটি করে চওড়া ডিম্বনালি গঠন করে। দুটি ডিম্বনালি একীভূত হয়ে **যোনি** (vagina) নামে একটি ছোট প্রকোষ্ঠ গঠন করে। যোনি দেহের ৭ম উদরীয় খন্ডে অবস্থিত একটি পেশিবহুল প্রকোষ্ঠ যা ওভিপজিটর এর দুটি অংশের মাঝে অবস্থিত। এটি ওভিপজিটর হয়ে জননছিদ্রের মাধ্যমে বাইরে উন্মুক্ত হয়। যোনিতে একজোড়া ডিম্বনালি ছাড়াও একটি কুন্ডলীকৃত **স্পার্মাথিকাল নালি** যুক্ত থাকে। এ কুন্ডলীকৃত নালির শেষ প্রান্তে একটি থলির মতো **স্পার্মাথিকা** (spermatheca) থাকে যা অল্প সময়ের জন্য শুক্রাণুকে স্ত্রীদেহে জমা করে রাখে। ডিম্বাশয়ের উপরিভাগে একজোড়া **সহায়ক গ্রন্থি** রয়েছে যা ডিম্বনালির মাধ্যমে যোনিতে এসে সংযুক্ত হয়। এ সহায়ক গ্রন্থি নিঃসৃত তরল দেহের বাইরে আসার আগে ডিমকে গুচ্ছবদ্ধ রাখতে সহায়তা করে।

চিত্র ২.২.৩১ : যৌনমিলন

প্রজনন প্রক্রিয়া (Process of Reproduction)

ঘাসফড়িং **যৌন** (sexual) প্রক্রিয়ায় প্রজনন ঘটায়। এর প্রজনন প্রক্রিয়া নিচে বর্ণিত কয়েকটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়।

১. **যৌনমিলন** (Copulation) : গ্রীষ্মের শেষদিকে ঘাসফড়িং-এর যৌনমিলন ঘটে। এ সময় পুরুষ-ফড়িং স্ত্রী-ফড়িং-এর পিঠে উঠে আটকে থাকে এবং এ অবস্থায় শিশ্নপথে স্ত্রী-ফড়িং-এর যোনিতে সেমিনাল ফ্লুইড ত্যাগ করে। সেমিনাল ফ্লুইডে শুক্রাণু থাকে। ডিম না পাড়া পর্যন্ত শুক্রাণুগুলো স্পার্মাথিকায় জমা থাকে। ডিম পাড়ার আগে কয়েকবার মিলন হতে পারে।

www.Educationblog24.Com

২. নিষেক (fertilization) : যৌন মিলনের এক পর্যায়ে পুরুষ-প্রাণিদেহ থেকে শুক্রাণু স্ত্রী-প্রাণিদেহে স্থানান্তরিত হয় এবং শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াসের পরস্পর একীভবনে নিষেক সম্পন্ন হয়। ঘাসফড়িং-এর নিষেক অন্তঃস্থ (internal)। ৩–৫ মি.মি. লম্বা ডিম্বাণুটি কুসুম (yolk) সমৃদ্ধ এবং ডিম্বনালি দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় নরম ভাইটেলাইন ঝিল্লি (vitelline membrane) ও শক্ত-নমনীয় বহিঃস্থ কোরিওন (chorion)-এ আবৃত হয়। স্পার্মাথিকা রন্ধ্রের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় ডিম নিষিক্ত হয়। কোরিওনের একটি ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে শুক্রাণু ডিম্বাণুতে প্রবেশ করে। এ ছিদ্রটিকে মাইক্রোপাইল (micropyle) বলে।

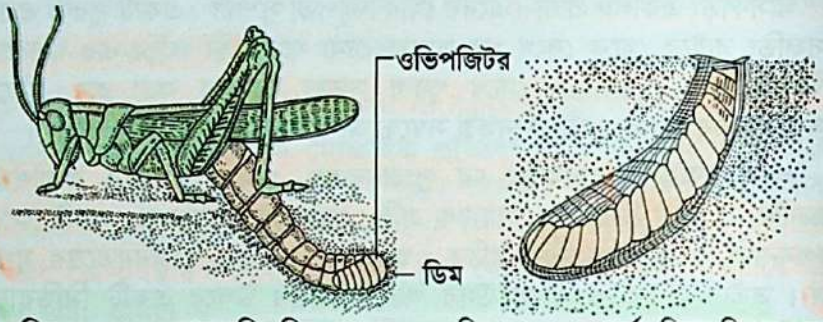

চিত্র ২.২.৩২ : ঘাসফড়িং ডিম পাড়ছে

চিত্র ২.২.৩৩ : গর্তের ভিতর ডিমের গুচ্ছ

৩. ডিমপাড়া (oviposition) : মিলনের পর থেকে কিছুদিন পর পর স্ত্রী ঘাসফড়িং লম্বা, বাদামি রংয়ের ডিম পাড়তে শুরু করে। শরৎকাল পর্যন্ত ডিমপাড়া অব্যাহত থাকে। স্ত্রী ফড়িং ওভিপজিটরের সাহায্যে ১০ সে.মি. গভীর একটি গর্ত করে এর ভিতরে গুচ্ছাকারে ২০টি ডিম পাড়ে। আঠালো পদার্থের সাহায্যে ডিমগুলো পরস্পর আটকে থাকে। একটি স্ত্রী-ফড়িং এভাবে ১০টি গুচ্ছে মোট ২০০টি ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার পর পুরুষ ও স্ত্রী উভয় ঘাসফড়িংই মারা যায়।

৪. পরিস্ফুটন (Development) : ঘাসফড়িং-এর ডিম্বাণু সেন্ট্রোলেসিথাল (centrolecithal) ধরনের অর্থাৎ এর কুসুম কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ থাকে। নিষিক্ত ডিম্বাণুর ক্লিভেজ (বিভাজন) শুরু হওয়ার পর প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে পরিস্ফুটন অব্যাহত থাকে। শীতকালে পরিস্ফুটন বন্ধ থাকে। এ সময়কালটি ডায়াপজ (diapause) নামে পরিচিত। তখন শীতকালীন প্রতিকূল অবস্থার (প্রচন্ড শীত ও খাদ্যাভাব) মুখোমুখি যেন শিশু ফড়িংকে পড়তে না হয় সে কারণে ডায়াপজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বসন্তের আগমনে উষ্ণ পরিবেশ ফিরে এলে আবার বৃদ্ধি শুরু হয় এবং অতি ক্ষুদ্রাকায় শিশু ঘাসফড়িং-এর জন্ম হয়।

রূপান্তর (Metamorphosis)

পতঙ্গের ভ্রূণ যখন কয়েকটি ধারাবাহিক পরিবর্তনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ দশা প্রাপ্ত হয় তখন এ ধরনের ভ্রূণোত্তর পরিস্ফুটনকে রূপান্তর বলে। রূপান্তর প্রধানত দুধরনের– ১. অসম্পূর্ণ ও ২. সম্পূর্ণ রূপান্তর।

১. অসম্পূর্ণ রূপান্তর (Incomplete metamorphosis) : যে রূপান্তরে একটি পতঙ্গ ডিম ফুটে বেরিয়ে কয়েকটি নিম্ফ (শিশু) দশা অতিক্রমের পর পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গে পরিণত হয় তাকে অসম্পূর্ণ রূপান্তর বলে। প্রত্যেক নিম্ফ দশা দেখতে প্রায় পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গের ক্ষুদ্র প্রতিরূপের মতো, কিন্তু এগুলো ডানা ও জননাঙ্গবিহীন থাকে এবং স্পষ্ট বর্ণপার্থক্য প্রদর্শন করে। অসম্পূর্ণ রূপান্তরে শিশু অবস্থায় প্রাণীকে নিম্ফ (nymph) বলে। উদাহরণ– ঘাসফড়িং ও তেলাপোকার রূপান্তর।

২. সম্পূর্ণ রূপান্তর (Complete metamorphosis) : যে রূপান্তরে শিশু প্রাণী ও পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর মধ্যে কোনো আঙ্গিক মিল থাকে না এবং ব্যাপক পরিবর্তনের মাধ্যমে শিশুপ্রাণী পূর্ণাঙ্গ অবস্থাপ্রাপ্ত হয়, সে ধরনের রূপান্তরকে সম্পূর্ণ রূপান্তর বলে। এ ক্ষেত্রে রূপান্তরের ৪টি সুস্পষ্ট ধাপ হচ্ছে ডিম → লার্ভা→পিউপা → ইমোগো (পূর্ণাঙ্গ)। সম্পূর্ণ রূপান্তরে শিশু অবস্থায় প্রাণীকে লার্ভা (larva) বলে। উদাহরণ– মৌমাছি ও প্রজাপতির রূপান্তর।

ঘাসফড়িং-এর রূপান্তর

ঘাসফড়িং-এর রূপান্তর অসম্পূর্ণ বা হেমিমেটাবোলাস (hemimetabolous) ধরনের, কারণ এদের অপরিণত নিম্ফ আংশিক পরিস্ফুটনের মাধ্যমে কয়েকটি নিম্ফ দশা পেরিয়ে পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং-য়ে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ ঘাসফড়িংয়ের জীবন ইতিহাসে তিনটি ধাপ রয়েছে: ডিম → নিম্ফ → পূর্ণাঙ্গ প্রাণী।

www.Educationblog24.Com

ডিম ফুটে যে তরুণ ঘাসফড়িং বেরিয়ে আসে তাকে **নিম্ফ** (nymph) বলে। বহির্গঠনের দিক থেকে নিম্ফ এবং পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং দেখতে প্রায় এক রকম, অন্ততঃ মুখোপাঙ্গ, সরলাক্ষি ও পুঞ্জাক্ষি, অ্যান্টেনি, পায়ু প্রভৃতি। অনুরূপভাবে, নিম্ফের জীবনধারণ, খাদ্যাভ্যাস, খাদ্য ও বসতিও এক রকম। নিম্ফ ও পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং-এ পার্থক্য হচ্ছে নিম্ফে ডানা ও জননাঙ্গ থাকে না, তা ছাড়া দেহের আকার-আকৃতি ছোট থাকে। পূর্ণাঙ্গ হলে ডানা ও জননাঙ্গের পরিস্ফুটন ঘটে, দেহের আকারও বড় হয়।

সদ্য পরিস্ফুটিত নিম্ফের কাইটিন নির্মিত বহিঃকঙ্কাল থাকে স্বচ্ছ, ক্রমশ গাঢ় হয়। একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের এ নিম্ফ একটু বড় হলে বহিঃকঙ্কাল আঁটসাট হয়ে দেহবৃদ্ধি রহিত করে দেয়। তখন দেহবৃদ্ধি স্বাভাবিক রাখতে পুরনো বহিঃকঙ্কাল মোচন বা **মোল্টিং** (molting) প্রক্রিয়ায় ত্যাগ করে ২য় ধাপের নিম্ফে পরিণত হয়। পরবর্তীতে আরও ৩ বার

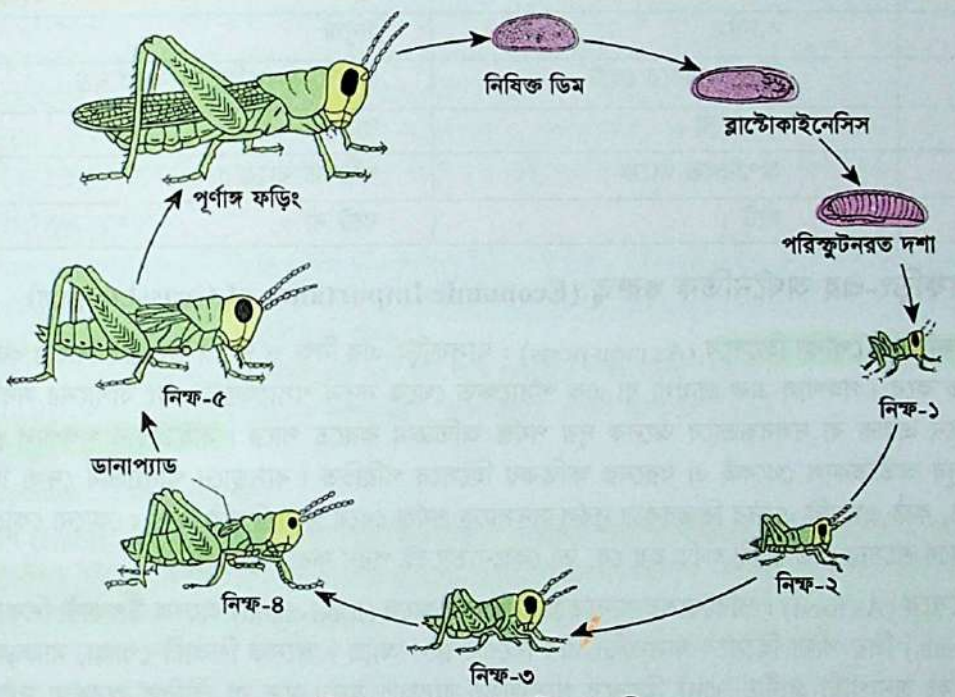

চিত্র ২.২.৩৪ : ঘাসফড়িং-এর জীবনচক্র

খোলস মোচনের পর পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং-এ রূপান্তরিত হয়। দ্বিতীয় ধাপের নিম্ফে ক্ষুদ্রাকায় **ডানা প্যাড** (wing pad) থেকে ডানা সৃষ্টির সূত্রপাত ঘটে। প্রতিবার খোলস মোচনের পর নিম্ফ দেখতে ছোট আকৃতির পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং-এর মতো দেখায়। তা ছাড়া, এদের পরিস্ফুটনে কোনো বিশ্রাম দশাও নেই। পঞ্চম বার খোলস মোচনের মাধ্যমে নিম্ফ পরিণত ঘাসফড়িং হয়ে উঠে। দুটি মোচনের মধ্যবর্তী দশাকে **ইনস্টার** (instar) বলে। ঘাসফড়িং-এর রূপান্তর সম্পন্ন হতে প্রায় দুমাস সময় লাগে।

রূপান্তরে হরমোনের ভূমিকা

ঘাসফড়িং-এর দেহে ৪ ধরনের অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি পাওয়া যায়– **ইন্টারসেরিব্রাল গ্রন্থিকোষ, প্রোথোরাসিক গ্রন্থি, করপোরা অ্যালাটা** এবং **করপোরা কার্ডিয়াক**। এগুলোর মধ্যে প্রথম ৩টি গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোন ঘাসফড়িং-এর রূপান্তরে প্রধান ভূমিকা পালন করে। নিচে এগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

১. **ইন্টারসেরিব্রাল গ্রন্থিকোষ** (Intercerebral gland cells) : মস্তিষ্কে অবস্থানকারী এ গ্রন্থিকোষগুলো প্রোথোরাসিকোট্রপিক হরমোন বা **মস্তিষ্ক হরমোন** (Prothoracicotropic hormone or Brain hormone) ক্ষরণ করে যা প্রোথোরাসিক গ্রন্থিকে হরমোন ক্ষরণে উদ্দীপিত করে।

২. **প্রোথোরাসিক গ্রন্থি** (Prothoracic gland) : অগ্রবক্ষে অবস্থিত এ গ্রন্থিগুলো **একডাইসোন হরমোন** (ecdysone hormone) ক্ষরণ করে যা নিম্ফ দশায় খোলস মোচন বা **মোল্টিং** (ecdysis or moulting) নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে দেহে টিস্যুর বৃদ্ধি ঘটতে থাকে।

www.Educationblog24.Com

৩. করপোরা অ্যালাটা (Corpora allata) : নিম্ফ দশায় এ গ্রন্থি থেকে **জুভেনাইল হরমোন** (Juvenile hormone -neotinin) ক্ষরিত হয় করে যা নিম্ফদশার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। প্রকৃতপক্ষে এ হরমোনের প্রভাবেই ঘাসফড়িং- এর নিম্ফ দশা দীর্ঘ হয়। প্রাপ্তবয়স্ক ঘাসফড়িং-এর করপোরা অ্যালাটা থেকে **গোনাডোট্রপিক হরমোন** (Gonadotropic hormone) নিঃসৃত হয় যা প্রাপ্তবয়স্কদের জনন অঙ্গের পরিণতি ঘটায়।

৪. করপোরা কার্ডিয়াকা (Corpora cardiaca) : মস্তিষ্কের পশ্চাৎভাগে গ্রাসনালির দুপাশে অবস্থিত এ গ্রন্থিগুলো **গ্রোথ হরমোন** (Growth hormone) নিঃসরণ করে।

নিম্ফ ও পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং- এর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	নিম্ফ (Nymph)	পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং (Adult Grasshopper)
১. দেহবর্ণ	বাদামি।	সবুজ।
২. আকার	নিম্ফ আকারে ছোট।	পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং আকারে বড়।
৩. পাখা	থাকে না।	থাকে।
৪. জননাঙ্গ	অপরিণত থাকে।	পরিণত থাকে।
৫. মোল্টিং	ঘটে।	ঘটে না।

ঘাসফড়িং-এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Economic Importance of Grasshopper)

১. শস্যের ক্ষতিকর পোকা হিসেবে (As crop pests) : ঘাসফড়িং-এর নিম্ফ ও পূর্ণাঙ্গ উভয়েই বিভিন্ন ধরনের শস্য খেয়ে প্রভূত ক্ষতি করে। পঙ্গপাল এক জায়গা বা এক শস্যক্ষেত থেকে নতুন শস্যক্ষেতে এবং বাগানের সবজি ক্ষেত্রে গমন করে। গমনে একক বা দলবদ্ধভাবে অনেক দূর পর্যন্ত অতিক্রম করতে পারে। **মাইগ্রেটরি পঙ্গপাল** (*Locusta migratoria*) সুদূর অতীতকাল থেকেই এ ধরনের ক্ষতিকর হিসেবে পরিচিত। বাসস্থানে খাদ্যাভাব দেখা দিলে এরা লতা, গাছের ডাল, কাঠ এমনকি এদের ভিতরকার দুর্বল সদস্যকে পর্যন্ত খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। কোনো কোনো সময়ে ফড়িং-এর আক্রমণে শস্যের এত বেশি ক্ষতি হয় যে, তা কোনোভাবেই পূরণ করা সম্ভব হয় না।

২. খাদ্য হিসেবে (As food) : পরিবেশের খাদ্যতন্ত্র বা খাদ্যশৃঙ্খলে (food chain) অনেক উপকারী শিকারী প্রাণীর (predatory animals) প্রিয় খাদ্য হিসেবে ঘাসফড়িং-এর বিশেষ স্থান আছে। অনেক শিকারী পোকা, মাকড়সা, ব্যাঙ, সরীসৃপ, পাখি এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীর খাদ্য হিসেবে ঘাসফড়িং ব্যবহৃত হয়। মৃত বা জীবিত অবস্থায় মাছের টোপ (fish-bait) হিসেবেও ঘাসফড়িং-এর ব্যবহার রয়েছে।

পৃথিবীর কোনো কোনো দেশে এরা মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গ্রিক পঙ্গপাল (Greek Ground Locust) গুঁড়া করে অনেকে ময়দা বানিয়ে খায়। মেক্সিকো, জাপান এবং ফিলিপাইনে প্রিয় খাদ্য হিসেবে ঘাসফড়িং ব্যবহৃত হয়। আমেরিকা, ভারত ও অন্যান্য দেশের আদিবাসীরা সচরাচর সকল সময়েই খাবার হিসেবে এটি খেয়ে থাকে।

৩. পরিবেশ বাসযোগ্য রাখতে : গাছের পচন ও সেই মাটিকে উর্বর করে পুনর্জন্ম ঘটিয়ে, আগাছা খেয়ে বিভিন্ন উদ্ভিদের পুষ্টি রক্ষায়, মলত্যাগ করে এবং মৃত্যুর পর নিজেকে বিলীন করে দিয়ে মাটির উর্বরতা বাড়াতে ঘাসফড়িং অবদান রাখে।

৪. মাধ্যমিক পোষক হিসেবে (As intermediate host) : কিছু চ্যাপ্টাকৃমি ও গোলকৃমি ঘাসফড়িংকে আক্রমণ করে এদের দেহে জীবনচক্রের একটি পর্যায় অতিক্রম করে। পোকাগুলো ক্রিমির মাধ্যমিক পোষক হিসেবে কাজ করে। যদি কোনো পাখি বা সরীসৃপ কখনও খাদ্য হিসেবে ঘাসফড়িং খায় তখন এরা মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহে প্রবেশ করে। এভাবে মেরুদণ্ডী পোষক আক্রান্ত হয়।

www.Educationblog24.Com

লাল-সবুজে দাগানো

TEXT BOOK

প্রাণিবিজ্ঞান

উন্মেষ

মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল এডমিশন কেয়ার

www.Educationblog24.Com

২ প্রাণীর পরিচিতি
Animal Identity

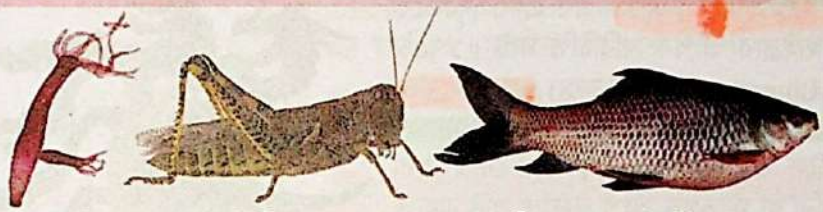

বৈচিত্র্যময় এ পৃথিবীতে নানা ধরনের প্রাণীর বাস। বৈচিত্র্য রয়েছে এদের বসতি, গঠন, চলন, খাদ্যগ্রহণ, আচার-ব্যবহার, প্রজনন ইত্যাদিতে। এসব প্রাণীর মধ্যে কোনটা সরল প্রকৃতির কেউ জটিল গঠনের অধিকারী। এ অধ্যায়ে আমরা হাইড্রা, ঘাসফড়িং এবং রুই মাছ সম্বন্ধে আলোচনা করব। প্রাণিজগত সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হলে প্রাণীর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। প্রাণিজগতের সকল সদস্যকে আলাদাভাবে অধ্যয়ন করা সম্ভব নয়। এজন্য বেশি সাদৃশ সম্পন্ন প্রাণিদের নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন পর্ব। এসব পর্বের একটি প্রাণী সম্পর্কে অধ্যয়ন করে সার্বিকভাবে সকল প্রাণীর পরিচিতি লাভ করা যায়।

প্রধান শব্দাবলি (Key words)

❐ দ্বিস্তরী প্রাণী	❐ সিলেন্টেরন
❐ মেসোগ্লিয়া	❐ নেমাটোসিস্ট
❐ মুকুলোদগম	❐ মিথোজীবিতা
❐ অ্যান্টেনা	❐ পুঞ্জাক্ষি
❐ ওমাটিডিয়া	❐ র‍্যাবডোম
❐ ওভিপজিটর	❐ ওভারিওল
❐ ডায়াপজ	❐ রূপান্তর
❐ স্ট্রীমলাইন্ড	❐ বৃদ্ধিরেখা
❐ ভেনাস হার্ট	❐ ফুলকা
❐ বায়ুথলি	❐ রেণুপোনা
❐ মৎস্য খনি	❐ মৎস্য অভয়াশ্রম

পিরিয়ড সংখ্যা-২৫ : এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে (শিখনফল)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. হাইড্রার গঠন (দেহপ্রাচীরের কোষের বৈশিষ্ট্যসহ) বর্ণনা করতে পারবে। ২. হাইড্রার খাদ্যগ্রহণ ও পরিপাক প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে। ৩. হাইড্রার চলন ও জনন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে। ৪. হাইড্রার মিথোজীবিতা বর্ণনা করতে পারবে। ৫. ব্যবহারিক-হাইড্রা পর্যবেক্ষণ করে চিত্র অঙ্কন করতে পারবে। ৬. ঘাসফড়িং-এর গঠন বর্ণনা করতে পারবে। ৭. ঘাসফড়িং-এর পরিপাকতন্ত্র ও পরিপাক পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে। ৮. ব্যবহারিক-ঘসিফড়িং/ আরশোলার মুখোপাঙ্গ শনাক্ত ও চিত্র অংকন করতে পারবে। ঘাসফড়িং/আরশোলা ব্যবচ্ছেদ করে এর পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ শনাক্ত করতে পারবে। ৯. ঘাসফড়িং-এর সংবহন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে। ১০. ঘাসফড়িং-এর শ্বসন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে। ১১. ঘাসফড়িং-এর রেচন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে। ১২. ঘাসফড়িং-এর পুঞ্জাক্ষির গঠন ও দর্শন কৌশল পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে। ১৩. ঘাসফড়িং-এর প্রজনন প্রক্রিয়া ও রূপান্তর পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে। ১৪. রুই মাছের গঠন বর্ণনা করতে পারবে। ১৫. রুই মাছের রক্ত সংবহনতন্ত্রের বর্ণনা করতে পারবে। ১৬. ব্যবহারিক- রুই/কাতলা/মৃগেল মাছ ব্যবচ্ছেদ করে রক্ত সংবহনতন্ত্র শনাক্ত এবং চিত্র অংকন করতে পারবে। ১৭. রুই মাছের শ্বসন ও বায়ুথলির গঠন বর্ণনা করতে পারবে। ১৮. ব্যবহারিক : রুই/কাতলা/মৃগেল মাছের শ্বসনতন্ত্র ব্যবচ্ছেদ করে ফুলকা ও পটকা (বায়ুথলি) শনাক্ত করতে পারবে। ১৯. প্রকৃতিতে রুই মাছের প্রজনন ও নিষেক বর্ণনা করতে পারবে। ২০. রুই জাতীয় মাছের সংরক্ষণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।	● হাইড্রা (*Hydra*) ○ গঠন (দেহপ্রাচীরের কোষের বৈশিষ্ট্যসহ) ○ খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাক প্রক্রিয়া ○ চলন ও জনন ○ মিথোজীবিতা ● ব্যবহারিক ○ হাইড্রার স্থায়ী স্লাইড/মডেল পর্যবেক্ষণ ● ঘাসফড়িং (*Poekilocerus pictus*) ○ গঠন (বাহ্যিক) ○ পরিপাকতন্ত্র-মুখ উপাঙ্গ, পরিপাক গ্রন্থি ● ব্যবহারিক ○ ঘাসফড়িং/আরশোলার মুখ উপাঙ্গ ○ ঘাসফড়িং/আরশোলার পরিপাকতন্ত্র ও গ্রন্থি পর্যবেক্ষণ ● ঘাসফড়িং ○ সংবহন পদ্ধতি ○ শ্বসন পদ্ধতি ○ রেচন পদ্ধতি ○ প্রজনন প্রক্রিয়া ও রূপান্তর ● ঘাসফড়িং এর পুঞ্জাক্ষি ○ গঠন ○ দর্শন কৌশল ● রুই মাছ (*Labeo*) ○ দেহ গঠন ○ রক্ত সংবহন ○ শ্বসন ● ব্যবহারিক ○ রুই/কাতলা/মৃগেল মাছের শ্বসনতন্ত্র, ফুলকা ও বায়ুথলি পর্যবেক্ষণ ○ জীবনচক্র ○ সংরক্ষণ (প্রাকৃতিক)

www.Educationblog24.Com

২.১ প্রতীক প্রাণী : *Hydra*

Hydra হচ্ছে নিডারিয়া (Cnidaria) পর্বভুক্ত সরল গড়নের জলজ প্রাণী। প্রাণিজগতের দুটি পর্ব দ্বিস্তরী বা ডিপ্লোব্লাস্টিক প্রাণী (diploblastic animal) নামে পরিচিত। একটি হচ্ছে নিডারিয়া, অন্যটি টিনোফোরা (Ctenophora)। সুইজারল্যান্ডের প্রকৃতিবিজ্ঞানি আব্রাহাম ট্রেম্বলে (Abraham Trembley, 1710-1784)। ১৭৪৪ সালে হাইড্রার প্রচন্ড পুনরুৎপত্তি ক্ষমতা প্রকাশের মাধ্যমে এর প্রাণিপ্রকৃতিকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যার ফলে হাইড্রার ব্যাপক পরিচিতি ঘটে। ১৭৫৮ সালে ক্যারোলাস লিনিয়াস (Carolus Linnaeus, 1707-1778) এর নাম দেন *Hydra*। গ্রিক রূপকথার নয় মাথাওয়ালা ড্রাগনের নামানুসারে *Hydra*-র নামকরণ করা হয়। ঐ ড্রাগনটির একটি মাথা কাটলে তার বদলে দুই বা তার বেশি মাথা গজাতো। *Hydra* ঐ ড্রাগনের মতো হারানো বা ক্ষতিগ্রস্ত অংশ পুনরায় সৃষ্টি করতে পারে, তাই অনেক সময় বহু মাথাওয়ালা সদস্য আবির্ভূত হয়। মহাবীর হারকিউলিস (Hercules) অবশেষে এ দানবকে বধ করেন।

চিত্র ২.১.১ : হাইড্রা ড্রাগন

বাংলাদেশে *Hydra*-র বিভিন্ন প্রজাতি

বর্তমানে পৃথিবীতে *Hydra*-র প্রজাতি-সংখ্যা ৪০টির মতো। গায়ের রং, কর্ষিকার সংখ্যা ও দৈর্ঘ্য এবং জননাঙ্গের অবস্থান ও আকৃতির ভিত্তিতে হাইড্রার শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। ২০০৮ সালে প্রকাশিত বাংলাদেশের উদ্ভিদ ও প্রাণী জ্ঞানকোষের চতুর্দশ খণ্ডের (Bangladesh Encyclopedia of Flora and Fauna, vol. 14) তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে ৩ প্রজাতির হাইড্রার উল্লেখ পাওয়া যায়: ১. বাদামী বর্ণের *Hydra oligactis* (=*H. fusca*), ২. সবুজ বর্ণের *Hydra viridissima* (=*H. viridis, Chlorohyda viridissima*) এবং ৩. বর্ণহীন বা হলুদ-বাদামী *Hydra vulgaris*।

চিত্র ২.১.২ : *Hydra vulgaris* (প্রাকৃতিক পরিবেশে)

বিভিন্ন প্রজাতির *Hydra*-র মধ্যে বাংলাদেশে *Hydra vulgaris* সুলভ বলে এখানে এ প্রজাতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

বাসস্থান ও স্বভাব : *Hydra* একটি একক মুক্তজীবী প্রাণী। মিঠাপানিতে (খাল, বিল, পুকুর, হ্রদ, ঝর্ণা) নিমজ্জিত কঠিন বস্তু এবং জলজ উদ্ভিদের পাতার নিম্নপৃষ্ঠে সংলগ্ন থেকে নিম্নমুখী হয়ে ঝুলে থাকে। স্থির, শীতল ও পরিষ্কার পানিতে এদের বেশি পাওয়া যায়। ঘোলা, উষ্ণ ও চলমান পানিতে এদের খুব কম পাওয়া যায়। ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেহ ও কর্ষিকাকে সর্বোচ্চ প্রসারিত করে পানিতে দুলতে থাকে। কোন কিছুর সংস্পর্শে দেহকে সঙ্কুচিত করে ফেলে। এরা মাংসাশী (অর্থাৎ অন্য কোনো প্রাণী খেয়ে জীবন ধারণ করে)। কর্ষিকার সাহায্যে খাদ্য গ্রহণ করে। চলাফেরা করে দেহের সংকোচন-প্রসারণ ও কর্ষিকার সাহায্যে। দেহপ্রাচীরের মাধ্যমে ব্যাপন (diffusion) প্রক্রিয়ায় শ্বসন ও রেচন সম্পন্ন করে। মুকুলোদগম ও দ্বিবিভাজনের মাধ্যমে অযৌন জনন এবং জননকোষ সৃষ্টির মাধ্যমে যৌন জনন সম্পন্ন করে। ***Hydra*-র পুনরুৎপত্তি** (regeneration) ক্ষমতা প্রচন্ড।

শ্রেণিতাত্ত্বিক অবস্থান (Systematic Position)

Kingdom : Animalia (প্রাণী)
Phylum : Cnidaria (নিডোসাইট ও সিলেন্টেরন উপস্থিত)
Class : Hydrozoa (অবিভক্ত সিলেন্টেরন)
Order : Hydroida (পলিপ দশা প্রধান)
Family : Hydridae (এককভাবে বসবাস করে)
Genus : *Hydra* (পুনরুৎপত্তি ক্ষমতাসম্পন্ন)
Species : *Hydra vulgaris*

Hydra-র বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

আকার-আকৃতি : *Hydra*-র দেহ নরম ও অনেকটা নলাকার। দেহের একপ্রান্ত খোলা (ওরাল বা মৌখিক প্রান্ত) এবং অপরপ্রান্ত বন্ধ (অ্যাবওরাল বা বিমৌখিক প্রান্ত)। খোলা প্রান্তে মুখছিদ্র অবস্থিত, আর বন্ধ প্রান্তটি কোনো বস্তুর সাথে যুক্ত থাকে। দেহ অরীয় প্রতিসম (radial symmetry) এবং ১০ থেকে ৩০ মিলিমিটার পর্যন্ত লম্বা ও প্রায় ১ মিলিমিটার চওড়া।

www.Educationblog24.Com

বর্ণ : প্রজাতিভেদে *Hydra*-র বর্ণ বিভিন্ন হয়ে থাকে। *Hydra vulgaris* প্রায় বর্ণহীন (হালকা হলুদ–বাদামী), তবে গৃহীত খাদ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী বর্ণ বৈষম্য দেখা যায়।

বহির্গঠন : একটি পরিণত *Hydra*-র দেহকে প্রধানত তিনটি অংশে ভাগ করা যায় : **১. হাইপোস্টোম, ২. দেহকান্ড ও ৩. পদতল বা পাদ-চাকতি**। নিচে এসব অংশের বর্ণনা দেয়া হলো।

১. হাইপোস্টোম (Hypostome) : এটি দেহের মুক্ত প্রান্তে অবস্থিত, মোচাকৃতি, ছোট ও সংকোচন-প্রসারণশীল অংশ। এর চূড়ায় বৃত্তাকার **মুখছিদ্র** অবস্থিত। মুখছিদ্রপথে খাদ্য গৃহীত ও অপাচ্য অংশ বহিষ্কৃত হয়।

২. দেহকান্ড (Trunk) : হাইপোস্টোমের নিচ থেকে পাদ-চাকতির উপর পর্যন্ত সংকোচন- প্রসারণশীল অংশটি দেহকাণ্ড। এতে নিচে বর্ণিত অংশগুলো পাওয়া যায়।

- **কর্ষিকা** (Tentacle) : হাইপোস্টোমের গোড়ার চতুর্দিক ঘিরে ৬-১০টি সরু, সংকোচনশীল, দেহ অপেক্ষা লম্বা ও ফাঁপা সুতার মতো কর্ষিকা অবস্থিত। কর্ষিকার বহিঃপ্রাচীরে অসংখ্য ছোট টিউমারের মতো **নেমাটোসিস্ট ব্যাটারী** (nematocyst battery) থাকে। প্রত্যেক ব্যাটারীতে থাকে কয়েকটি করে বিভিন্ন ধরনের নেমাটোসিস্ট। কর্ষিকা ও নেমাটোসিস্ট পারস্পরিক সহযোগিতায় আহার সংগ্রহ, চলন এবং আত্মরক্ষায় অংশ নেয়।
- **মুকুল** (Bud) : গ্রীষ্মকালে যখন পর্যাপ্ত আহার পাওয়া যায় তখন মুকুল সৃষ্টিরও অনুকূল সময়। এমন পরিবেশে দেহের প্রায় মধ্যবর্তী অঞ্চল থেকে এক বা একাধিক মুকুল সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক মুকুল একেকটি নতুন সদস্যের জন্ম দেয়। মুকুলোদগম *Hydra*-র অন্যতম অযৌন জনন প্রক্রিয়া।
- **জননাঙ্গ** (Gonad) : হেমন্ত ও শীতকালে দেহকাণ্ডের উপরের অর্ধাংশে এক বা একাধিক কোণাকার **শুক্রাশয়** (testes) এবং নিচের অর্ধাংশে এক বা একাধিক গোলাকার **ডিম্বাশয়** (ovaries) নামক অস্থায়ী জননাঙ্গ দেখা যায়। জননাঙ্গ যৌন জননে অংশগ্রহণ করে।

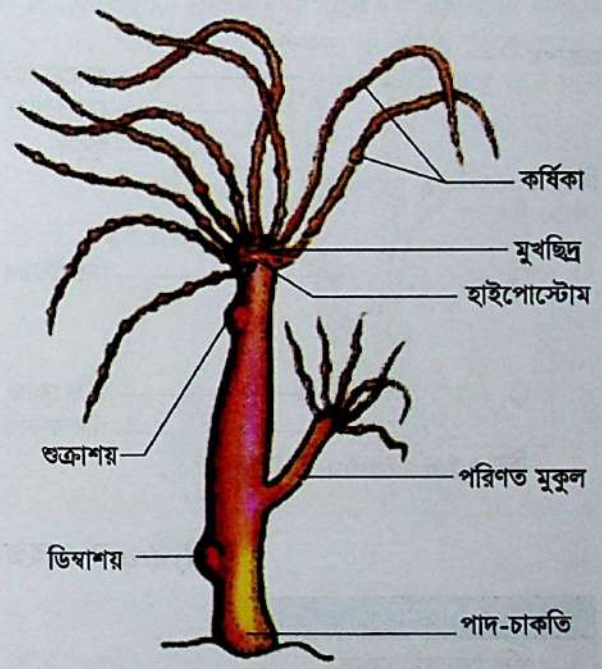

চিত্র ২.১.৩ : *Hydra*-র বহির্গঠন

৩. পাদ-চাকতি (Pedal disc) : দেহকাণ্ডের নিম্নপ্রান্তে অবস্থিত গোল ও চাপা অংশটি পাদ-চাকতি বা পদতল। পাদ-চাকতি থেকে ক্ষরিত আঠাল রসের সাহায্যে প্রাণী কোনো তলের সাথে লেগে থাকে। এ চাকতি **বুদবুদ** (bubble) সৃষ্টি করে প্রাণীকে ভাসিয়ে রাখতেও সাহায্য করে। চাকতির ক্ষণপদ গঠনকারী কোষের সাহায্যে গ্লাইডিং চলন সম্পন্ন হয়।

দ্বিস্তরী বা দ্বিভ্রূণস্তরী প্রাণী (Diploblastic animal)

ভ্রূণাবস্থায় যেসব প্রাণীর দেহপ্রাচীরের কোষগুলো কেবল **এক্টোডার্ম** ও **এন্ডোডার্ম** নামক দুটি নির্দিষ্ট স্তরে বিন্যস্ত থাকে, সেগুলোকে **দ্বিস্তরী** বা **দ্বিভ্রূণস্তরী প্রাণী** বলে। পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে স্তরদুটি যথাক্রমে **এপিডার্মিস** ও **গ্যাস্ট্রোডার্মিস**-এ পরিণত হয়। এই দুই স্তরের মাঝখানে **মেসোগ্লিয়া** নামক **অকোষীয়** ও **জেলির মতো** (কখনও কিছু কোষ ও তন্তুযুক্ত) একটি স্তর থাকে। *Hydra* দ্বিস্তরী বা ডিপ্লোব্লাস্টিক প্রাণীর এক আদর্শ উদাহরণ।

www.Educationblog24.Com

Hydra -র অন্তর্গঠন (Internal Structure of Hydra)

Hydra **দ্বিভ্রূণস্তরী** (diploblastic) প্রাণী অর্থাৎ এর ভ্রূণাবস্থার এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্ম কোষীয় স্তরদুটি পরিণত দেহে এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিস নামক দুটি কোষস্তরে পরিবর্তিত হয়ে বিন্যস্ত থাকে। এ দুটি কোষস্তরের মাঝে **মেসোগ্লিয়া** (mesoglea) নামে একটি অকোষীয় জেলির মতো স্তর থাকে। *Hydra*-র দেহ মূলত দেহপ্রাচীর ও **কেন্দ্রীয় পরিপাকসংবহন গহ্বর** (gastrovascular cavity) বা **সিলেন্টেরন** (coelenteron) নিয়ে গঠিত।

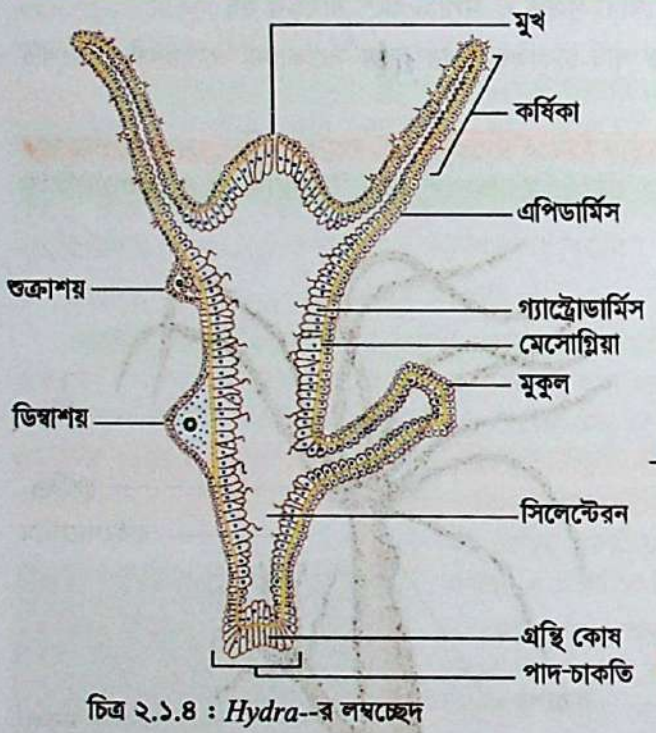

চিত্র ২.১.৪ : *Hydra*--র লম্বচ্ছেদ

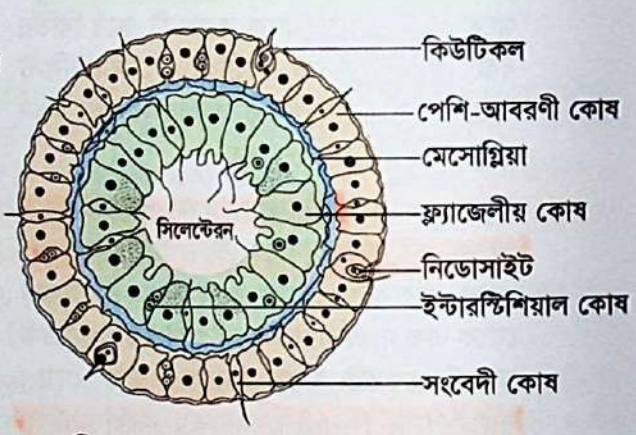

চিত্র ২.১.৫ : *Hydra*--র প্রস্থচ্ছেদ

Hydra-র দেহপ্রাচীরের কোষসমূহ

কোষসমূহ
১. পেশি-আবরণী কোষ ২. ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ ৩. সংবেদী কোষ ৪. স্নায়ু কোষ ৫. গ্রন্থি কোষ ৬. জনন কোষ এবং ৭. নিডোসাইট
কোন কোষস্তর নয়, একে সংযোগকারী স্তর বলা হয়।
১. পুষ্টি কোষ ২. গ্রন্থি কোষ ৩. ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ, ৪. সংবেদী কোষ এবং ৫. স্নায়ু কোষ।

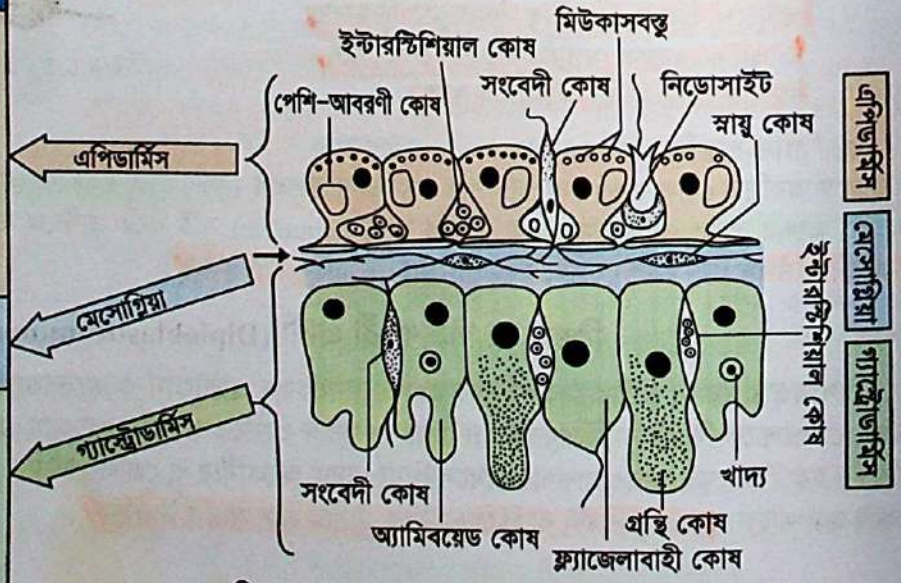

চিত্র ২.১.৬ : *Hydra*--র দেহপ্রাচীরের অংশবিশেষ বিবর্ধিত

www.Educationblog24.Com

এপিডার্মিস (বা বহিঃত্বক)–এর কোষসমূহ

কাজের ভিন্নতা অনুযায়ী *Hydra*-র এপিডার্মিসের কোষের গঠনে বৈচিত্র্য দেখা যায়। একটি পাতলা ও নমনীয় কিউটিকল (cuticle)-এ আবৃত এপিডার্মিস *Hydra*-র বহিরাবরণ গঠন করে। *Hydra*-র এপিডার্মিস নিচে বর্ণিত সাত ধরনের কোষ নিয়ে গঠিত।

১. পেশি-আবরণী কোষ (Musculo-Epithelial cell) : এপিডার্মিসের সম্পূর্ণ অংশ জুড়ে এ কোষ অবস্থান করে। বহির্মুখী চওড়া ও অন্তর্মুখী সরু প্রান্তবিশিষ্ট এ কোষগুলো দেখতে কোণাকার। এগুলোর চওড়া প্রান্ত গহ্বরযুক্ত সাইটোপ্লাজোমে পূর্ণ, মিউকাস-বস্তুযুক্ত এবং পরস্পর মিলিত হয়ে একটি অভিন্ন আবরণ গঠন করে। ভিতরের সরু প্রান্তের শেষে মায়োনিম (এক ধরনের নমনীয় ও সংকোচন-প্রসারণশীল তন্তু) নির্মিত দুটি পেশি-প্রবর্ধন দেহ অক্ষের সমান্তরালে অবস্থান করে। কর্ষিকায় কোষগুলো বেশ বড় ও চাপা এবং কয়েকটি করে নিডোব্লাস্ট (পরিস্ফুটনরত নিডোসাইট) ধারণ করে।

কাজ : আবরণী কোষের মতো দেহাবরণ সৃষ্টি করে দেহকে রক্ষা করে। প্রবর্ধনগুলো সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে দেহের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে পেশির মতো কাজ করে। মিউকাস দানা কিউটিকল ক্ষরণ করে ও দেহ পিচ্ছিল রাখে। কোষগুলো একাধিক নেমাটোসিস্ট বহন করে। একদিকে দেহাবরণ হিসেবে, অন্যদিকে পেশির মতো কাজ করে বলে এসব কোষকে ''পেশি-আবরণী কোষ'' বলা হয়ে থাকে।

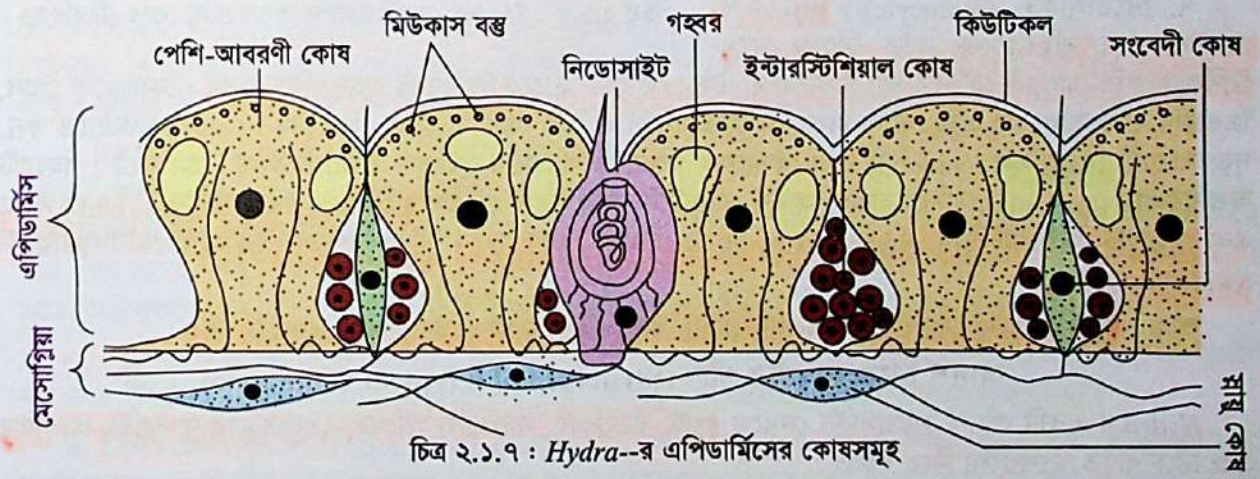

চিত্র ২.১.৭ : *Hydra*--র এপিডার্মিসের কোষসমূহ

২. ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ (Interstitial cell) : পেশি-আবরণী কোষের অন্তর্মুখী সরু প্রান্তের ফাঁকে ফাঁকে, গুচ্ছাকারে, মেসোগ্লিয়া ঘেঁষে এসব কোষ অবস্থান করে। এগুলো গোল বা তিনকোণা এবং সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস, মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা, রাইবোজোম ও কিছু মাইটোকন্ড্রিয়া যুক্ত।

কাজ : এসব কোষ প্রয়োজনে অন্য যে কোনো ধরনের বহিঃত্বকীয় কোষে পরিণত হয়; পুনরুৎপত্তি ও মুকুল সৃষ্টিতে অংশ নেয় এবং কিছুদিন পরপর অন্যান্য কোষে পরিণত হয়ে দেহের পুরনো কোষের স্থান পূরণ করে।

৩. সংবেদী কোষ (Sensory cell) : এগুলো পেশি-আবরণী কোষের ফাঁকে ফাঁকে, সমকোণে ও বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো থাকে, তবে কর্ষিকা, হাইপোস্টোম ও পদতলের চারদিকে বেশি দেখা যায়। প্রতিটি কোষ লম্বা ও সরু। এর মুক্ত প্রান্ত থেকে সূক্ষ্ম সংবেদী রোম (sensory hair) বেরোয় এবং অপর প্রান্ত থেকে গুটিকাময় বা নোডিওলযুক্ত (nodulated) সূক্ষ্ম তন্তু নির্গত হয়ে স্নায়ুতন্তুর সাথে যুক্ত হয়।

কাজ : পরিবেশ থেকে বিভিন্ন উদ্দীপনা (যেমন আলো, তাপ প্রভৃতি) গ্রহণ করে স্নায়ুকোষে সরবরাহ করে।

৪. স্নায়ু কোষ (Nerve cell) : এসব কোষ মেসোগ্লিয়া ঘেঁষে অবস্থিত, অনিয়ত আকারবিশিষ্ট এবং একটি ক্ষুদ্র কোষদেহ ও দুই বা ততোধিক লোডিওলযুক্ত সূক্ষ্ম শাখান্বিত স্নায়ুরোম নিয়ে গঠিত। তন্তুগুলো পরস্পর মিলে স্নায়ু-জালিকা গঠন করে।

কাজ : সংবেদী কোষে সংগৃহীত উদ্দীপনা দেহের বিভিন্ন অংশে সরবরাহ করে।

www.Educationblog24.Com

৫. গ্রন্থি কোষ (Gland cell) : এগুলো ক্ষরণকারী দানাবিশিষ্ট এক ধরনের পরিবর্তিত লম্বাকার এপিডার্মাল কোষ মুখছিদ্রের চারদিকে ও পাদ-চাকতিতে এদের প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

কাজ : মিউকাস ক্ষরণ করে দেহকে কোনো বস্তুর সঙ্গে লেগে থাকতে সাহায্য করে; বুদবুদ সৃষ্টি করে ভাসতে সাহায্য করে; ক্ষণপদ সৃষ্টির মাধ্যমে চলনে অংশগ্রহণ করে এবং মুখছিদ্রের গ্রন্থিকোষের ক্ষরণ খাদ্য গলাধঃকরণে সাহায্য করে।

৬. জনন কোষ (Germ cell) : এসব কোষ জননাঙ্গে অবস্থান করে। জননকোষ দুধরনের: **শুক্রাণু ও ডিম্বাণু**। পরিণত শুক্রাণু অতি ক্ষুদ্র এবং নিউক্লিয়াসযুক্ত একটি স্ফীত মস্তক, সেন্ট্রিওলযুক্ত একটি সংকীর্ণ মধ্যখন্ড ও একটি লম্বা বিচলনক্ষম লেজ নিয়ে গঠিত। পরিণত ডিম্বাণুটি বড় ও গোল; এর সাথে তিনটি পোলার বডি (polar bodies) যুক্ত থাকে।

কাজ : যৌন জননে অংশগ্রহণ করা।

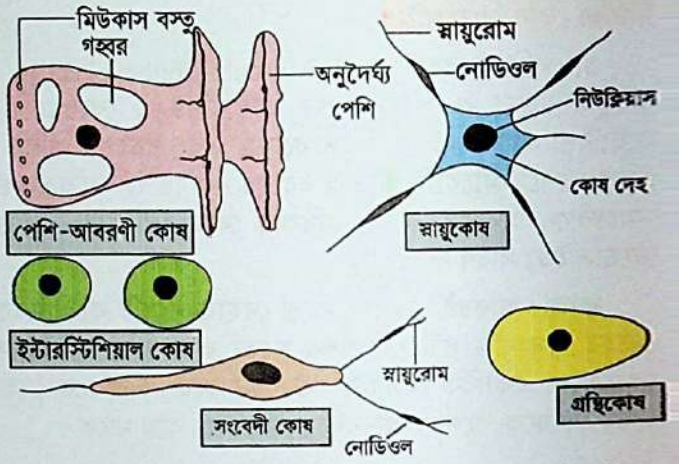

চিত্র ২.১.৮ : *Hydra*--র বহিঃত্বকের কতকগুলো কোষ (বিবর্ধিত)

৭. নিডোসাইট (Cnidocyte) : *Hydra*-র পদতল ছাড়া বহিঃত্বকের সর্বত্র বিশেষ করে কর্ষিকার পেশি-আবরণী কোষের ফাঁকে ফাঁকে বা ঐসব কোষের ভিতরে নিডোসাইট অনুপ্রবিষ্ট থাকে। কোষগুলো গোল, ডিম্বাকার বা পেয়ালাকার এবং নিচের দিকে নিউক্লিয়াসবাহী ও দ্বৈত আবরণবেষ্টিত বড় কোষ। কোষের মুক্তপ্রান্তে ক্ষুদ্র, দৃঢ়, সংবেদী **নিডোসিল** (cnidocil) এবং অভ্যন্তরে গহ্বর ও প্যাঁচানো সুতাযুক্ত **নেমাটোসিস্ট** বহন করে। গহ্বরটি **অপারকুলাম** (operculum) দিয়ে ঢাকা। আদর্শ নেমাটোসিস্টের সুতার গোড়ায় ৩টি বড় কাঁটার মতো **বার্ব** (barb) থাকে এবং গহ্বরটি **হিপনোটক্সিন** (hypnotoxin) নামক বিষাক্ত রসে পূর্ণ। পরিস্ফুটনরত নিডোসাইটকে **নিডোব্লাস্ট** (cnidoblast) বলে।

কাজ : নিডোসাইটের নেমাটোসিস্ট অঙ্গাণু প্রাণীর খাদ্য গ্রহণ, চলন ও আত্মরক্ষায় ব্যবহৃত হয়।

আদর্শ নিডোসাইটের গঠন (Structure of a typical Cnidocyte)

Hydra-র একটি আদর্শ নিডোসাইট দেখতে গোল, ডিম্বাকার, নাশপাতি আকার, পেয়ালাকার বা লাটিম আকৃতির এবং নিচে বর্ণিত অংশগুলো নিয়ে গঠিত।

১. আবরণ (Membrane) : প্রতিটি কোষ দ্বিস্তরী আবরণে আবৃত। স্তর দুটির মাঝখানে দানাদার সাইটোপ্লাজম এবং কোষের গোড়ার দিকে একটি নিউক্লিয়াস থাকে।

২. নেমাটোসিস্ট (Nematocyst) : নিডোসাইটের অভ্যন্তরে অবস্থিত, কাইটিনের মতো পদার্থে নির্মিত আবরণে আবৃত ও সূত্রকযুক্ত একটি ক্যাপসুলের নাম নেমাটোসিস্ট। আদর্শ নিডোসাইটে ক্যাপসুলটি প্রোটিন ও ফেনল-এর সমন্বয়ে গঠিত বিষাক্ত তরল **হিপনোটক্সিন** (hypnotoxin)-এ পূর্ণ থাকে। লম্বা, সরু, ফাঁপা সূত্রকটি যা প্রকৃতপক্ষে ক্যাপসুলেরই অগ্রপ্রান্তের অভিন্ন প্রসারিত অংশ সেটি অবস্থান করে। সূত্রকের চওড়া গোড়াটিকে **বাট** (butt) বা **শ্যাফট** (shaft) বলে। এতে তিনটি বড় তীক্ষ্ণ কাঁটার মতো **বার্ব** (barb) এবং সর্পিল সারিতে বিন্যস্ত ক্ষুদ্রতর কাঁটার মতো অসংখ্য **বার্বিওল** (barbules) দেখা যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় সূত্রকটি বাট ও কাঁটাসহ থলির ভিতর ঢুকানো থাকে।

চিত্র ২.১.৯ : নিডোসাইট: বায়ে-স্বাভাবিক অবস্থায় এবং ডানে-সূত্রকটি উন্মুক্ত

www.Educationblog24.Com

৩. **অপারকুলাম** (Operculum) : স্বাভাবিক অবস্থায় নেমাটোসিস্টের সূত্রক ও ক্যাপসুল যে ঢাকনা দিয়ে আবৃত থাকে তার নাম অপারকুলাম। উন্মুক্ত অবস্থায় এটি পাশে সরে যায়। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি রূপান্তরিত **সিলিয়াম** (cilium)।

৪. **নিডোসিল** (Cnidocil) : নিডোসাইট কোষের মুক্ত প্রান্তের শক্ত, দৃঢ়, সংবেদনশীল কাঁটাটি নিডোসিল। নিডোসিল ট্রিগারের মতো কাজ করে ফলে অপারকুলাম সরে যায় এবং প্যাঁচানো সূত্রকটি বাইরে বেরিয়ে আসে।

৫. **পেশিতন্তু ও ল্যাসো** (Muscle fibre & Lasso) : কোষের সাইটোপ্লাজম ও নেমাটোসিস্টের প্রাচীরে সংকোচনশীল কিছু পেশিতন্তু থাকে। এছাড়াও কোষের নিচের প্রান্তে ল্যাসো নামের একটি প্যাঁচানো সূত্রক দেখা যায়।

নেমাটোসিস্টের প্রকারভেদ (Types of nematocysts)

নিক্ষিপ্ত সূত্রকের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানী **ভার্ণার** (Werner) ১৯৬৫ সালে নিডারিয়া জাতীয় প্রাণিদের দেহ থেকে ২৩ ধরনের নেমাটোসিস্ট শনাক্ত করেছেন। এর মধ্যে নিম্নোক্ত চার ধরনের নেমাটোসিস্ট *Hydra*-য় পাওয়া যায়।

১. **স্টিনোটিল বা পেনিট্র্যান্ট** (Stenotile or Penetrant) : *Hydra*-র চার ধরনের নেমাটোসিস্টের মধ্যে বার্বিওল এগুলোই বৃহত্তম। এদের সূত্রক লম্বা, ফাঁপা, শীর্ষ উন্মুক্ত, বাট প্রশস্ত এবং তিনটি বড় তীক্ষ্ণ বার্ব ও তিন সারি সর্পিলাকারে সজ্জিত অতি ক্ষুদ্র বার্বিউলযুক্ত। এর ভিতরে **হিপনোটক্সিন** (hypnotoxin) নামক বিষাক্ত তরল থাকে। শিকারের দেহে সূত্রক বিদ্ধ করে বিষাক্ত হিপনোটক্সিন প্রবেশ করিয়ে তাকে অজ্ঞান ও অবশ করে ফেলে।

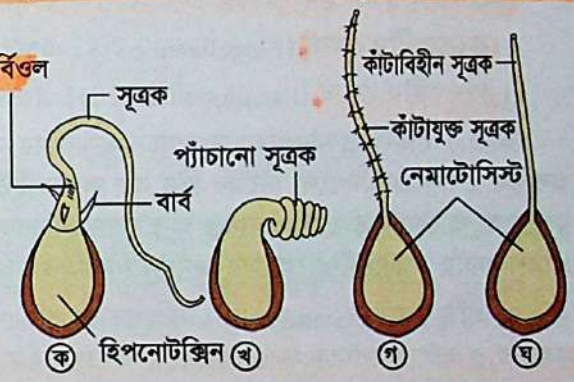

চিত্র ২.১.১০ : বিভিন্ন ধরনের নেমাটোসিস্ট; ক. স্টিনোটিল, খ. ভলভেন্ট, গ. স্ট্রেপটোলিন গ্লুটিন্যান্ট ও ঘ. স্টেরিওলিন গ্লুটিন্যান্ট

২. **ভলভেন্ট** (Volvent) : এগুলো অপেক্ষাকৃত ছোট। সূত্রকটি খাটো, মোটা, স্থিতিস্থাপক, কাঁটাবিহীন এবং বন্ধ শীর্ষযুক্ত নেমাটোসিস্ট। ক্যাপসুলের ভিতর সূত্রকের একটি মাত্র প্যাঁচ থাকে, কিন্তু নিক্ষিপ্ত হওয়ার সাথে সাথে কর্ক-স্ক্রুর মতো অনেকগুলো প্যাঁচের সৃষ্টি করে। এটি শিকার কিংবা কোন বস্তুকে আঁকড়ে ধরে রাখতে সাহায্য করে।

৩. **স্ট্রেপটোলিন গ্লুটিন্যান্ট** (Streptoline glutinant) : এর সূত্রক লম্বা, সর্পিলাকারে সজ্জিত কাঁটাযুক্ত, বাট সুগঠিত নয় এবং শীর্ষদেশ উন্মুক্ত। এগুলো আঠালো রস ক্ষরণ করে চলনে এবং শিকার আটকাতে সাহায্য করে।

৪. **স্টেরিওলিন গ্লুটিন্যান্ট** (Stereoline glutinant) : এগুলো ক্ষুদ্রতম নেমাটোসিস্ট; সূত্রক লম্বা, কাঁটাবিহীন, বাট সুগঠিত নয় এবং শীর্ষদেশ উন্মুক্ত। এগুলোও এক ধরনের আঠালো রস ক্ষরণ করে চলন ও শিকার আটকে রাখতে সাহায্য করে।

নেমাটোসিস্টের সূত্রক নিক্ষেপের কৌশল (Mechanism of discharge of Nematocyst-thread)

নেমাটোসিস্টের সূত্রক নিক্ষেপ যুগপৎভাবে একটি রাসায়নিক ও যান্ত্রিক প্রক্রিয়া। শিকারের বা শত্রুর সন্ধান অথবা অন্য যেকোনো কারণে নিডোসাইট উদ্দীপ্ত হলে এ প্রক্রিয়াটি শুরু হয়। কোন শিকার *Hydra*-র কর্ষিকার নিকটবর্তী হলে শিকার-দেহের রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে নেমাটোসিস্ট প্রাচীরের পানিভেদ্য ক্ষমতা বেড়ে যায়। এতে থলির ভিতরে দ্রুত পানি প্রবেশ করায় ভিতরের অভিস্রবণিক চাপও বেড়ে যায়। এসময় শিকার নিডোসাইটের নিডোসিল স্পর্শ করামাত্র এর অপারকুলাম খুলে যায় এবং তখন দ্রুত পানি ভিতরে প্রবেশ করায় হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপ (hydrostatic pressure) বেড়ে গেলে নেমাটোসিস্ট-সূত্রক ক্ষিপ্র গতিতে বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়।

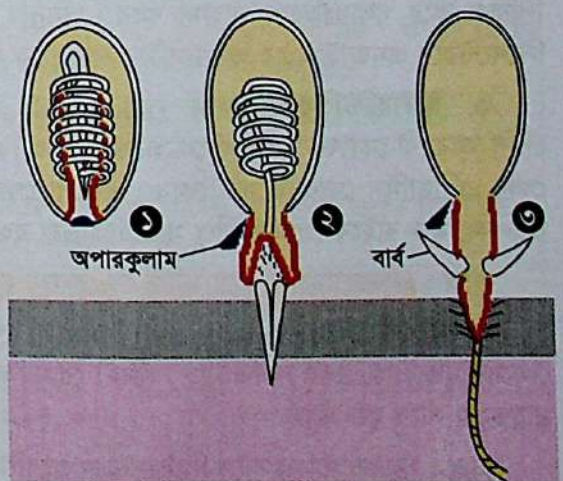

চিত্র ২.১.১১ : নেমাটোসিস্টের সূত্রক নিক্ষেপ প্রক্রিয়া

www.Educationblog24.Com

নেমাটোসিস্টের সূত্রক একবার নিক্ষিপ্ত হলে সেটাকে আর নিডোসাইটে ফিরিয়ে আনা যায় না বা আবার ব্যবহার করা যায় না কিংবা ঐ একই নিডোসাইট আর কোনো নেমাটোসিস্ট সৃষ্টিও করতে পারে না। এ ধরনের নিডোসাইট ধীরে ধীরে গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার গহ্বরে প্রবেশ করে এবং অন্যান্য খাদ্যবস্তুর সাথে হজম হয়ে যায়। ৪৮ ঘন্টার মধ্যে নতুন নিডোসাইট সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যবহৃত নিডোসাইট প্রতিস্থাপিত হয়।

গ্যাস্ট্রোডার্মিস (বা অন্তঃত্বক)-এর কোষসমূহ

এপিডার্মিস অপেক্ষা গ্যাস্ট্রোডার্মিস-এর গঠন অনেকটা সরল এবং নিচের পাঁচ ধরনের কোষ নিয়ে গঠিত।

১. **পুষ্টি কোষ বা পেশি–আবরণী কোষ** (Nutritive cell or Musculo-Epithelial Cells) : গ্যাস্ট্রোডার্মিসের বেশির ভাগ অংশ জুড়ে অবস্থিত স্তম্ভাকার এবং বড় নিউক্লিয়াস ও গহ্বরযুক্ত কোষ। কোষের সংযুক্ত প্রান্ত থেকে **মায়োফাইব্রিল** নামক সূক্ষ্ম, সংকোচনশীল তন্তুবিশিষ্ট পেশি প্রবর্ধন সৃষ্টি হয়ে মেসোগ্লিয়ার সমকোণে অবস্থান করে।

ভিতরের মুক্ত প্রান্তের গঠনের উপর ভিত্তি করে পুষ্টি কোষগুলো দুরকম, যথা–

i. **ফ্ল্যাজেলীয় কোষ** (Flagellated cell) : এগুলোর মুক্ত প্রান্তে ১–৪টি সুতার মতো ফ্ল্যাজেলা সংযুক্ত থাকে।

ii. **ক্ষণপদীয় কোষ** (Pseudopodial cell) : এগুলোর মুক্ত প্রান্ত ক্ষণপদযুক্ত।

কাজ : পেশি প্রবর্ধনগুলো সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে দেহকে সরু ও মোটা করে। মুখ ও কর্ষিকার গোড়ায় অবস্থিত পেশি-প্রবর্ধনগুলো নিজের ছিদ্র বন্ধ করতে **স্ফিংক্টার** (sphincter)-এর মতো কাজ করে। ফ্ল্যাজেলীয় কোষের ফ্ল্যাজেলা আন্দোলিত হয়ে খাদ্যবস্তু ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করে। প্রয়োজনে এ কোষ আন্দোলিত হয়ে মুখছিদ্রপথে পানি প্রবেশ করায়। ক্ষণপদীয় কোষের ক্ষণপদ খাদ্যকণা গলাধঃকরণ করে অন্তঃস্থ খাদ্যগহ্বরে পরিপাক করে।

২. **গ্রন্থি কোষ** (Gland cell) : বিক্ষিপ্তভাবে পুষ্টি কোষের ফাঁকে ফাঁকে এসব কোষ অবস্থান করে। এগুলোর সংখ্যা মূলদেহ ও হাইপোস্টোমে সবচেয়ে বেশি, পদতলে কম এবং কর্ষিকায় অনুপস্থিত।

গ্রন্থিকোষ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও পেশি-প্রবর্ধনবিহীন। এগুলো দুরকম হয়ে থাকে–

i. **মিউকাস ক্ষরণকারী** (Mucous secreting) : এগুলো প্রধানত হাইপোস্টোম অঞ্চলে অবস্থিত এবং পিচ্ছিল মিউকাস ক্ষরণ করে।

ii. **এনজাইম ক্ষরণকারী** (Enzyme secreting) : অন্যান্য স্থানের কোষগুলো এ ধরনের যা থেকে পরিপাকের জন্য এনজাইম ক্ষরিত হয়।

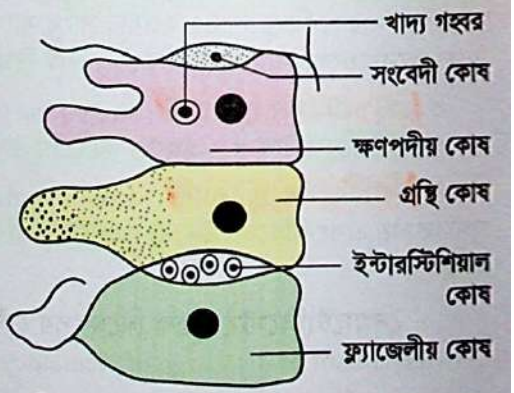

চিত্র ২.১.১২ : *Hydra*-র অন্তঃত্বকের কোষসমূহ

কাজ : হাইপোস্টোমের গ্রন্থিকোষ নিঃসৃত মিউকাস খাদ্যদ্রব্য পিচ্ছিল করে গলাধঃকরণে সাহায্য করে। অন্যান্য স্থানে গ্রন্থিকোষ সিলেন্টেরনে এনজাইম-এর ক্ষরণ ঘটিয়ে পরিপাকে সাহায্য করে।

৩. **ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ** (Interstitial cell) : এগুলো পেশি-আবরণী কোষের ফাঁকে ফাঁকে অবস্থান করে। প্রকৃতপক্ষে এসব কোষ এপিডার্মিস থেকে আগত কোষ। এগুলো গোল বা ত্রিকোণাকার এবং সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস, মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা, মুক্ত রাইবোজোম ও কিছু মাইটোকন্ড্রিয়া বহন করে।

কাজ : এন্ডোডার্মিসের প্রয়োজনীয় যে কোনো কোষ গঠন করাই এর কাজ।

৪. **সংবেদী কোষ** (Sensory cell) : এগুলো পেশি-আবরণী কোষের ফাঁকে ফাঁকে অবস্থিত লম্বা ও সরু কোষ। কোষের মুক্ত প্রান্ত থেকে নির্গত সূক্ষ্ম সংবেদী রোম সিলেন্টেরনে উদগত এবং মেসোগ্লিয়া সংলগ্ন প্রান্ত থেকে নির্গত রোম স্নায়ুতন্তুর সাথে যুক্ত থাকে।

কাজ : সম্ভবত পানির সাথে সিলেন্টেরনে প্রবেশিত খাদ্য ও অন্যান্য পদার্থের গুণাগুণ যাচাই করে স্নায়ুকোষে প্রেরণ করে এবং স্নায়ুকোষ উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

www.Educationblog24.Com

৫. স্নায়ু কোষ (Nerve cell) : এসব কোষ মেসোগ্লিয়া ঘেঁষে অবস্থিত, সংখ্যায় খুব কম। অনিয়ত আকারবিশিষ্ট এবং একটি ক্ষুদ্র কোষদেহ ও দুই বা ততোধিক সূক্ষ্ম শাখান্বিত তন্তু নিয়ে গঠিত। তন্তুগুলো পরস্পর মিলে স্নায়ু-জালিকা গঠন করে।

কাজ : সংবেদী কোষে সংগৃহীত উদ্দীপনা স্থানান্তর করাই এর কাজ।

হাইড্রার এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিসের মধ্যে পার্থক্য

আলোচ্য বিষয়	এপিডার্মিস	গ্যাস্ট্রোডার্মিস
১. উৎপত্তি ও অবস্থান	ভ্রূণীয় এক্টোডার্ম থেকে উৎপন্ন এবং দেহের বাইরের দিকে অবস্থিত।	এন্ডোডার্ম থেকে উৎপন্ন এবং দেহের ভিতরের দিকে অর্থাৎ সিলেন্টেরনকে ঘিরে অবস্থান করে।
২. পুষ্টি কোষ	ক্ষণপদযুক্ত কোষ ও ফ্ল্যাজেলাযুক্ত কোষ দেখা যায় না।	ক্ষণপদযুক্ত ও ফ্ল্যাজেলাযুক্ত কোষ পুষ্টির কাজে নিয়োজিত।
৩. কিউটিকল	পেশি-আবরণী কোষের নিঃসৃত রসে সৃষ্টি হয়।	অনুপস্থিত।
৪. নিডোসাইট	উপস্থিত এবং প্রতিরক্ষা ও আত্মরক্ষার কাজে ব্যবহৃত হয়।	অনুপস্থিত।
৫. জনন অঙ্গ ও মুকুল	দেখতে পাওয়া যায়।	নেই।
৬. কার্যকারিতা	দেহকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে এবং পরিবেশ থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে।	মূলত পুষ্টির কাজে নিয়োজিত।

মেসোগ্লিয়া (Mesogloea)

Hydra-র এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিসের মাঝখানে অবস্থিত জেলির মতো, স্বচ্ছ, স্থিতিস্থাপক স্তরকে **মেসোগ্লিয়া** বলে। মেসোগ্লিয়া স্তরটি দেহ ও কর্ষিকা উভয় স্থানে বিস্তৃত, তবে কর্ষিকায় সবচেয়ে পাতলা এবং পাদ-চাকতিতে সর্বাধিক পুরু। মেসোগ্লিয়ার এ ধরনের বিন্যাস পাদ-চাকতির অতিরিক্ত যান্ত্রিক প্রসারণ প্রতিরোধে সাহায্য করে এবং কর্ষিকাকে অধিকতর নমনীয়তা দান করে। *Hydra*-র মেসোগ্লিয়া প্রায় ০.১ মাইক্রোমিটার পুরু। এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিস উভয় স্তরের কোষ মেসোগ্লিয়া গঠনে অংশ গ্রহণ করে।

কাজ : (i) মেসোগ্লিয়া দেহের অবলম্বনে সহায়তা করে এবং এক ধরনের নমনীয় **কঙ্কাল** হিসেবে কাজ করে। (ii) মেসোগ্লিয়া দুটি কোষস্তরের ভিত্তিরূপে কাজ করে। (iii) স্নায়ুকোষ ও সংবেদী কোষতন্তুসমূহ এবং পেশি-আবরণী কোষের সংকোচনশীল মায়োফাইব্রিল ধারণ করে। (iv) মেসোগ্লিয়ায় অবস্থিত পেশি-আবরণী কোষের সংকোচনশীল মায়োফাইব্রিলের সংকোচনে দেহ বা কর্ষিকা খাটো হয় ফলে দেহ বাঁকানো সম্ভব হয়।

সিলেন্টেরন (Coelenteron)

Hydra-র দেহের কেন্দ্রভাগে অবস্থিত ও গ্যাস্ট্রোডার্মিসে পরিবৃত্ত ফাঁকা গহ্বরকে **সিলেন্টরন** বলে। এতে খাদ্যের বহিঃকোষীয় পরিপাক ঘটে এবং খাদ্যসার, শ্বসন ও রেচন পদার্থ পরিবাহিত হয় বলে একে **গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার গহ্বর** (gastrovascular cavity) বা **পরিপাক সংবহন গহ্বর** বলা হয়। কর্ষিকায় সিলেন্টরন প্রসারিত থাকে বলে এগুলো ফাঁপা হয়। সিলেন্টেরনকে অনেকসময় **ব্লাইন্ড গাট** (blind gut) বা **ব্লাইন্ড স্যাক** (blind sac) বলা হয়। কারণ দেহের উপরিভাগে অবস্থিত একটি মাত্র ছিদ্র, অর্থাৎ মুখছিদ্রের মাধ্যমে এটি খাদ্যগ্রহণ ও বর্জ্য পরিত্যাগ করে।

সিলোম ও সিলেন্টেরনের মধ্যে পার্থক্য

সিলোম	সিলেন্টেরন
১. ত্রিভ্রূণস্তরী প্রাণিদেহে মেসোডার্মাল পেরিটোনিয়ামে আবৃত যেকোন ফাঁকা বা গহ্বরকে সিলোম বলে।	১. দ্বিভ্রূণস্তরী প্রাণিদেহের অভ্যন্তরীণ প্রশস্ত গহ্বরকে সিলেন্টেরন বলে।
২. এর বাইরের ও ভিতরের দিক মোসোডার্মাল পেরিটোনিয়াম দ্বারা আবৃত।	২. এর চতুর্দিক গ্যাস্ট্রোডার্মিস দ্বারা আবৃত।
৩. এটি সিলোমিক তরল দ্বারা পূর্ণ থাকে।	৩. এটি পানি, খাদ্য ও বর্জ্য পদার্থ দ্বারা পূর্ণ থাকে।
৪. এতে বিভিন্ন অঙ্গ যেমন-হৃৎপিন্ড, যকৃত, ফুসফুস ইত্যাদি অবস্থান করে।	৪. এতে কোন অঙ্গ অবস্থান করে না।
৫. এটি শুধু দেহগহ্বরের কাজ করে।	৫. এটি দেহগহ্বর ও পরিপাক গহ্বরের কাজ করে।

www.Educationblog24.Com

Hydra-র খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাক প্রক্রিয়া (Feeding and Digestion)

পুষ্টি (Nutrition) : যে জৈবনিক প্রক্রিয়ায় প্রাণী নিজ পরিবেশ থেকে প্রয়োজনীয় জটিল জৈব খাদ্য গ্রহণ করে বিভিন্ন এনজাইমের সহায়তায় কোষে পরিবহন ও শোষণ উপযোগী সরল ও দ্রবনীয় খাদ্যে পরিণত করে পরিপাককৃত খাদ্যসার শোষণের মাধ্যমে দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন, শক্তি উৎপাদন ইত্যাদি শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপ অক্ষুণ্ন রাখে এবং খাদ্যের অপাচ্য অংশ দেহ থেকে বের করে দেয় তাকে **পুষ্টি** বলে।

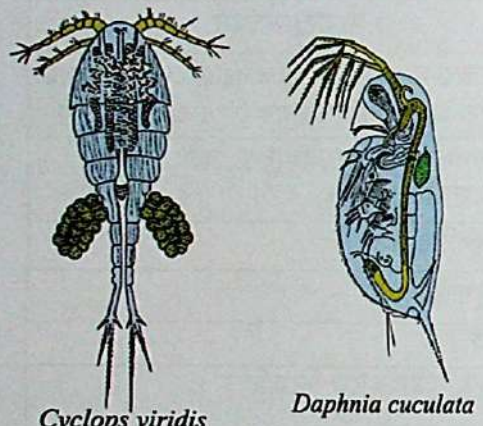

চিত্র ২.১.১৩ : *Hydra*--র প্রধান খাদ্য

Hydra*-র খাদ্য :** *Hydra* মাংসাশী (carnivorous) প্রাণী। যে সব ক্ষুদ্র জলজ প্রাণীকে নেমাটোসিস্ট দিয়ে সহজেই কাবু করা যায়, সে সব প্রাণী *Hydra*-র প্রধান খাদ্য। *Hydra*-র খাদ্য তালিকার বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে বিভিন্ন পতঙ্গের লার্ভা, *Cyclops* (সাইক্লপস) ও ***Daphnia (ড্যাফনিয়া) নামক ক্রাস্টাসীয় সন্ধিপদী প্রাণী (arthropods), ছোট ছোট কৃমি, খণ্ডকায়িত প্রাণী (annelids) ও মাছের ডিম। তবে প্রধান খাদ্য হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্রাস্টাসীয় সন্ধিপদী।

খাদ্য গ্রহণ পদ্ধতি : ক্ষুধার্ত *Hydra* পদতলকে ভিত্তির সাথে আটকে নির্দিষ্ট এলাকা জুড়ে মূলদেহ ও কর্ষিকাগুলো ভাসিয়ে শিকারের অপেক্ষায় থাকে। কোনো খাদ্যপ্রাণী বা শিকার কাছে আসামাত্র কর্ষিকার নেমাটোসিস্টগুলো উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে এবং ঐ শিকার কর্ষিকা স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের নেমাটোসিস্ট-সূত্র নিক্ষিপ্ত হয়। ভলভেন্ট নেমাটোসিস্ট-সূত্রক শিকারের উপাঙ্গ জড়িয়ে গতিরোধ করে এবং গ্লুটিন্যান্টগুলো আঠালো রস ক্ষরণ করে আটকে ফেলে। স্টিনোটিল নেমাটোসিস্ট তখন শিকারের দেহে হিপনোটক্সিন প্রবেশ করিয়ে শিকারকে অবশ করে দেয়। এরপর কর্ষিকা সেটিকে মুখের কাছে নিয়ে আসে। মুখছিদ্র স্ফীত ও চওড়া হয়ে তা গ্রহণ করে। মুখের চারদিকে অবস্থিত গ্রন্থিকোষ নিঃসৃত মিউকাসে সিক্ত ও পিচ্ছিল হয়ে এবং হাইপোস্টোম ও দেহপ্রাচীরের সংকোচন-প্রসারণের ফলে খাদ্য সিলেন্টেরনে এসে পৌঁছে।

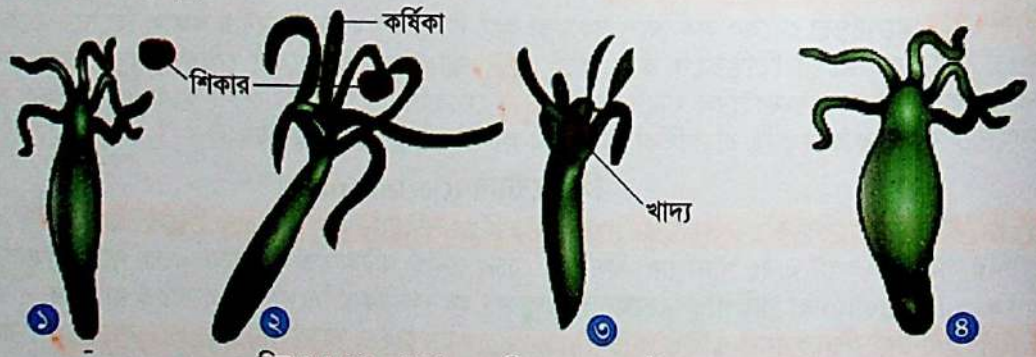

চিত্র ২.১.১৪ : *Hydra*--র শিকার ধরার কৌশল

***Hydra*-র খাদ্য পরিপাক প্রণালী** (Process of Digestion) : যে জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জটিল জৈব খাদ্যবস্তু বিভিন্ন এনজাইমের সাহায্যে ভেঙে তরল, সরল ও কোষের শোষণ উপযোগী অণুতে পরিণত হয়, তাকে পরিপাক বলে। *Hydra*-র খাদ্য পরিপাকের সময় অন্তঃত্বকের গ্রন্থিকোষ থেকে এনজাইম নিঃসৃত হয়। পরিপাক দুটি ধাপে সম্পন্ন হয়:

১. **বহিঃকোষীয় পরিপাক** (Extracellular digestion): কোষের বাইরে খাদ্যবস্তুর পরিপাককে বহিঃকোষীয় বা **আন্তঃকোষীয় পরিপাক** বলে। খাদ্য সিলেন্টেরনে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে মুখছিদ্র বন্ধ হয়ে যায় এবং অন্তঃত্বকীয় গ্রন্থিকোষগুলো সক্রিয় হয়। কোষগুলো বড় ও দানাদার হয়ে উঠে এবং এনজাইম ক্ষরণ করে। প্রথমে এনজাইমের প্রভাবে শিকারের মৃত্যু ঘটে। দেহপ্রাচীরের প্রবল সংকোচন-প্রসারণের ফলে শিকারটি ছোট ছোট কণায় পরিণত হয়। এ সময় অন্তঃত্বকীয় কোষের ফ্ল্যাজেলা সঞ্চালিত হয়ে খাদ্যকণাকে এনজাইমের সাথে ভালভাবে মিশ্রিত করে। গ্রন্থিকোষ থেকে নিঃসৃত এনজাইমের প্রভাবে খাদ্যকণা পরিপাক হতে থাকে। পেপসিন নিঃসৃত হয়ে প্রোটিনকে পলিপেপটাইড-এ পরিণত করে, তবে লিপিড ও শর্করা খাদ্যাংশের কোনো পরিবর্তন হয় না।

www.Educationblog24.Com

২. **অন্তঃকোষীয় পরিপাক** (Intracellular digestion) : দেহের সংকোচন-প্রসারণের ফলে খাদ্য আরও ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়। তখন পেশি-অন্তঃআবরণীর ক্ষণপদীয় কোষগুলো ক্ষণপদ বের করে কিছু খাদ্যকণা সামান্য তরল পদার্থের সাথে কোষীয় ভক্ষণ প্রক্রিয়ায় (ফ্যাগোসাইটোসিস) গলাধঃকরণ করে। খাদ্যকণা তখন কোষের অভ্যন্তরে খাদ্যগহ্বরে সাইটোপ্লাজম থেকে নিঃসৃত এনজাইমের সাহায্যে পরিপাক হয়। খাদ্যগহ্বরে প্রথমে সাইটোপ্লাজম থেকে এসিড ক্ষরিত হয়ে খাদ্যকে আম্লিক করে। পরে ক্ষারীয় রস নিঃসৃত হয়ে ক্ষারীয় মাধ্যম সৃষ্টি হলে সাইটোপ্লাজম থেকে বিভিন্ন এনজাইম নিঃসৃত হয়। ট্রিপসিন আমিষ জাতীয় খাদ্যকে অ্যামিনো এসিডে, লাইপেজ স্নেহজাতীয় খাদ্যকে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে এবং অ্যামাইলেজ শর্করাকে গুকোজে পরিণত করে। খাদ্যগহ্বরে খাদ্য সম্পূর্ণরূপে পরিপাক হয়। *Hydra* আমিষ, স্নেহ ও কিছু শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাক করতে পারে কিন্তু শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য পরিপাক করতে পারে না।

পরিশোষণ, আত্মীকরণ ও বর্জন : খাদ্যের পরিপাককৃত সারাংশ সাইটোপ্লাজমে পরিশোষিত হয়ে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় প্রাণিদেহের বিভিন্ন কোষে বাহিত হয়। অপাচ্য খাদ্যাংশ দেহপ্রাচীরের সংকোচন-প্রসারণ ও ফ্ল্যাজেলার সঞ্চালনের ফলে মুখছিদ্র দিয়ে বহিঃগামী পানির স্রোতের সঙ্গে মিশে দেহের বাইরে বর্জিত হয়।

Hydra-র চলন (Locomotion)

যে প্রক্রিয়ায় জীবদেহ জৈবিক প্রয়োজনে নিজ চেষ্টায় স্থানান্তরিত হয়, তাকে চলন বলে। সাধারণত এটি প্রাণীর এক স্বতঃস্ফূর্ত সহজাত আচরণ। প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবিলায়, জনন, খাদ্য সংগ্রহ, আত্মরক্ষা, বিনোদন প্রভৃতি কারণে জীব স্থানান্তরে গমন করে। *Hydra* সাধারণত নিমজ্জিত বস্তু বা উদ্ভিদের গায়ে সংলগ্ন থাকে, তবে বিভিন্ন উত্তেজকে সাড়া দেয়ার জন্য বা খাদ্য গ্রহণের জন্য স্থান ত্যাগ করতে হয়। কোনো নির্দিষ্ট চলন অঙ্গ না থাকায় সমগ্র প্রক্রিয়াটি বিভিন্নভাবে প্রধানত পদতল, দেহের সংকোচন–প্রসারণশীল পেশিতন্তু ও নেমাটোসিস্টের সাহায্যে সম্পন্ন হয়। চলনের সময় প্রথমে সংবেদী কোষ সাড়া দেয় এবং সে বার্তা বহিঃত্বক ও তিন ধরনের অন্তঃত্বকের স্নায়ু-জালকের ভিতর সঞ্চালিত হয়। ফলে পেশিতন্তু সঙ্কুচিত হয় এবং চলন প্রক্রিয়া শুরু হয়। *Hydra*-য় নিচে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের চলন দেখতে পাওয়া যায়।

১. **লুপিং** (Looping) বা **ফাঁসাচলন :** লম্বা দূরত্ব অতিক্রমের জন্য *Hydra* সাধারণত লুপিং চলনের আশ্রয় নেয়। এ প্রক্রিয়ার শুরুতে এক পাশের পেশি-আবরণী কোষগুলো সঙ্কুচিত হয় এবং অপর পাশের অনুরূপ কোষগুলো সম্প্রসারিত হয়। ফলে *Hydra* গতিপথের দিকে দেহকে প্রসারিত করে ও বাঁকিয়ে মৌখিক তলকে ভিত্তির কাছাকাছি নিয়ে আসে এবং কর্ষিকার গ্লুটিন্যান্ট নেমাটোসিস্টের সাহায্যে ভিত্তিকে আটকে ধরে। এরপর পাদ-চাকতিকে মুক্ত করে মুখের কাছাকাছি এনে স্থাপন করে এবং কর্ষিকা বিযুক্ত করে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। এ পদ্ধতির পুনারাবৃত্তি ঘটিয়ে *Hydra* স্থান ত্যাগ করে। জোঁক বা শুঁয়াপোকা চলার সময় যেভাবে ক্রমান্বয়িক লুপ বা ফাঁসের সৃষ্টি হয় হাইড্রার এ চলনও দেখতে অনেকটা একই রকম হওয়ায় ফাঁসাচলনকে **জোঁকা চলন বা শুঁয়াপোকা চলন** নামেও অভিহিত করা যায়।

চিত্র ২.১.১৫ : লুপিং চলন

২. **সমারসল্টিং** (Somersaulting) বা **ডিগবাজী :** এটি *Hydra*-র সাধারণ ও দ্রুত চলন প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার শুরুতে *Hydra* দেহকে বাঁকিয়ে চলনের গতিপথে কর্ষিকায় অবস্থিত গ্লুটিন্যান্ট জাতীয় নেমাটোসিস্টের আঠালো ক্ষরণের সাহায্যে গতিপথকে স্পর্শ করে। এ সময় গন্তব্যস্থলমুখী পেশি-আবরণী কোষের সংকোচন ও অপর পাশের অনুরূপ কোষের সম্প্রসারণ ঘটে। পরে পাদ-চাকতি বিযুক্ত করে কর্ষিকার উপর ভর দিয়ে দেহকে সোজা করে দেয়। পুনরায় দেহকে বাঁকিয়ে পাদ-চাকতির সাহায্যে গতিপথকে স্পর্শ করে। পরে কর্ষিকা মুক্ত করে দেহকে সোজা করে দেয়। এ প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে *Hydra* দ্রুত স্থান ত্যাগ করে।

www.Educationblog24.Com

চিত্র ২.১.১৬ : সমারসল্টিং চলন

৩. **গ্লাইডিং (Gliding) বা অ্যামিবয়েড চলন** : এ প্রক্রিয়ায় *Hydra* পদতলের বহিঃত্বকীয় কোষগুলো থেকে পিচ্ছিল রস ক্ষরণ করে। পরে ঐ স্থান থেকেই প্রক্ষিপ্ত কোষীয় ক্ষণপদের অ্যামিবয়েড চলনের সাহায্যে দেহটি অত্যন্ত ধীরগতিতে মসৃণতলে খুব সামান্য দূরত্বে স্থানান্তরিত হয়।

৪. **ভাসা (Floating)** : মাঝে মাঝে *Hydra* পাদ-চাকতির বহিঃত্বকীয় কোষ থেকে গ্যাসীয় বুদবুদ সৃষ্টি করে, ফলে প্রাণী ভিত্তি থেকে বিচ্যুত, হালকা ও উপুড় হয়ে পানির পৃষ্ঠতলে ভেসে উঠে। এখানে বুদবুদ ফেটে মিউকাস ভেলার মতো ছড়িয়ে গেলে *Hydra* নিম্নমুখী হয়ে ভেসে থাকে। এভাবে প্রাণী ঢেউয়ের আঘাতে কিছুদূর ভেসেও যেতে পারে।

৫. **সাঁতার (Swimming)** : কর্ষিকাগুলোকে ঢেউয়ের মতো আন্দোলিত করে এবং দেহকে ভিত্তি থেকে মুক্ত করে *Hydra* সহজেই দেহকে ঢেউয়ের মতো আন্দোলিত করে সাঁতার কাটতে পারে।

৬. **হামাগুড়ি (Crawling)** : এ প্রক্রিয়ায় *Hydra* কর্ষিকার সাহায্যে কাছাকাছি কোনো বস্তুকে আঁকড়ে ধরে। পরে পাদ-চাকতি মুক্ত ও কর্ষিকা সংকুচিত করে পাদ-চাকতিকে নতুন জায়গায় স্থাপন করে। এ প্রক্রিয়ায় *Hydra*-র আরোহণ ও অবরোহণ সম্পন্ন হয়।

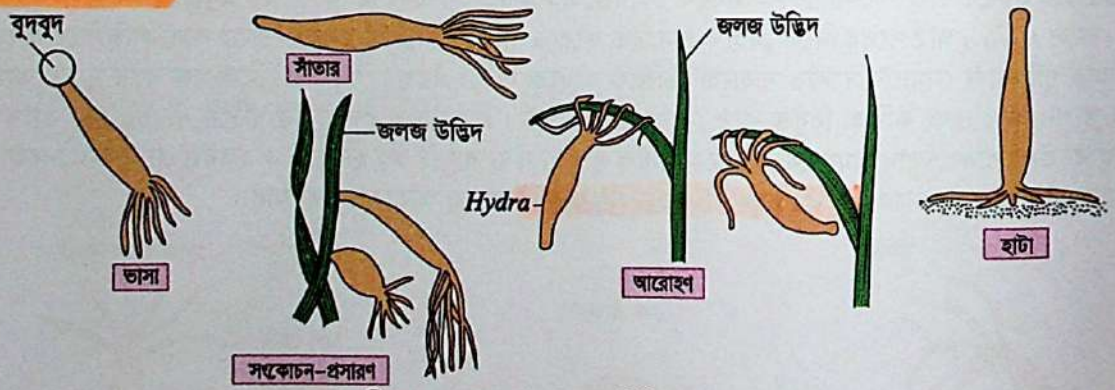

চিত্র ২.১.১৭ : *Hydra*--র বিভিন্ন ধরনের চলন

৭. **হাঁটা (Walking)** : এ ক্ষেত্রে *Hydra* তার দেহের ভার পাদ-চাকতির উপর না রেখে কর্ষিকার উপর স্থাপন করে এবং কর্ষিকাকে পায়ের মতো ব্যবহার করে উল্টোভাবে ধীর গতিতে চলতে পারে।

৮. **দেহের সংকোচন- প্রসারণ (Body contraction and expansion)** : এ প্রক্রিয়ায় *Hydra* দেহকে মুক্ত করে দেহপ্রাচীরের পেশি-আবরণী কোষের সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে দেহের আকার দ্রুত খাটো ও লম্বা করে, ফলে এক ধরনের চলনের সৃষ্টি হয়।

Hydra-র জনন (Reproduction of *Hydra*)

যে প্রক্রিয়ায় জীব নিজ বংশধর রক্ষার জন্য প্রজননক্ষম অনুরূপ জীব সৃষ্টি করে তাকে জনন বলে। এ প্রক্রিয়ায় জীব দেহাংশের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে (অযৌন) বা একই প্রজাতির অন্য সদস্যের সহযোগিতায় ও গ্যামেট সৃষ্টির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে (যৌন) নিজ আকৃতিসদৃশ বংশধর সৃষ্টি করে। *Hydra* অযৌন ও যৌন উভয় প্রক্রিয়ায় বংশ বৃদ্ধি করে।

www.Educationblog24.Com

অযৌন জনন (Asexual reproduction)

গ্যামেট উৎপাদন ছাড়াই যে জনন সম্পাদিত হয় তাকে অযৌন জনন বলে। এ ধরনের জনন পদ্ধতিতে একটি মাত্র জনিতা থেকেই নতুন জীবের সৃষ্টি হয়। *Hydra* দু'ভাবে অযৌন জনন সম্পন্ন করে, যথা– মুকুলোদগম ও বিভাজন।

চিত্র ২.১.১৮ : *Hydra*-র মুকুলোদগমের ধাপসমূহ

১. **মুকুলোদগম** (Budding) : এটি অযৌন জননের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। বছরের সব ঋতুতেই বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ থাকায় এটি বেশি ঘটে। নিম্নোক্ত বেশ কয়েকটি ধাপে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়।

i. প্রক্রিয়ার শুরুতে দেহের মধ্যাংশ বা নিম্নাংশের কোন স্থানের এপিডার্মিসের ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ দ্রুত বিভাজিত হয়ে একটি ক্ষুদ্র স্ফীত অংশের সৃষ্টি করে।

ii. স্ফীত অংশটি ক্রমশ বড় হয়ে ফাঁপা, নলাকার **মুকুল** (bud)-এ পরিণত হয়। এতে এপিডার্মিস, মেসোগ্লিয়া ও গ্যাস্ট্রোডার্মিস সৃষ্টি হয়।

iii. মাতৃহাইড্রার সিলেন্টেরন মুকুলের কেন্দ্রে প্রসারিত হয়।

iv. মুকুলটি মাতৃহাইড্রা থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে বড় হয় এবং শীর্ষপ্রান্তে গঠিত হয় মুখছিদ্র, হাইপোস্টোম ও কর্ষিকা।

v. এসময় মাতৃহাইড্রা ও মুকুলের সংযোগস্থলে একটি বৃত্তাকার খাঁজের সৃষ্টি হয়। খাঁজটি ক্রমে গভীর হয়ে মুকুল তথা অপত্য হাইড্রাকে মাতৃহাইড্রা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

vi. অপত্য হাইড্রার বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রান্তে পাদ-চাকতি গঠিত হয়।

vii. শিশু হাইড্রা কিছুক্ষণ বিচরণের পর নিমজ্জিত কোনো বস্তুর সংলগ্ন হয়ে স্বাধীন জীবন যাপন শুরু করে।

ঘটনাক্রমে একটি *Hydra*-য় বেশ কয়েকটি মুকুলের সৃষ্টি হতে পারে। এসব মুকুল আবার নতুন মুকুল সৃষ্টি করতে পারে। সম্পূর্ণ মাতৃ *Hydra*-কে তখন একটি দলবদ্ধ প্রাণীর মতো দেখায়। মুকুল সৃষ্টি এবং মাতৃ *Hydra* থেকে পৃথক হয়ে স্বাধীন জীবন যাপন করতে প্রায় তিন সপ্তাহ সময় লাগে।

২. **বিভাজন** (Fission) : বিভাজন কোনো স্বাভাবিক জনন প্রক্রিয়া নয় কারণ এটি দৈবাৎ সংঘটিত হয়। কোন বাহ্যিক কারণে হাইড্রার দেহ দুই বা ততোধিক খণ্ডে বিভক্ত হলে প্রত্যেক খণ্ড থেকে নতুন হাইড্রা জন্মায়। একে **পুনরুৎপত্তি** (regeneration) বলে, কারণ এ প্রক্রিয়ায় দেহের হারানো বা বিনষ্ট অংশ পুনর্গঠিত হয়। প্রকৃতিবিজ্ঞানী ট্রেম্বলে (Trembley) ১৭৪৪ সালে সর্বপ্রথম *Hydra*-র পুনরুৎপত্তি ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেন। এ ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন অংশের ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ অতিদ্রুত বিভক্ত ও রূপান্তরিত হয়ে বিভিন্ন কোষ সৃষ্টি করে। এসব কোষ দিয়ে দেহের বিভিন্ন অংশ গঠনের মাধ্যমে অপত্য হাইড্রার বিকাশ ঘটে। সুতরাং হাইড্রার স্বাভাবিক মৃত্যু নেই। বিভাজন দুভাবে হতে পারে, যথা-অনুদৈর্ঘ্য বিভাজন ও অনুপ্রস্থ বিভাজন।

i. **অনুদৈর্ঘ্য বিভাজন** : হাইড্রার দেহ কোনো কারণে লম্বালম্বি দুই বা ততোধিক খন্ডে বিভক্ত হলে প্রত্যেক খন্ড থেকে পৃথক হাইড্রার উৎপত্তি হয়।

ii. **অনুপ্রস্থ বিভাজন** : কোনো কারণে হাইড্রার দেহ অনুপ্রস্থভাবে একাধিক খণ্ডে বিভক্ত হলে প্রত্যেক খণ্ড থেকে পুনরুৎপত্তি প্রক্রিয়ায় নতুন হাইড্রা জন্ম লাভ করে।

www.Educationblog24.Com

যৌন জনন (Sexual reproduction)

নিষেকের মাধ্যমে জাইগোট সৃষ্টির উদ্দেশে দুটি পরিণত জননকোষের (শুক্রাণু ও ডিম্বাণু) নিউক্লিয়াসের একীভবন প্রক্রিয়াকে যৌন জনন বলে।

Hydra-র যৌন জননকে আলোচনার সুবিধার জন্য তিনটি শিরোনামভুক্ত করা যায়, যেমন–অস্থায়ী জননাঙ্গ সৃষ্টি, নিষেক ও পরিস্ফুটন।

১. অস্থায়ী জননাঙ্গ সৃষ্টি : অধিকাংশ হাইড্রা একলিঙ্গ (dioecious), তবে কিছু সংখ্যক উভলিঙ্গ (monoecious)-ও আছে। উভলিঙ্গ হলেও এদের স্বনিষেক ঘটে না, কারণ জননাঙ্গগুলো বিভিন্ন সময়ে পরিপক্কতা লাভ করে। প্রধানত শরৎকালে খাদ্য স্বল্পতার মতো প্রতিকূল পরিবেশে এদের দেহে অস্থায়ী জননাঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং যৌন জনন ঘটে। পুরুষ ও স্ত্রী জননাঙ্গকে যথাক্রমে শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় বলে।

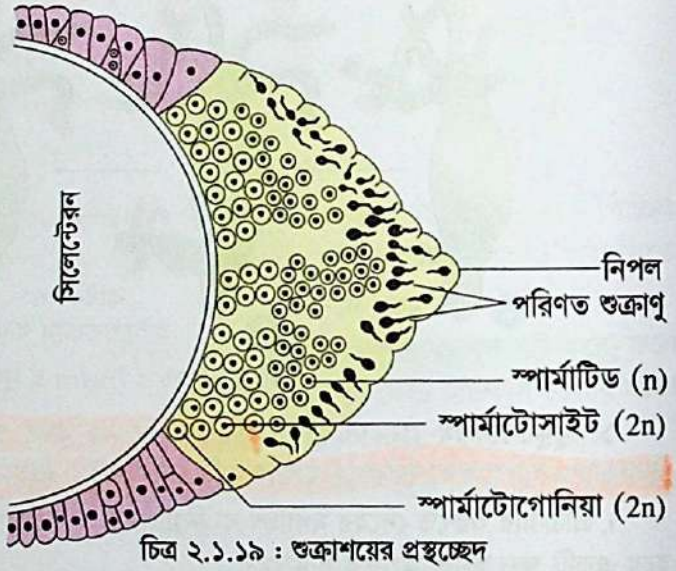

চিত্র ২.১.১৯ : শুক্রাশয়ের প্রস্থচ্ছেদ

নিচে জননাঙ্গের উৎপত্তি ও এগুলো অভ্যন্তরে জননকোষ সৃষ্টির প্রক্রিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

ক. শুক্রাশয়ের উৎপত্তি : প্রজনন ঋতুতে সাধারণত দেহের উপরের অর্ধাংশে ও হাইপোস্টোমের কাছাকাছি স্থানের এপিডার্মাল ইন্টারস্টিশিয়াল কোষের দ্রুত বিভাজনের ফলে এক বা একাধিক মোচাকার **শুক্রাশয়** (testis) সৃষ্টি হয়। এর শীর্ষে একটি বোঁটা বা **নিপল** (nipple) এবং পরিণত শুক্রাশয়ের অভ্যন্তরে থাকে অসংখ্য **শুক্রাণু**। শুক্রাশয়ে শুক্রাণু সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে **স্পার্মাটোজেনেসিস** (spermatogenesis) বা **শুক্রাণুজনন** বলে। শুক্রাশয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ বারংবার মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে **স্পার্মাটোগোনিয়া** (spermatogonia) সৃষ্টি করে। পরে এগুলো বৃদ্ধিলাভ করে **স্পার্মাটোসাইট** (spermatocyte)-এ পরিণত হয়। প্রত্যেক স্পার্মাটোসাইট মিয়োসিস বিভাজনের ফলে ৪টি করে হ্যাপয়েড **স্পার্মাটিড** (spermatid) উৎপন্ন করে। প্রত্যেক স্পার্মাটিড একেকটি **শুক্রাণু** (sperm)–তে পরিণত হয়। প্রত্যেক পরিণত শুক্রাণু নিউক্লিয়াসযুক্ত একটি স্ফীত **মস্তক** (head), সেন্ট্রিওলযুক্ত একটি সংকীর্ণ **মধ্যখন্ড** (middle piece) এবং একটি লম্বা, সরু, বিচলনক্ষম **লেজ** (tail) নিয়ে গঠিত।

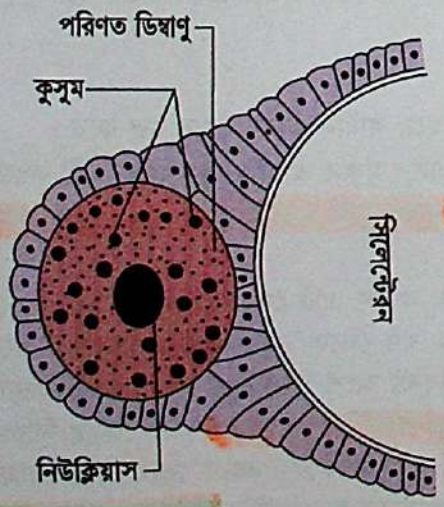

চিত্র ২.১.২০ : ডিম্বাশয়ের প্রস্থচ্ছেদ

খ. ডিম্বাশয়ের উৎপত্তি : প্রজনন ঋতুতে দেহের নিচের অর্ধাংশে, কিন্তু পদতলের সামান্য উপরে এপিডার্মিসের একটি বা দুটি স্থানের কিছু ইন্টারস্টিশিয়াল কোষের বারংবার বিভাজনের ফলে সাধারণত একটি বা দুটি গোলাকার **ডিম্বাশয়** (ovary) সৃষ্টি করে। প্রত্যেক ডিম্বাশয় থেকে একটি করে **ডিম্বাণু** (ovam) সৃষ্টি হয়। ডিম্বাশয়ের অভ্যন্তরে ডিম্বাণু সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে **উওজেনেসিস** (oogenesis) বা **ডিম্বাণুজনন** বলে। প্রথমে ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে **উওগোনিয়া** (oogonia) গঠন করে। এগুলোর মধ্যে কেন্দ্রস্থ একটি কোষ বড় হয়ে **উওসাইট** (oocyte)-এ পরিণত হয় এবং ছোট কোষগুলোকে গলাধঃকরণ করে। এটি তখন মিয়োসিস বিভাজন ঘটিয়ে ৩টি ক্ষুদ্র **পোলার বডি** (polar body) ও ১টি বড় সক্রিয় **উওটিড** (ootid) সৃষ্টি করে। উওটিডটি রূপান্তরিত হয়ে ডিম্বাণুতে পরিণত হয়। পোলার বডিগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়। ডিম্বাণুর পরিপূর্ণ বৃদ্ধির ফলে ডিম্বাশয়ের বহিরাবরণ ছিঁড়ে যায় এবং ডিম্বাণুকে উন্মুক্ত করে দেয়। এর চারদিকে তখন জিলেটিনের পিচ্ছিল আস্তরণ থাকে।

www.Educationblog24.Com

২. নিষেক (Fertilization) : শুক্রাণু পরিণত হলে শুক্রাশয়ের নিপল বিদীর্ণ করে ডিম্বাণুর সন্ধানে পানিতে ঝাঁকে ঝাঁকে সাঁতরাতে থাকে। ২৪-৪৮ ঘন্টার মধ্যে ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করতে না পারলে এগুলো বিনষ্ট হয়ে যায়। অন্যদিকে, উন্মুক্ত হওয়ার পর অল্পদিনের মধ্যে নিষিক্ত না হলে ডিম্বাণুও নষ্ট হয়ে ক্রমশ ধ্বংস হতে থাকে। শুক্রাণুর ঝাঁক একেকটি ডিম্বাণুর চারদিক ঘিরে ফেলে। একাধিক শুক্রাণু ডিম্বাণুর আবরণ ভেদ করলেও একটিমাত্র শুক্রাণুর নিউক্লিয়াসই ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াসের সাথে একীভূত হয়ে **নিষেক** সম্পন্ন করে এবং একটি ডিপ্লয়েড (2n) **জাইগোট** (zygote) গঠন করে।

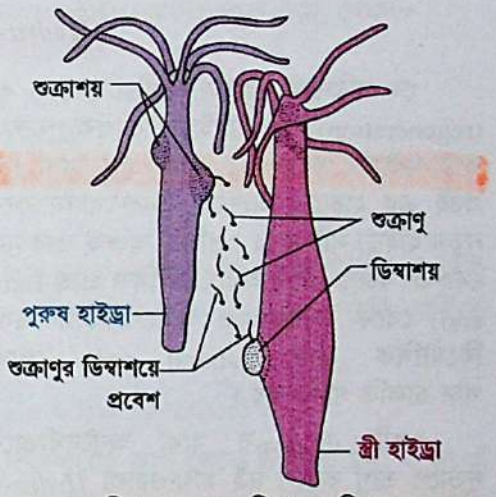

চিত্র ২.১.২১ : নিষেক প্রক্রিয়া

৩. পরিস্ফুটন (Development) : যেসব ক্রমান্বয়িক পরিবর্তনের মাধ্যমে জাইগোট থেকে শিশু প্রাণীর উৎপত্তি ঘটে তাকে **পরিস্ফুটন** বলে। জাইগোট নানা ধরনের পরিস্ফুটন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ হাইড্রায় পরিণত হয়।

হাইড্রার পরিস্ফুটনকালে নিম্নোক্ত পর্যায়সমূহ দেখা যায়।

ক. মরুলা (Morula) : জাইগোট মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বারবার বিভক্ত হয়ে বহুকোষী, নিরেট ও গোলাকার কোষপিণ্ডে পরিণত হয়। এর নাম **মরুলা**।

খ. ব্লাস্টুলা (Blastula) : শীঘ্রই মরুলার কোষগুলো একস্তরে সজ্জিত হয়ে একটি ফাঁপা, গোল ভ্রূণে পরিণত হয়। এর নাম ব্লাস্টুলা। ব্লাস্টুলার কোষগুলোকে **ব্লাস্টোমিয়ার** (blastomere) এবং কেন্দ্রে ফাঁকা গহ্বরকে **ব্লাস্টোসিল** (blastocoel) বলে।

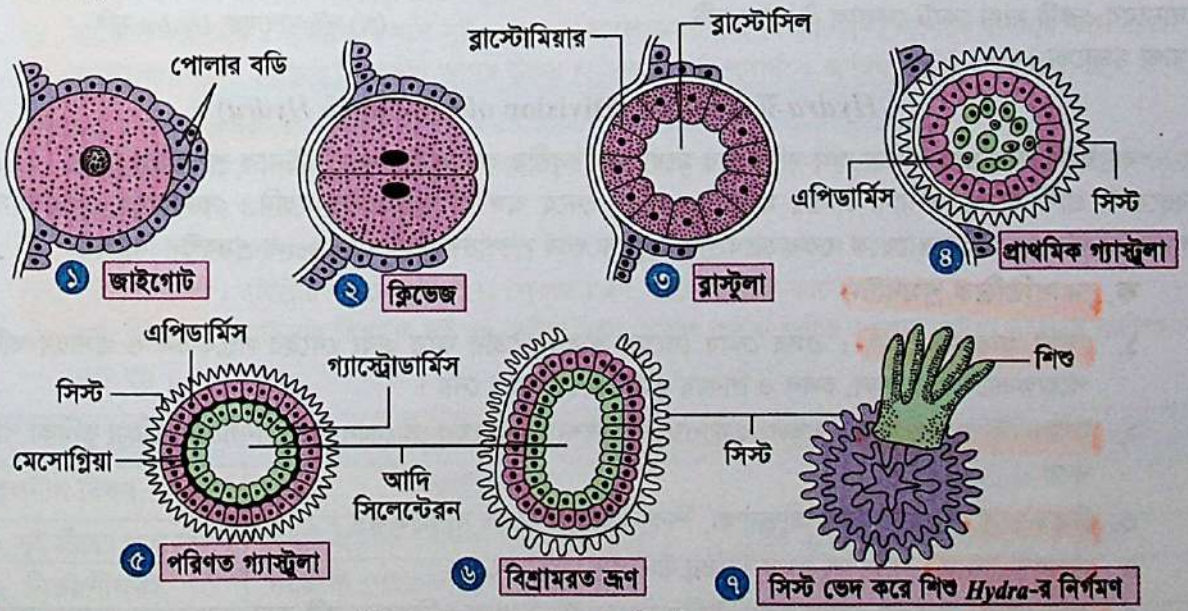

চিত্র ২.১.২২ : *Hydra*-র পরিস্ফুটনের ধাপসমূহ

গ. গ্যাস্ট্রুলা (Gastrula) : ব্লাস্টুলা **গ্যাস্ট্রুলেশন** (gastrulation) প্রক্রিয়ায় দ্বিস্তরবিশিষ্ট গ্যাস্ট্রুলায় পরিণত হয়। এটি এক্টোডার্ম, এন্ডোডার্ম ও আদি সিলেন্টেরন নিয়ে গঠিত। মাতৃদেহের সাথে সংযুক্ত এ গ্যাস্ট্রুলাকে **স্টেরিওগ্যাস্ট্রুলা** (stereogastrula) বলে। গ্যাস্ট্রুলার চারদিকে একটি কাইটিন নির্মিত কাঁটাযুক্ত **সিস্ট** (cyst) আবরণী গঠিত হয়। সিস্টবদ্ধ ভ্রূণটি মাতৃহাইড্রা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পানির তলদেশে চলে যায়।

ঘ. হাইড্রুলা (Hydrula) : বসন্তের শুরুতে অনুকূল তাপমাত্রায় সিস্টের মধ্যেই ভ্রূণটি ক্রমশ লম্বা হতে থাকে এবং এর অগ্রপ্রান্তে হাইপোস্টোম, মুখছিদ্র ও কর্ষিকা এবং পশ্চাৎপ্রান্তে পাদ-চাকতি গঠিত হয়। ভ্রূণের এ দশাকে হাইড্রুলা বলে। হাইড্রুলা সিস্টের আবরণী বিদীর্ণ করে পানিতে বেরিয়ে আসে এবং স্বাধীন জীবন যাপন শুরু করে।

www.Educationblog24.Com

Hydra-র পুনরুৎপত্তি (Regeneration)

যে প্রক্রিয়ায় কোনো প্রাণীর হারানো বা নষ্ট হয়ে যাওয়া দেহাংশকে দেহে পুনর্গঠন করে তাকে **পুনরুৎপত্তি** (regeneration) বলে। হাইড্রায় ব্যাপক পুনরুৎপত্তি ক্ষমতা রয়েছে। **আব্রাহাম ট্রেমলে** (Abraham Trembley, 1744) প্রথম হাইড্রার পুনরুৎপত্তি ক্ষমতা পর্যবেক্ষণ করেন। কোনো হাইড্রাকে যদি কয়েক খণ্ডে বিভক্ত করা হয় তাহলে প্রত্যেক খণ্ডই এর হারানো অংশকে পুনরুৎপাদন করে নতুন হাইড্রা সৃষ্টি করে। প্রতিটি অংশই তার মূল মেরুতা বজায় রাখে অর্থাৎ **মৌখিক প্রান্ত** (oral end) থেকে কর্ষিকা ও হাইপোস্টোম এবং **বিমৌখিক প্রান্ত** (aboral end) থেকে পাদ-চাকতি গঠিত হয়।

একটি *Hydra*-র মাথা অনুদৈর্ঘ্যভাবে দুভাগে ভাগ করলে দুই মাথাওয়ালা *Hydra*-র আবির্ভাব ঘটে।

Hydra-র এ ধরনের স্বভাবের জন্য রূপকথার দানব **হাইড্রা**-র নামানুসারেই এর নামকরণ করা হয়েছে। এ দানবের নয়টি মাথা ছিল। রূপকথা অনুযায়ী **হারকিউলিস** (Hercules) নামক এক শক্তিধর মানব এ দানবের একটি মাথা কেটে ফেললে ঐ স্থানে দুটি মাথা গজাতো।

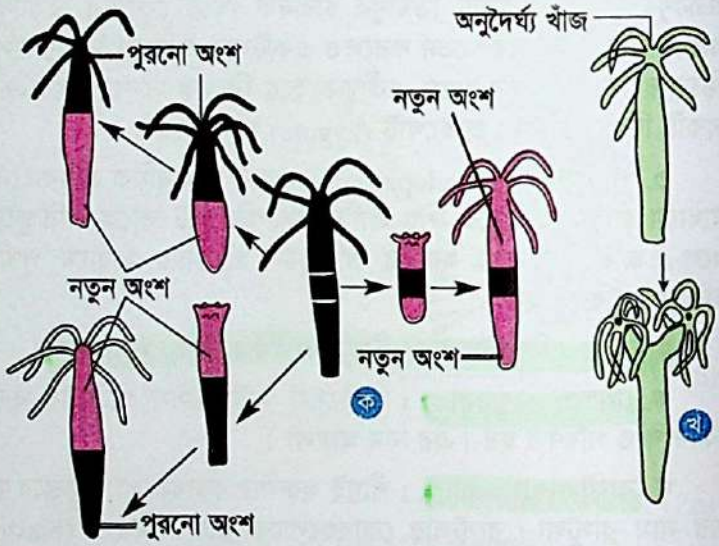

চিত্র ২.১.২৩ : (ক) একটি *Hydra* থেকে তিনটি
(খ) দুই মাথাযুক্ত *Hydra* সৃষ্টি

Hydra-য় শ্রমবন্টন (Division of Labour in *Hydra*)

বহুকোষী জীবদেহে বিভিন্ন অঙ্গ বা তন্ত্রের মধ্যে শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলীর সুষম বণ্টনকে **শ্রমবন্টন** বুঝায়। *Hydra* বহুকোষী প্রাণী হলেও অন্যান্য প্রাণীর মতো *Hydra*-র দেহে অঙ্গ বা তন্ত্র গঠিত হয়নি। কোষগুলো এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিস স্তরে বিন্যস্ত থেকে এককভাবে পৃথক পৃথক কার্য সম্পাদন করে। *Hydra*-র শ্রমবন্টন নিম্নরূপ:

ক. কোষভিত্তিক শ্রমবন্টন

১. **পেশি-আবরণী কোষ** : এসব কোষ দেহের আবরণ তৈরি করে এবং দেহের সংকোচন ও প্রসারণ ঘটিয়ে পরোক্ষভাবে আত্মরক্ষা, চলন ও শিকার ধরার কাজে অংশ নেয়।

২. **ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ** : মুকুল, শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয়সহ দেহের যে কোন অংশ পুনর্গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

৩. **নিডোসাইট** : এসব কোষ আত্মরক্ষা, শিকার ধরা ও চলনে ব্যবহৃত হয়।

৪. **সংবেদী কোষ** : পরিবেশ থেকে বিভিন্ন উদ্দীপনা গ্রহণ করে।

৫. **স্নায়ু কোষ** : সংবেদী কোষে গৃহীত উদ্দীপনা অনুযায়ী উপযুক্ত প্রতিবেদন সৃষ্টি করে এবং সকল কোষের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

৬. **গ্রন্থিকোষ** : গ্যাস্ট্রোডার্মিসের গ্রন্থিকোষ মিউকাস ও বিভিন্ন প্রকার এনজাইম ক্ষরণ করে পরিপাকে সাহায্য করে। পাদ-চাকতিতে উপস্থিত গ্রন্থিকোষ থেকে নিঃসৃত আঠালো রস হাইড্রাকে কোন বস্তুর সাথে আটকে থাকতে সহায়তা করে এবং বুদবুদ গঠনের মাধ্যমে ভেসে চলতে সাহায্য করে।

৭. **পুষ্টি-পেশিকোষ** : বহিঃকোষীয় ও অন্তঃকোষীয় পরিপাক সম্পন্ন করে।

www.Educationblog24.Com

খ. কার্যভিত্তিক শ্রমবণ্টন : *Hydra*-র দেহে উপস্থিত বিভিন্ন অংশগুলো বিভিন্ন কাজে অংশ নেয়, যেমন–

১. **মুখছিদ্র :** খাদ্য গ্রহণ ও বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনে দায়িত্ব পালন করে।
২. **সিলেন্টেরন :** পরিপাক ও পরিবহন গহ্বর হিসেবে শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পাদন করে।
৩. **কর্ষিকাসমূহ :** আত্মরক্ষা, শিকার ধরা, চলন প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হয়।
৪. **পাদ-চাকতি :** কোন বস্তুর সাথে আটকে থাকতে এবং চলনে সহায়তা করে।
৫. **দেহকাণ্ড :** জনন অঙ্গ এবং মুকুল ধারণ করে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, *Hydra*-র দেহে উপস্থিত বিভিন্ন ধরনের কোষ এককভাবে যাবতীয় শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করে। অর্থাৎ বলা যায় *Hydra*-য় শ্রমবণ্টন উল্লেখযোগ্য। প্রাণিরাজ্যে *Hydra* তথা Cnidaria পর্বের প্রাণীতে সর্বপ্রথম কোষের গঠনমূলক বৈষম্য ও শ্রমবণ্টন দেখা যায়।

মিথোজীবিতা (Symbiosis; গ্রিক. *symbioum* = live together)

যখন দুটি ভিন্ন প্রজাতিভুক্ত জীব ঘনিষ্ঠভাবে সহাবস্থানের ফলে পরস্পরের কাছ থেকে উপকৃত হয়, তখন এ ধরনের সাহচর্যকে মিথোজীবিতা বলে। এ অবস্থায় জীবদুটিকে **মিথোজীবী** (symbiont) বলা হয়। *Hydra viridissima* (=*Chlorohydra viridissima*) নামক সবুজ হাইড্রা ও *Zoochlorella* নামক শৈবালের মধ্যে এ সম্পর্ক সুস্পষ্ট দেখা যায়। *Zoochlorella* বা সবুজ শৈবাল হাইড্রার গ্যাস্ট্রোডার্মিসে বাস করে। হাইড্রা অর্ধস্বচ্ছ প্রাণী হওয়ায় এ শৈবালের অন্তঃস্থ উপস্থিতি এ হাইড্রাকে সবুজ বর্ণ প্রদান করে এবং এজন্য হাইড্রাটিও বাইরে থেকে সবুজ দেখায়। নিম্নোক্তভাবে এরা পরস্পরের কাছ থেকে উপকৃত হয়।

শৈবালের প্রাপ্ত উপকার

i. **আশ্রয় :** শৈবাল হাইড্রার গ্যাস্ট্রোডার্মাল (অন্তঃকোষীয়) পেশি-আবরণী কোষে আশ্রয় পায়;
ii. **সালোকসংশ্লেষণ :** হাইড্রার শ্বসনে সৃষ্ট CO_2-কে সালোকসংশ্লেষণের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে এবং
iii. **খাদ্যোৎপাদন :** হাইড্রার বিপাকীয় কাজে উদ্ভূত N_2 জাত বর্জ্য পদার্থকে আমিষ তৈরির কাজে ব্যবহার করে।

Hydra-র প্রাপ্ত উপকার

i. **খাদ্যপ্রাপ্তি :** সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শৈবাল যে খাদ্য প্রস্তুত করে তার উদ্বৃত্ত অংশ গ্রহণ করে হাইড্রা শর্করা জাতীয় খাদ্যের অভাব পূরণ করে;
ii. **শ্বসন :** সালোকসংশ্লেষণকালে শৈবাল যে O_2 নির্গত করে হাইড্রা তা শ্বসনে ব্যবহার করে;
iii. **CO_2 শোষণ :** হাইড্রার শ্বসনে সৃষ্ট CO_2 শৈবাল গ্রহণ করে প্রাণীকে ঝামেলামুক্ত করে এবং
iv. **বর্জ্য নিষ্কাশন :** হাইড্রার বিপাকে সৃষ্ট N_2-ঘটিত বর্জ্য শৈবাল কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় হাইড্রা সহজেই বর্জ্যপদার্থ মুক্ত হয়।

পরজীবিতা ও মিথোজীবিতার মধ্যে পার্থক্য

তুলনীয় বিষয়	পরজীবিতা	মিথোজীবিতা
১. দুই জীবের মধ্যে সম্পর্ক	একটি প্রজাতি পোষক, অন্যটি পরজীবী।	উভয় প্রজাতিই পরস্পরের মিথোজীবী।
২. নির্ভরশীলতা	পরজীবী পোষকের উপর নির্ভরশীল।	মিথোজীবীরা পরস্পর নির্ভরশীল।
৩. ঘনিষ্ঠতা	পরজীবী পোষকের সাথে সবসময় ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত নাও থাকতে পারে।	মিথোজীবিতায় একটি সদস্য সব সময় অন্যটির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসে।
৪. উপকারিতা	পোষকের ক্ষতির বিনিময়ে পরজীবী আশ্রয়, খাদ্য ও জনন বিষয়ে উপকৃত হয়।	উভয়ে নানাভাবে উপকৃত হয়।
৫. অভিযোজন	অভিযোজনের কারণে পরজীবীদের বিভিন্ন অঙ্গের পরিবর্তন ঘটে।	অভিযোজনের কারণে মিথোজীবীদের কোন অঙ্গের পরিবর্তন ঘটে না।

www.Educationblog24.Com

ব্যবহারিক অংশ

পরীক্ষণ : ১. *Hydra*-র পূর্ণ মাউন্ড পর্যবেক্ষণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ : *Hydra*-র স্থায়ী স্লাইড, কিংবা মডেল, অণুবীক্ষণযন্ত্র, চিত্র আঁকার জন্য শীট, পেন্সিল, রাবার ইত্যাদি।

কার্যপদ্ধতি : শিক্ষার্থীরা গবেষণাগারে অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে *Hydra*-র স্থায়ী স্লাইড অথবা শিক্ষক প্রদত্ত *Hydra*-র মডেল পর্যবেক্ষণ করে, এটি শনাক্ত করবে, এর শ্রেণিবিন্যাস জানবে, ড্রইং শীটে এর চিহ্নিত চিত্র আঁকবে ও শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখবে।

শনাক্তকরণ

১. দেহটি নলাকার; একপ্রান্ত খোলা ও অন্যপ্রান্ত বন্ধ।

২. মুক্ত প্রান্তে অবস্থিত মোচাকৃতি হাইপোস্টোমের চূড়ায় **মুখছিদ্র** অবস্থিত।

৩. হাইপোস্টোমকে ঘিরে কয়েকটি সুতার মতো **কর্ষিকা** রয়েছে।

৪. দেহের বদ্ধ (নিম্ন) প্রান্তে গোলাকার **পাদ-চাকতি** অবস্থিত।

৫. দেহে **মুকুল** দেখা যায়।

চিত্র ২.১.২৪ : *Hydra*-র পূর্ণ মাউন্ট

[**গবেষণাগারে পরীক্ষার জন্য *Hydra* সংগ্রহ :** গবেষণাগারে পরীক্ষার জন্য খুব সহজেই *Hydra* সংগ্রহ করা যায়। শীতের শুরুতে যখন পুকুর, ডোবা, হ্রদ বা খালের পানি কমতে শুরু করে তখন এসব জলাশয়ের মাত্র ৩০ সেন্টিমিটার গভীর থেকে কিছু ডালপালা বা জলজ উদ্ভিদ কিংবা অন্য কোনো জলজ বস্তু তুলে আনতে হবে। যেহেতু *Hydra* সাধারণত কোনো বস্তুর সাথে আটকানো থাকে তাই পানি থেকে শুধু *Hydra* তুলে আনা সম্ভব নয়। জলাশয় থেকে সংগৃহিত এসব বস্তু পানিপূর্ণ একটি কাঁচের জার (Jar)-এ রেখে সেটি কিছু সময়ের জন্য আলোকিত স্থানে রাখতে হবে। কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে *Hydra* গুলো (যদি সংগৃহীত বস্তুগুলোতে থেকে থাকে) জারের তলদেশ বা পার্শ্বপ্রাচীরে এসে আশ্রয় নিয়েছে। তখন পিপেট (pipette)-এর সাহায্যে এদেরকে পেট্রিডিস বা স্লাইডে উঠিয়ে অণুবীক্ষণযন্ত্রের নিচে নিরীক্ষণ করা হয়।]

পরীক্ষণ : ২. *Hydra*-র প্রস্থচ্ছেদের স্লাইড (T. S. of *Hydra*) পর্যবেক্ষণ

প্রদত্ত নমুনাটি *Hydra*-র প্রস্থচ্ছেদ

কারণ–

১. এটি দেখতে আংটির মতো এবং দ্বিস্তরবিশিষ্ট অর্থাৎ **এক্টোডার্ম** ও **এণ্ডোডার্ম** নিয়ে গঠিত।

২. দুইস্তরের মাঝখানে অকোষীয় **মেসোগ্লিয়া** আছে।

৩. কেন্দ্রে গোলাকার **সিলেন্টেরন** উপস্থিত।

৪. এক্টোডার্ম ও এণ্ডোডার্মে বিভিন্ন ধরনের কোষ, যেমন-পেশি-আবরণী, ইন্টারস্টিশিয়াল, গ্রন্থিকোষ, স্নায়ুকোষ, সংবেদী কোষ, নিডোসাইট ইত্যাদি দেখা যায়।

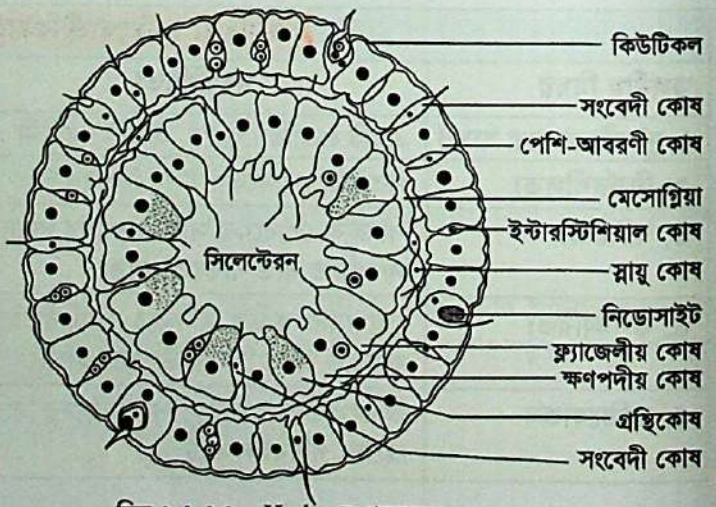

চিত্র ২.১.২৫ : *Hydra*-র প্রস্থচ্ছেদ

www.Educationblog24.Com

লাল-সবুজে দাগানো

TEXT BOOK

প্রাণিবিজ্ঞান

উন্মেষ

মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল এডমিশন কেয়ার

www.Educationblog24.Com

৩ মানব শারীরতত্ত্ব : পরিপাক ও শোষণ
Human Physiology : Digestion & Absorption

মানবদেহের বিভিন্ন জৈবনিক কাজ পরিচালনা, শক্তি সরবরাহ, দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা এবং রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষা করার প্রাথমিক প্রয়োজনীয় শর্ত হচ্ছে পুষ্টি (nutrition)। খাদ্য (food)–ই মানবদেহে পুষ্টির যোগান দেয়। পরিপাক প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রথমে সরল দ্রবণীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার পরে কোষে প্রবেশের উপযোগী হয়। সবশেষে রক্ত এ পরিপাককৃত খাদ্যকে শরীরের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করে।

প্রধান শব্দাবলি (Key words)

- ☐ পরিপাক
- ☐ টায়ালিন
- ☐ পিত্তরস
- ☐ গ্যাস্ট্রিন
- ☐ BMI
- ☐ স্থূলতা

পিরিয়ড সংখ্যা–৭ : এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে (শিখনফল)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. মুখগহ্বরে খাদ্য পরিপাকের যান্ত্রিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে। ২. পাকস্থলির বিভিন্ন অংশে সংঘটিত যান্ত্রিক ও রাসায়নিক পরিপাকের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে। ৩. যকৃতের সঞ্চয়ী ও বিপাকীয় ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. বহিঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে অগ্ন্যাশয়ের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. গ্যাস্ট্রিক জুস নিঃসরণে স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. খাদ্যদ্রব্য পরিপাকে ক্ষুদ্রান্ত্রের বিভিন্ন অংশের মুখ্য ক্রিয়াসমূহ (major actions) বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৭. ক্ষুদ্রান্ত্রের লুমেন থেকে রক্তনালিকা ও ভিলাই পর্যন্ত পরিপাককৃত দ্রব্যের শোষণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. বৃহদন্ত্রের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৯. **ব্যবহারিক :** পরিপাক সংশ্লিষ্ট অঙ্গের কোষসমূহ শনাক্ত ও চিত্র অংকন করতে পারবে। ১০. স্থূলতার ধারণা, কারণ ও প্রতিরোধ ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● মুখগহ্বরে খাদ্য পরিপাক– ○ যান্ত্রিক ○ রাসায়নিক ● পাকস্থলির বিভিন্ন অংশে সংঘটিত পরিপাক– ○ যান্ত্রিক ○ রাসায়নিক ● পরিপাক গ্রন্থির কাজ– ○ যকৃত ○ অগ্ন্যাশয় ● পরিপাকে স্নায়ু ও হরমোনের ভূমিকা ● ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্যদ্রব্যের- ○ পরিপাক ○ শোষণ ● বৃহদন্ত্রের কাজ ● ব্যবহারিক ○ যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়, পাকস্থলি ও ক্ষুদ্রান্ত্রের অনুচ্ছেদ (section) এর স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণ ● স্থূলতা- ○ ধারণা ○ কারণ ○ প্রতিরোধ

পরিপাক (Digestion)

যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জটিল খাদ্যবস্তু বিভিন্ন হরমোনের প্রভাবে ও এনজাইমের সহায়তায় ভেঙ্গে দ্রবণীয় সরল ও তরল এবং দেহকোষের গ্রহণীয় ক্ষুদ্র অণুতে পরিণত হয় তাকে পরিপাক বলে। যে তন্ত্রের মাধ্যমে খাদ্যবস্তুর পরিপাক ও শোষণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে পৌষ্টিকতন্ত্র (digestive system) বলা হয়।

পরিপাক প্রক্রিয়া কতগুলো ধারাবাহিক যান্ত্রিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

১. যান্ত্রিক পরিপাক (Mechanical digestion) : পরিপাকের সময় যে প্রক্রিয়ায় গৃহীত খাদ্যের পরিশোষণযোগ্য অংশ চিবানো, গলাধঃকরণ ও পৌষ্টিকনালি অতিক্রমের সময় নালির বিভিন্ন অংশের পেশল সঞ্চালনের ফলে গাঠনিক ভাঙনের (physical breakdown) মাধ্যমে অতি ক্ষুদ্র টুকরায় পরিণত হয়ে এবং এনজাইমের ক্রিয়াতলের বৃদ্ধি ঘটিয়ে (increases the surface area for the action of the digestive enzymes) সহজ ও সম্ভব করে তোলে তাকে যান্ত্রিক পরিপাক বলে।

২. রাসায়নিক পরিপাক (Chemical digestion) : পরিপাকের সময় গৃহীত খাদ্যের পরিপাকযোগ্য অংশ যান্ত্রিক পরিপাকের পরপরই মুখ, পাকস্থলি ও অন্ত্রে এসিড, ক্ষার ও এনজাইমের সহায়তায় রাসায়নিক ভাঙনের (chemical

www.Educationblog24.Com

breakdown) মাধ্যমে দেহকোষের গ্রহণীয় উপাদানে পরিণত হওয়াকে রাসায়নিক পরিপাক বলে। মানবদেহের পৌষ্টিকতন্ত্র পৌষ্টিকনালি এবং সংশ্লিষ্ট পৌষ্টিকগ্রন্থি নিয়ে গঠিত।

পৌষ্টিকতন্ত্র

পৌষ্টিকনালি

১. মুখছিদ্র
২. মুখগহ্বর
৩. গলবিল (দৈর্ঘ্য-১২.৫ সেমি)
৪. অন্ননালি (দৈর্ঘ্য-২৫ সেমি)
৫. পাকস্থলি (দৈর্ঘ্য-৩০.৫ সেমি, প্রস্থ ১৫.২ সেমি)
   ক. কার্ডিয়া
   খ. ফানডাস
   গ. বড় বাঁক
   ঘ. ছোট বাঁক
   ঙ. পাইলোরাস
৬. ক্ষুদ্রান্ত্র (দৈর্ঘ্য ৬-৭ মিটার)
   ক . ডিওডেনাম
   খ. জেজুনাম
   গ. ইলিয়াম
৭. বৃহদন্ত্র (দৈর্ঘ্য ১.৫ মিটার)
   ক. সিকাম
   খ. কোলন
      i) উর্ধ্বমুখী
      ii) অনুপ্রস্থ
      iii) নিম্নমুখী
      iv) সিগময়েড
   গ. মলাশয়
৮. পায়ু

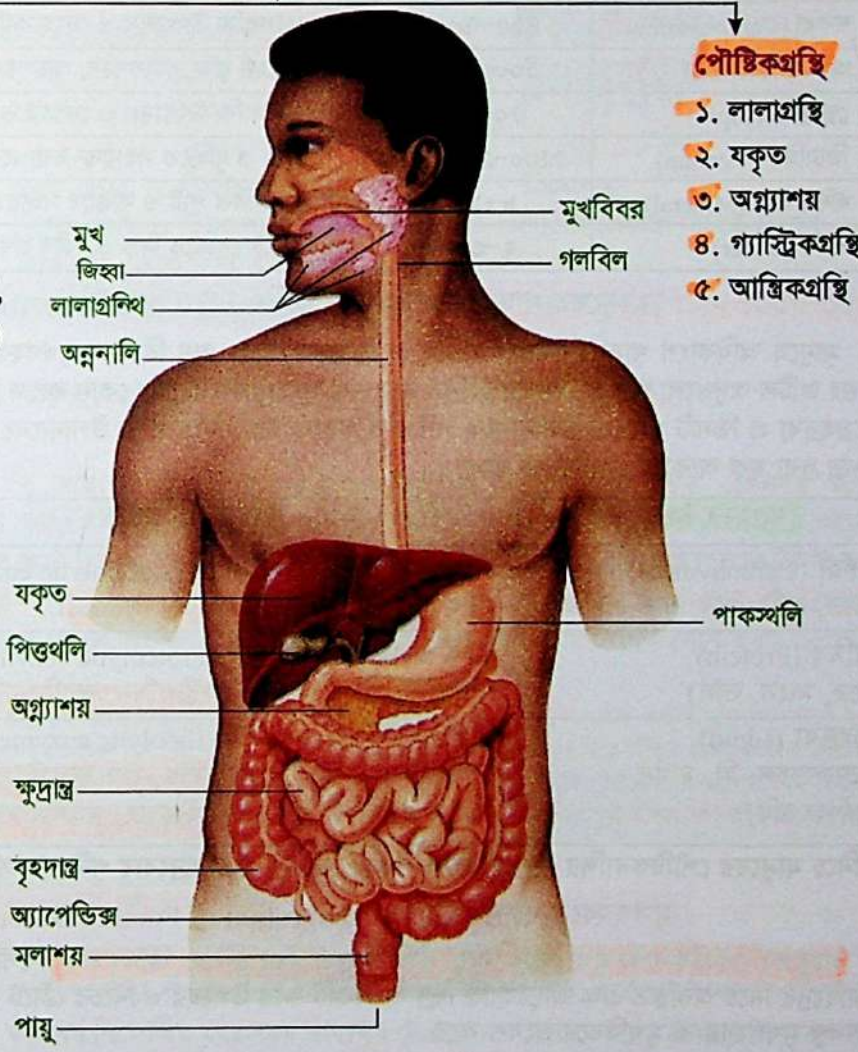

চিত্র ৩.২ : মানুষের পৌষ্টিকতন্ত্র

পৌষ্টিকগ্রন্থি

১. লালাগ্রন্থি
২. যকৃত
৩. অগ্ন্যাশয়
৪. গ্যাস্ট্রিকগ্রন্থি
৫. আন্ত্রিকগ্রন্থি

মানুষের পৌষ্টিকনালিতে বিভিন্ন ধরনের জটিল খাদ্যের পরিপাক নিম্নোক্ত ৬টি ধাপে সম্পন্ন হয়।

১. খাদ্য ও পানি গলাধঃকরণ (Ingestion of food & water)
২. পৌষ্টিকনালিতে খাদ্যের সঞ্চালন (Movement of food along the alimentary canal)
৩. খাদ্যের যান্ত্রিক পরিপাক (Mechanical digestion of food)
৪. খাদ্যের রাসায়নিক পরিপাক (Chemical digestion of food)
৫. পরিপাককৃত খাদ্য ও পানি পরিশোষণ (Absorption of digested food & water)
৬. বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন (Elimination of undigested materials)

মানুষ সর্বভুক (omnivorus) প্রাণী। উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ উভয় ধরনের খাদ্যই এরা গ্রহণ করে থাকে। এদের খাদ্য তালিকায় ছয়টি খাদ্য উপাদানই রয়েছে। তবে শর্করা, আমিষ ও স্নেহজাতীয় খাদ্য জটিল হওয়ার কারণে এগুলো পরিপাকের প্রয়োজন হয়। বাকি তিনটি খাদ্যোপাদান, যেমন–ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি কোষে সরাসরি গৃহীত

www.Educationblog24.Com

হওয়ায় এগুলো পরিপাকের প্রয়োজন হয় না। সঠিক পরিমাণ শর্করা, আমিষ, স্নেহদ্রব্য, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি নিয়ে গঠিত যে খাদ্য কোনো ব্যক্তির স্বাভাবিক পুষ্টি ও প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে, তাকে **সুষম খাদ্য** (balanced diet) বলে। নিচে একজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মানুষের সুষম খাদ্যের তালিকা দেয়া হলো।

খাদ্য উপাদান	পরিমাণ	প্রধান কাজ
১. শর্করা (Carbohydrate)	৪১৫–৬০০ গ্রাম	তাপশক্তি উৎপাদন ও দেহে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি।
২. আমিষ (Protein)	১০০–১৫০ গ্রাম	দেহের বৃদ্ধি, কোষগঠন, ক্ষয়পূরণ, এনজাইম ও হরমোন উৎপাদন।
৩. স্নেহদ্রব্য (Lipid)	৫০–৫৫ গ্রাম	তাপশক্তি উৎপাদন ও দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ।
৪. ভিটামিন (Vitamin)	৫৫০০–৫৬০০ মিলিগ্রাম	পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করা এবং রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়ানো।
৫. খনিজ লবণ (Mineral)	৮–১০ গ্রাম	স্বাভাবিক পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সহায়তা।
৬. পানি (Water)	২–৩ লিটার	প্রোটোপ্লাজমকে সিক্ত ও সজীব রাখা এবং কোষের বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ।

মানুষের খাদ্য পরিপাক প্রণালী (Process of Human Digestion)

মানুষে অধিকাংশ খাদ্য (শর্করা, আমিষ ও স্নেহদ্রব্য) বৃহৎ অণু হিসেবে মুখগহ্বরে গৃহীত হয়। খাদ্যবস্তুর এমন বৃহত্তর জটিল অণুগুলো ক্ষুদ্রতম অণুতে বিশ্লিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত মানবদেহের কোন কাজে আসে না। সেজন্য শর্করা, আমিষ ও স্নেহদ্রব্য এ তিনটি খাদ্যের উপাদানকে পরিপাক করতে হয়। নিচে খাদ্য উপাদানের নাম, পরিপাককারী এনজাইম ও উৎপন্ন দ্রব্য ছক আকারে উপস্থাপিত হলো।

খাদ্যের উপাদান	প্রধান এনজাইম	উৎপন্ন দ্রব্য
শর্করা (Carbohydrate) (ভাত, রুটি, চিনি, শাক-সবজি)	অ্যামাইলোলাইটিক এনজাইম (Amylolytic enzymes) (টায়ালিন, অ্যামাইলেজ, মল্টেজ, সুক্রেজ)	গ্লুকোজ
আমিষ (Protein) (মাছ, মাংস, ডাল)	প্রোটিওলাইটিক এনজাইম (Proteolytic enzymes) (পেপসিন, ট্রিপসিন, কাইমোট্রিপসিন, অ্যামিনোট্রিপসিন)	অ্যামিনো এসিড
স্নেহদ্রব্য (Lipid) (ভোজ্যতেল, ঘি, মাখন, প্রাণিজ চর্বি)	লাইপোলাইটিক এনজাইম (Lipolytic enzymes) (পাকস্থলিয় ও আন্ত্রিক লাইপেজ, ফসফোলাইপেজ, কোলেস্টেরল ও গ্লিসারল এস্টারেজ, লেসিথিনেজ)	ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল

নিচে মানুষের পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন অংশে শর্করা, আমিষ ও স্নেহদ্রব্যের পরিপাক সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

মুখগহ্বরে খাদ্য পরিপাক (Digestion of Food in Buccal Cavity)

মানুষের পৌষ্টিকনালি মুখ থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ৮–১০ মিটার লম্বা। পৌষ্টিকনালির শুরু মুখ থেকে। এটি নাসাছিদ্রের নিচে অবস্থিত এক আড়াআড়ি ছিদ্র যা একটি করে উপরের ও নিচের ঠোঁটে বেষ্টিত থাকে। মুখছিদ্রের মাধ্যমে খাদ্যবস্তু মুখগহ্বর বা মুখবিবরে প্রবেশ করে।

মুখপরবর্তী গহ্বরটি মুখগহ্বর। একে ঘিরে এবং এর ভিতরে কয়েকটি অঙ্গ অবস্থিত। এসব অঙ্গের মধ্যে গাল, দাঁত, মাড়ি, জিহ্বা ও তালু প্রধান।

মুখগহ্বরের উর্ধ্বপ্রাচীর তালুর অস্থি ও পেশি দিয়ে, সামনের প্রাচীর ঠোঁটের পেশি দিয়ে এবং পাশের প্রাচীর গালের পেশি নিয়ে গঠিত। তালুর অগ্রভাগ অস্থিনির্মিত ও শক্ত, পশ্চাৎভাগ পেশল ও নরম। কোমল তালুর পিছনের প্রান্তের মধ্যভাগ থেকে একটি পেশল **আলজিভ** (uvula) মুখগহ্বরে ঝুলে থাকে।

নিম্ন চোয়ালের অস্থির সাথে জিহ্বা যুক্ত থাকে। এর পৃষ্ঠতলে থাকে ফ্লাস্ক আকৃতির **স্বাদকুঁড়ি** (taste buds)। স্বাদকুঁড়িগুলো খাদ্যে অবস্থিত বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বস্তুর প্রতি সংবেদনশীল। যেমন-জিহ্বার অগ্রপ্রান্তে মিষ্টি, অগ্রভাগের দুপাশে নোনা, পশ্চাৎভাগের দুপাশে টক (অম্লতা) এবং পিছন দিকে তিক্ত স্বাদ গ্রহণ করে। ঝাল জাতীয় খাবারের

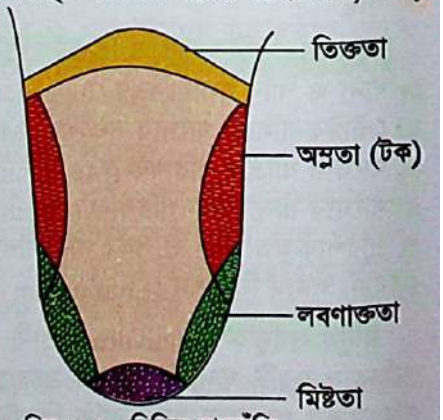

চিত্র ৩.৩ : বিভিন্ন স্বাদকুঁড়ি

www.Educationblog24.Com

অন্য কোন স্বাদকুঁড়ি নাই। তবে ঝালজাতীয় খাদ্য জিহ্বায় জ্বালা (irritation) ঘটায়। পাঁচ-দশ দিনের মধ্যে খাদ্যের ঘসায় স্বাদকুঁড়ি নষ্ট বা ছিন্ন হয়ে যায় এবং প্রতিস্থাপিত হয়।

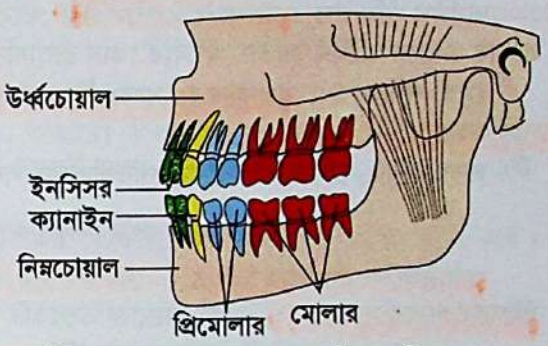

চিত্র ৩. ৪ : মানুষের চোয়ালে দাঁতের বিন্যাস

মানুষের মুখগহ্বরের দুপাশে তিনজোড়া **লালাগ্রন্থি** (salivary gland) অবস্থিত। এগুলো হচ্ছে দুপাশের কানের নিচে **প্যারোটিড গ্রন্থি** (parotid gland), নিচের চোয়ালের ভিতর দিকে **সাবম্যান্ডিবুলার গ্রন্থি** (submandibular gland) এবং জিহ্বার তলায় **সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি** (sublingual gland)। গ্রন্থিগুলো রস ক্ষরণকারী এবং এপিথেলিয়ামে আবৃত গোল বা ডিম্বাকার **থলি** (sac) বিশেষ। থলির প্রাচীরে যে সেরাস কোষ ও মিউকাস কোষ রয়েছে তা থেকে রস ক্ষরিত হয়। লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত **লালা** (saliva) কিছুটা অম্লীয় এবং এর অধিকাংশই পানি (৯৫.৫%-৯৯.৫%)। একজন সুস্থ মানুষ প্রতিদিন ১২০০–১৫০০ মিলিলিটার লালা ক্ষরণ করে।

মুখগহ্বরে খাদ্যবস্তু দুভাবে পরিপাক হয়– যান্ত্রিক (mechanical) ও রাসায়নিক (chemical)।

যান্ত্রিক পরিপাক

- সামান্যতম স্বাদ, গন্ধ ও খাদ্য গ্রহণে স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্ক যে সংকেত পায় তার প্রেক্ষিতে মস্তিষ্ক লালাগ্রন্থিগুলোতে লালা ক্ষরণের বার্তা পাঠায়। লালা মূলত পানিতে গঠিত এবং খাদ্যকে এমনভাবে নরম ও মসৃণ করে যাতে দাঁতের কাজ দ্রুত ও সহজ হয়। তাছাড়া গৃহীত খাদ্যে ব্যাকটেরিয়া থাকলে তাও বিনষ্ট হয়।
- চার ধরনের দাঁত যেমন– **ইনসিসর** (Incisor), **ক্যানাইন** (Canine), **প্রিমোলার** (Pre-molar) ও **মোলার** (Molar)-এর নানা ধরনের কর্মকাণ্ডের ফলে বড় খাদ্যখণ্ড কাটা-ছেঁড়া, পেষণ-নিষ্পেষণ শেষে হজম উপযোগী ছোট ছোট টুকরায় পরিণত হয়।

দন্ত সংকেত (Dental formula) : স্তন্যপায়ী প্রাণিদের মোট দাঁতের সংখ্যা ও ধরণ যে সংকেতের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে দন্ত সংকেত বা **ডেন্টাল ফর্মুলা** বলে। মানুষের চোয়ালে চার ধরনের দাঁত থাকে। একটি সরল রেখার উপর ও নিচে বিভিন্ন প্রকার দাঁতের ইংরেজি নামের প্রথম অক্ষর লিখে ঐ ধরনের দাঁত প্রতি চোয়ালের অর্ধাংশে কয়টি আছে তা লেখা হয়। এরপর প্রতি চোয়ালের অর্ধাংশের মোট দাঁতের সংখ্যাকে ২ দিয়ে গুণ করে উভয় চোয়ালের দাঁতের সংখ্যা যোগ করলে মোট দাঁতের সংখ্যা পাওয়া যায়। এ নিয়ম অনুযায়ী মানুষের দন্ত সংকেত হচ্ছে:

$$\frac{I_2C_1P_2M_3}{I_2C_1P_2M_3} = \frac{8 \times 2}{8 \times 2} = 16 + 16 = 32$$

- জিহ্বা নড়া-চড়া ও সংকোচন-প্রসারণক্ষম পেশল অংশ। এটি স্বাদ নেয়া ছাড়াও দাঁতে আটকে থাকা খাদ্যকণা সরাতে, মুখের চারপাশে ঘুরিয়ে বিভিন্ন দাঁতের নিচে পৌঁছাতে, লালা মিশ্রণে এবং সবশেষে গিলতে সাহায্য করে।
- যান্ত্রিক পরিপাকের সময় খাদ্যখণ্ড নিষ্পেষিত হয়ে নরম **খাদ্যমণ্ড** (bolus)-তে পরিণত হয়। জিহ্বার উপরতল যখন খাদ্যমণ্ডকে **শক্ত তালুর** (hard palate) বিপরীতে রেখে চাপ দেয় তখন খাদ্যমণ্ড পেছন দিকে যেতে বাধ্য হয়।
- পেছনে **কোমল তালু** (soft palate) থাকায় খাদ্যমণ্ড নাসাছিদ্রপথে প্রবেশে বাধা পায়।
- কোমল তালু পার হলেই খাবার গলবিলে এসে পৌঁছায়। গলবিল থেকে দুটি নালি চলে গেছে– একটি **শ্বাসনালি** (trachea), অন্যটি **অন্ননালি** (oesophagus)।
- জিহ্বার গোড়ার দিকে শ্বাসনালির অংশে ছোট উদগত অংশ হিসেবে অবস্থিত **এপিগ্লটিস** (epiglottis) অন্ননালির উপর এমন এক উর্ধ্বগামী বলপ্রয়োগ করে যাতে চিবানো খাদ্য শ্বাসনালির ভিতর প্রবেশ না করে অন্ননালির ভিতর প্রবেশ করে।

রাসায়নিক পরিপাক

শর্করা পরিপাক : লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালারসে **টায়ালিন** ও **মল্টেজ** (অল্প) নামে শর্করাবিশ্লেষী এনজাইম পাওয়া যায়। এগুলো জটিল শর্করাকে মল্টোজ এবং সামান্য মল্টোজকে গ্লুকোজে পরিণত করে। টায়ালিনের ক্রিয়া মুখগহ্বরে শুরু হলেও এর পরিপাক ক্রিয়া সংঘটিত হয় পাকস্থলিতে।

১. জটিল শর্করা $\xrightarrow{\text{টায়ালিন}}$ মল্টোজ। ২. মল্টোজ $\xrightarrow{\text{মল্টেজ}}$ গ্লুকোজ

www.Educationblog24.Com

আমিষ পরিপাক : মুখগহ্বরের লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালারসে প্রোটিওলাইটিক (আমিষ বিশ্লেষী) এনজাইম না থাকায় এখানে আমিষ জাতীয় খাদ্যের কোন রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটেনা।

স্নেহ পরিপাক : মুখগহ্বরে স্নেহজাতীয় খাদ্য পরিপাকের জন্য কোন এনজাইম না থাকায় এধরনের খাদ্যের পরিপাকও ঘটেনা।

লালামিশ্রিত, চর্বিত ও আংশিক পরিপাককৃত শর্করা গলবিল ও অন্ননালির মাধ্যমে পাকস্থলিতে পৌঁছায়।

পাকস্থলিতে খাদ্য পরিপাক (Digestion of Food in Stomach)

পাকস্থলিটি ডায়াফ্রামের নিচে উদরের উপরের অংশে অবস্থিত প্রায় ৩০ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১৫ সেন্টিমিটার চওড়া বাঁকানো থলির মতো অংশ। এটি নিম্নোক্ত কয়েকটি অংশে বিভক্ত –

i. যে অংশে অন্ননালি উন্মুক্ত হয় তা **কার্ডিয়া** (cardia)।

ii. কার্ডিয়ার বাম পাশে পাকস্থলি-প্রাচীর যা গম্বুজাকার ধারণ করে তা **ফানডাস** (fundus)।

iii. ডান অবতল ও বাম উত্তল কিনারা যথাক্রমে **ছোট ও বড় বাঁক** (lesser and greater curvatures)।

iv. যে অংশটি ডিওডেনামে উন্মুক্ত হয়েছে তা **পাইলোরাস** (pylorus) নামে পরিচিত।

কার্ডিয়াক ও পাইলোরিক অংশে একটি করে বৃত্তাকার পেশিবলয় আছে। বলয়দুটি যথাক্রমে **কার্ডিয়াক** ও **পাইলোরিক স্ফিংক্টার**।

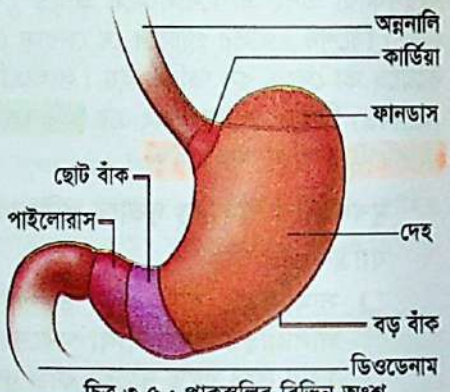

চিত্র ৩.৫ : পাকস্থলির বিভিন্ন অংশ

যান্ত্রিক পরিপাক

- মুখ থেকে চর্বিত খাদ্য অন্ননালিপথে পাকস্থলিতে এসে ২-৬ ঘন্টাকাল অবস্থান করে।
- এসময় প্যারাইটাল কোষ থেকে HCl ক্ষরিত হয়ে খাদ্য বাহিত অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে দেয়।
- মসৃণ পেশির ৩টি স্তর নিয়ে পাকস্থলি গঠিত। পেশিস্তর বিভিন্ন দিকমুখি হওয়ায় পাকস্থলি প্রাচীর নানাদিকে সঞ্চালিত হয়ে (মোচড় দিয়ে, সংকুচিত হয়ে কিংবা চাপা হয়ে) মুখগহ্বর থেকে আসা অর্ধচূর্ণ খাদ্যকে পিষে **পেস্ট** (paste)-এ পরিণত করে।
- এসময় **গ্যাস্ট্রিক জুস** (gastric juice) ক্ষরিত হয়ে পাকস্থলির যান্ত্রিক চাপে পিষ্ট খাদ্যের সঙ্গে মিশে ঘন স্যুপের মতো মিশ্রণে পরিণত হয়। খাদ্যের এ অবস্থা **কাইম** (chyme) বা **মন্ড** নামে পরিচিত। এর উপর গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি নিঃসৃত বিভিন্ন এনজাইমের পরিপাক কাজ শুরু হয়ে যায়।

রাসায়নিক পরিপাক

পাকস্থলির প্রাচীর পেশিবহুল এবং **গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি** (gastric gland) সমৃদ্ধ। গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি এক ধরনের নলাকার গ্রন্থি এবং চার ধরনের কোষে গঠিত। প্রত্যেক ধরনের কোষের ক্ষরণ আলাদা। সম্মিলিতভাবে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির ক্ষরণকে ''গ্যাস্ট্রিক জুস'' বলে। এর ৯৯.৪৫%ই পানি। **গ্যাস্ট্রিন** (gastrin) নামক হরমোন এ জুস ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

শর্করা পরিপাক : পাকস্থলি থেকে শর্করাবিশ্লেষী কোন এনজাইম নিঃসৃত হয় না। ফলে শর্করা জাতীয় খাদ্যের কোন পরিবর্তন ঘটে না।

আমিষ পরিপাক : গ্যাস্ট্রিক জুসে **পেপসিনোজেন** ও **প্রোরেনিন** নামক নিষ্ক্রিয় প্রোটিওলাইটিক (আমিষ বিশ্লেষী) এনজাইম থাকে। এ দুটি নিষ্ক্রিয় এনজাইম গ্যাস্ট্রিক জুসের HCl-এর সাথে বিক্রিয়া করে যথাক্রমে **পেপসিন** ও **রেনিন** নামক সক্রিয় এনজাইমে পরিণত হয়। পেপসিন অম্লীয় মাধ্যমে জটিল আমিষের আর্দ্র বিশ্লেষণ ঘটিয়ে প্রোটিওজ ও পেপটোন-এ পরিণত করে। রেনিন দুগ্ধ আমিষ কেসিনকে প্যারাকেসিনে পরিণত করে।

১. আমিষ + পানি $\xrightarrow{\text{পেপসিন}}$ প্রোটিওজ + পেপটোন

২. কেসিন (দুগ্ধ আমিষ)+ পানি $\xrightarrow{\text{রেনিন}}$ প্যারাকেসিন

৩. প্যারাকেসিন $\xrightarrow{\text{পেপসিন}}$ পেপটোন

স্নেহ পরিপাক : অম্লীয় মাধ্যমে স্নেহ বিশ্লিষ্টকারী এনজাইম কাজ করতে পারে না কিন্তু পাকস্থলিতে **গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ** নামক খুব দুর্বল স্নেহ বিশ্লিষ্টকারী এনজাইম থাকে। লাইপোলাইটিক (স্নেহ বিশ্লিষ্টকারী) এনজাইমের মধ্যে এরা ব্যতিক্রম এ অর্থে যে, এগুলো একমাত্র অম্লীয় মাধ্যমে কাজ করতে সক্ষম। এ এনজাইমটি কেবল মাখনের চর্বির (butter fat) উপর কাজ করে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

www.Educationblog24.Com

অর্ধপাচিত এ খাদ্য ধীরে ধীরে ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে। পাকস্থলির পাইলোরিক প্রান্তে অবস্থিত স্ফিংক্টার (sphincter = পেশির বেড়ী যা ছিদ্রপথকে বেষ্টন করে থাকে) পাকস্থলি থেকে ডিওডেনামে খাদ্যের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে।

পাকস্থলি নিজেই এনজাইম দ্বারা পরিপাক হয়ে যায় না। কারণ–

পাকস্থলির সমগ্র অন্তর্গাত্র গ্যাস্ট্রিক মিউকোসা (এপিথেলিয়াল আবরণ)–য় আবৃত। এ আবরণ HCl, মিউকাস, বিভিন্ন প্রোএনজাইম ও বাইকার্বোনেট ক্ষরণ করে। পাকস্থলি যেন নিজেই হজম হয়ে না যায় সেকারণে নিম্নোক্ত ৪টি প্রক্রিয়া ঘটতে দেখা যায় :

১. পাকস্থলির অন্তর্গাত্র থেকে নিঃসৃত পুরু মিউকাস স্তর HCl এর আক্রমণ রোধকারী ভৌত প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে।
২. পাকস্থলির অন্তর্গাত্র থেকে ক্ষরিত বাইকার্বনেট প্রকৃতপক্ষে একটি বেস এবং এটি HCl কে প্রশমিত করে।
৩. এনজাইম পেপসিন প্রথমে পেপসিনোজেন নামক প্রোএনজাইম হিসেবে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ক্ষরিত হয়। HCl এর সংস্পর্শে এলে এটি সক্রিয় পেপসিনে পরিণত হয়।
৪. পাকস্থলির অন্তঃস্থ এপেথেলিয়ামের কোষগুলো ঘন সংলগ্ন থাকায় ও দৃঢ় সংবদ্ধ থাকায় HCl কিছুতেই এপিথেলিয়ামের ক্ষতি করতে পারেনা।

এভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় পাকস্থলির প্রোটিন নির্মিত অন্তঃপ্রাচীর কখনওই নিজের ক্ষরণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়না। তবে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার (*Helicobacter pylori*) সংক্রমণে কিংবা NSAID ধরনের ওষুধের প্রভাবে পাকস্থলিতে ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে যা গ্যাস্ট্রিক আলসার নামে বহুল পরিচিত।

ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্যদ্রব্যের পরিপাক (Digestion of Food in Small Intestine)

পাকস্থলির পাইলোরিক স্ফিংক্টারের পর থেকে বৃহদন্ত্রের সূচনায় ইলিওকোলিক স্ফিংক্টার (iliocolic sphincter) পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় ৬-৭ মিটার লম্বা, প্যাঁচানো অংশকে ক্ষুদ্রান্ত্র বলে। ক্ষুদ্রান্ত্র তিনটি অংশে বিভক্ত, যথা ডিওডেনাম (duodenum), জেজুনাম (jejunum) এবং ইলিয়াম (ileum)। ডিওডেনাম হচ্ছে ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশ যা দেখতে "U"-আকৃতির ও ২৫-৩০ সেন্টিমিটার লম্বা। জেজুনাম মধ্যাংশ, লম্বায় আড়াই মিটার। শেষ অংশটি ইলিয়াম যা ক্ষুদ্রান্ত্রের তিন-পঞ্চমাংশ গঠন করে।

সব ধরনের খাদ্যের চূড়ান্ত পরিপাক ক্ষুদ্রান্ত্রেই সংঘটিত হয়। খাদ্যের উপর তিন ধরনের রস, যেমন-পিত্তরস (bile), অগ্ন্যাশয় রস (pancreatic juice) ও আন্ত্রিক রস (intestinal juice) ক্রিয়াশীল।

যান্ত্রিক পরিপাক

- আন্ত্রিক রসের মিউসিনের ক্রিয়ায় ক্ষুদ্রান্ত্রে অবস্থিত খাদ্যবস্তু পিচ্ছিল হয়ে স্থানান্তরিত হয়।
- ব্রুনার্স গ্রন্থি (brunner's gland) ও গবলেট কোষ (goblet cell) থেকে মিউকাস উৎপন্ন হয়। মিউকাস ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীরকে এনজাইমের কার্যকারিতা থেকে রক্ষা করে।
- পিত্তরস পরোক্ষভাবে অন্ত্রে জীবাণুর কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয়।
- পিত্তলবণগুলো ক্ষুদ্রান্ত্রের পেশির ক্রমসংকোচন বাড়িয়ে বৃহদন্ত্রের দিকে খাদ্যের গতি বৃদ্ধি করে।
- কোলেসিস্টোকাইনিন (cholecystokinin) নামক হরমোন পিত্তাশয়ের সংকোচন ঘটিয়ে পিত্তাশয়ে সঞ্চিত পিত্তরস ক্ষুদ্রান্ত্রে পৌঁছে দেয়।
- পিত্তলবণ স্নেহদ্রব্যকে অবদ্রবণের মাধ্যমে (emulsification) সাবানের ফেনার মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করে।

রাসায়নিক পরিপাক

পাকস্থলি থেকে আগত অম্লীয় কাইম (chyme) অর্ধ-পাচিত শর্করা ও আমিষ এবং প্রায় অপরিপাককৃত স্নেহদ্রব্য নিয়ে গঠিত। কাইম ক্ষুদ্রান্ত্রের গহ্বরে পৌঁছালে অন্ত্রের প্রাচীর থেকে এন্টেরোকাইনিন (enterokinin), সিক্রেটিন (secretin) ও কোলেসিস্টোকাইনিন (cholecystokinin) নামক হরমোন ক্ষরিত হয়। এসব হরমোনের প্রভাবে পিত্তথলি, অগ্ন্যাশয় ও আন্ত্রিক গ্রন্থি থেকে যথাক্রমে পিত্তরস, অগ্ন্যাশয় রস ও আন্ত্রিক রস নিঃসৃত হয়।

পিত্তরস ক্ষার জাতীয় তরল পদার্থ। এতে কোন এনজাইম থাকে না। পিত্তরসের সোডিয়াম বাইকার্বোনেট উপাদানটি পাকস্থলি থেকে আগত HCl–কে প্রশমিত করে অন্ত্রের অভ্যন্তরে একটি ক্ষারীয় মাধ্যম তৈরি করে যা ক্ষুদ্রান্ত্রে বিভিন্ন এনজাইমের কার্যকারিতার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

শর্করা পরিপাক

অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত রসে শর্করা পরিপাকের জন্য নিচে বর্ণিত এনজাইমগুলো ক্রিয়াশীল হয়।

১. অ্যামাইলেজ এনজাইম স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন জাতীয় জটিল শর্করাকে মল্টোজে পরিণত করে।

স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন $\xrightarrow{\text{অ্যামাইলেজ}}$ মল্টোজ।

www.Educationblog24.Com

২. **মল্টেজ** এনজাইম মল্টোজ জাতীয় শর্করাকে গ্লুকোজে পরিণত করে।

মল্টোজ $\xrightarrow{\text{মল্টেজ}}$ গ্লুকোজ।

আন্ত্রিক রসে শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাককারী নিম্নোক্ত এনজাইমগুলো ক্রিয়াশীল থাকে:

১. আন্ত্রিক **অ্যামাইলেজ** স্টার্চ, ডেক্সট্রিন প্রভৃতি পলিস্যাকারাইডকে আর্দ্রবিশ্লিষ্ট করে মল্টোজ, মল্টোট্রায়োজ ও ক্ষুদ্র ডেক্সট্রিন উৎপন্ন করে।

স্টার্চ, ডেক্সট্রিন + H_2O $\xrightarrow{\text{অ্যামাইলেজ}}$ মল্টোজ, মল্টোট্রায়োজ, ক্ষুদ্র ডেক্সট্রিন।

২. **আইসোমল্টেজ** এনজাইম আইসোমল্টোজ জাতীয় শর্করাকে আর্দ্রবিশ্লিষ্ট করে মল্টোজ ও গ্লুকোজ উৎপন্ন করে।

আইসোমল্টোজ + H_2O $\xrightarrow{\text{আইসোমল্টেজ}}$ মল্টোজ + গ্লুকোজ।

৩. **মল্টেজ** এনজাইম মল্টোজকে বিশ্লিষ্ট করে গ্লুকোজ তৈরি করে।

মল্টোজ + H_2O $\xrightarrow{\text{মল্টেজ}}$ মল্টোজ + গ্লুকোজ।

৪. **সুক্রেজ** এনজাইম সুক্রোজ নামক ডাইস্যাকারাইডকে ভেঙে এক অণু গ্লুকোজ ও এক অণু ফ্রুক্টোজ সৃষ্টি করে।

সুক্রোজ + H_2O $\xrightarrow{\text{সুক্রেজ}}$ গ্লুকোজ + ফ্রুক্টোজ।

৫. **ল্যাক্টেজ** এনজাইম দুধের ল্যাক্টোজ নামক ডাই-স্যাকারাইডকে ভেঙে এক অণু গ্লুকোজ ও এক অণু গ্যালাক্টোজে পরিণত করে।

ল্যাক্টোজ + H_2O $\xrightarrow{\text{ল্যাক্টেজ}}$ গ্লুকোজ + গ্যালাক্টোজ।

আমিষ পরিপাক

অগ্ন্যাশয় রসে অবস্থিত এনজাইম আমিষ জাতীয় খাদ্যের উপর নিম্নোক্তভাবে ক্রিয়াশীল হয়।

১. **ট্রিপসিন** এনজাইম নিষ্ক্রিয় ট্রিপসিনোজেনরূপে ক্ষরিত হয়। ডিওডেনামের মিউকোসা নিঃসৃত **এন্টেরোকাইনেজ** এনজাইমের সহায়তায় এটি সক্রিয় ট্রিপসিনে পরিণত হয়। ট্রিপসিন প্রোটিওজ ও পেপটোন জাতীয় আমিষকে ভেঙ্গে পলিপেপটাইডে পরিণত করে।

প্রোটিওজ ও পেপটোন $\xrightarrow{\text{ট্রিপসিন}}$ পলিপেপটাইড।

২. **কাইমোট্রিপসিন** নিষ্ক্রিয় কাইমোট্রিপসিনোজেনরূপে ক্ষরিত হয়। পরে ট্রিপসিনের ক্রিয়ায় এটি সক্রিয় কাইমোট্রিপসিনে পরিণত হয়। এটি প্রোটিওজ ও পেপটোনকে ভেঙে পলিপেপটাইডে পরিণত হয়।

প্রোটিওজ ও পেপটোন $\xrightarrow{\text{কাইমোট্রিপসিন}}$ পলিপেপটাইড।

৩. **কার্বোক্সিপেপটাইডেজ** এনজাইম পলিপেপটাইডের প্রান্তীয় লিঙ্কেজকে সরল পেপটাইড (ডাইপেপটাইড) ও অ্যামিনো এসিডে রূপান্তরিত করে।

পলিপেপটাইড $\xrightarrow{\text{কার্বোক্সিপেপটাইডেজ}}$ ডাইপেপটাইড + অ্যামিনো এসিড।

৪. **অ্যামিনোপেপটাইডেজ** এনজাইম পলিপেপটাইডকে ভেঙে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।

পলিপেপটাইড $\xrightarrow{\text{অ্যামিনোপেপটাইডেজ}}$ অ্যামিনো এসিড।

৫. **ট্রাইপেপটাইডেজ** এনজাইম ট্রাইপেপটাইডকে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।

ট্রাইপেপটাইড $\xrightarrow{\text{ট্রাইপেপটাইডেজ}}$ অ্যামিনো এসিড।

৬. **ডাইপেপটাইডেজ** এনজাইম ডাইপেপটাইডকে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।

ডাইপেপটাইড $\xrightarrow{\text{ডাইপেপটাইডেজ}}$ অ্যামিনো এসিড।

৭. **কোলাজিনেজ** এনজাইম মাছ ও মাংসে বিদ্যমান কোলাজেন জাতীয় প্রোটিনকে সরল পেপটাইডে রূপান্তরিত করে।

কোলাজেন $\xrightarrow{\text{কোলাজিনেজ}}$ সরল পেপটাইড।

৮. **ইলাস্টেজ** এনজাইম যোজক টিস্যুর প্রোটিন ইলাস্টিনকে ভেঙে পেপটাইড উৎপন্ন করে।

ইলাস্টিন $\xrightarrow{\text{ইলাস্টেজ}}$ পেপটাইড।

আন্ত্রিক রসে আমিষ পরিপাককারী এনজাইম **অ্যামিনোপেপটাইডেজ** পলিপেপটাইডকে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।

পলিপেপটাইড $\xrightarrow{\text{অ্যামিনোপেপটাইডেজ}}$ অ্যামিনো এসিড।

www.Educationblog24.Com

স্নেহ পরিপাক

স্নেহ পরিপাকে **পিত্তরস** গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পিত্তরসে কোন এনজাইম থাকে না। পিত্তরসে অবস্থিত পিত্তলবণ, যেমন– **সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট** (sodium glycocholate) ও **সোডিয়াম টরোকোলেট** (sodium taurocholate) স্নেহ জাতীয় খাদ্যকে ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করে। এ প্রক্রিয়াকে **অবদ্রবণ বা ইমালসিফিকেশন** (emulsification) বলে।

অগ্ন্যাশয় রসে স্নেহজাতীয় খাদ্য পরিপাককারী এনজাইম স্নেহকণা পরিপাকে নিম্নোক্তভাবে ক্রিয়াশীল হয়:

১. **লাইপেজ** নামের এনজাইম স্নেহকণাকে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে পরিণত করে।

স্নেহকণা $\xrightarrow{\text{লাইপেজ}}$ ফ্যাটি এসিড + গ্লিসারল।

২. **ফসফোলাইপেজ** এনজাইম ফসফোলিপিডকে ফ্যাটি এসিড, গ্লিসারল ও ফসফোরিক এসিডে পরিণত করে।

ফসফোলিপিড $\xrightarrow{\text{ফসফোলাইপেজ}}$ ফ্যাটি এসিড + গ্লিসারল + ফসফোরিক এসিড।

৩. **কোলেস্টেরল এস্টারেজ** এনজাইম কোলেস্টেরল এস্টারের উপর ক্রিয়াশীল হয়ে ফ্যাটি এসিড ও কোলেস্টেরল উৎপন্ন করে।

কোলেস্টেরল এস্টার $\xrightarrow{\text{কোলেস্টেরল এস্টারেজ}}$ ফ্যাটি এসিড + কোলেস্টেরল।

আন্ত্রিক রসে নিম্নলিখিত স্নেহ পরিপাককারী এনজাইম ক্রিয়াশীল হয় :

১. **লাইপেজ** এনজাইম পিত্তলবণের প্রভাবে স্নেহকণায় পরিণত হওয়া লিপিডকে আর্দ্রবিশিষ্ট করে মনোগ্লিসারাইড ও ফ্যাটি এসিড উৎপন্ন করে। পরবর্তীতে তা ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে রূপান্তরিত হয়।

স্নেহকণা $\xrightarrow{\text{লাইপেজ}}$ মনোগ্লিসারাইড + ফ্যাটি এসিড।

২. **লেসিথিনেজ** এনজাইম লেসিথিনকে ফ্যাটি এসিড, গ্লিসারল, ফসফরিক এসিড ও কোলিনে পরিণত করে।

লেসিথিন $\xrightarrow{\text{লেসিথিনেজ}}$ ফ্যাটি এসিড + গ্লিসারল + ফসফরিক এসিড + কোলিন।

৩. **মনোগ্লিসারাইডেজ** কোষের ভিতরে মনোগ্লিসারাইডকে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে পরিণত করে।

মনোগ্লিসারাইড $\xrightarrow{\text{মনোগ্লিসারাইডেজ}}$ ফ্যাটি এসিড + গ্লিসারল।

এছাড়াও আন্ত্রিক গ্রন্থির নিউক্লিয়েডেজ, নিউক্লিওটাইডেজ ও নিউক্লিওসাইডেজ এনজাইমসমূহ নিউক্লিক এসিড ও এর উপাদানগুলোকে ফসফেট গ্রুপ, পেন্টোজ শ্যুগার ও নাইট্রোজেন বেস-এ বিশ্লিষ্ট করে।

পরিপাক গ্রন্থির ভূমিকা (Role of Digestive Glands)

পৌষ্টিকতন্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট যেসব গ্রন্থি থেকে বিভিন্ন রস নিঃসৃত হয়ে খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে যেগুলোকে **পৌষ্টিকগ্রন্থি বা পরিপাক গ্রন্থি** বলে। মানবদেহে পাঁচ ধরনের পৌষ্টিকগ্রন্থি রয়েছে, যথা- **লালাগ্রন্থি, যকৃত, অগ্ন্যাশয়, গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি ও আন্ত্রিক গ্রন্থি**। এসব গ্রন্থির মধ্যে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি পাকস্থলির প্রাচীরে এবং আন্ত্রিক গ্রন্থি অন্ত্রের প্রাচীরে অবস্থান করে। অন্য গ্রন্থিগুলো পৌষ্টিকনালির বাইরে অবস্থিত এবং স্বতন্ত্র গঠনবিশিষ্ট। নিচে বিভিন্ন পৌষ্টিকগ্রন্থির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

১. লালাগ্রন্থি (Salivary glands)

মানুষের মুখগহ্বরের দুপাশে নিচে বর্ণিত তিনজোড়া লালাগ্রন্থি অবস্থিত। এগুলো হচ্ছে –

ক. প্যারোটিড গ্রন্থি (Parotid gland) : এগুলো সবচেয়ে বড় লালাগ্রন্থি। প্রতি কানের নিচে রয়েছে একটি করে মোট দুটি প্যারোটিড গ্রন্থি। প্রত্যেক গ্রন্থি থেকে একটি নালি বেরিয়ে দ্বিতীয় উর্ধ্বমোলার দাঁতের বিপরীতে মুখগহ্বরে উন্মুক্ত হয়।

খ. সাবম্যান্ডিবুলার গ্রন্থি (Submandibular gland) : প্রতি ম্যান্ডিবল বা নিম্ন চোয়ালের কৌণিক অঞ্চলের নিচে একটি করে মোট একজোড়া সাবম্যান্ডিবুলার গ্রন্থি বিদ্যমান। এ গ্রন্থির নালি জিহ্বার নিচে **ফ্রেনুলাম** (frenulum) নামক বিশেষ ত্বকের পাশে উন্মুক্ত হয়।

চিত্র ৩.৬ : মানুষের লালাগ্রন্থিসমূহ

www.Educationblog24.Com

গ. সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি (Sublingual gland) : জিহ্বার নিচে অবস্থান করে একজোড়া সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি। এদের নালি জিহ্বার নিচে ফ্রেনুলামে উন্মুক্ত হয়।

লালা (Saliva) : লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসকে লালা বা লালারস বলে। একজন সুস্থ মানুষ দৈনিক ১২০০ – ১৫০০ মিলি লিটার লালা ক্ষরণ করে। লালা সামান্য অম্লীয়, ফলে মুখগহ্বরে সবসময় pH 6.2-7.4 মাত্রায় আম্লিক অবস্থা বিরাজ করে।

লালার উপাদান (Composition of saliva)

১. পানি: ৯৫.৫% – ৯৯.৫%।
২. কোষীয় উপাদান : ঈস্ট, ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া, লিউকোসাইট, এপিথেলিয়াল কোষ ইত্যাদি।
৩. গ্যাস : প্রতি ১০০ মিলি লালায় ১ মিলি অক্সিজেন, ২৫ মিলি নাইট্রোজেন এবং ৫০ মিলি কার্বন ডাইঅক্সাইড দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে।
৪. অজৈব পদার্থ : প্রায় ০.২%; সোডিয়াম ক্লোরাইড, পটাসিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম ফসফেট, ক্যালসিয়াম ফসফেট, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, পটাসিয়াম থায়োসায়ানেট ইত্যাদি।
৫. জৈব পদার্থ: প্রায় ০.৩%; এনজাইম (টায়ালিন, লাইপেজ, কার্বনিক এনহাইড্রেজ, ফসফেটেজ, ব্যাকটেরিও -লাইটিক এনজাইম ইত্যাদি), মিউসিন, ইউরিয়া, অ্যামিনো এসিড, কোলেস্টেরল, ভিটামিন, অ্যান্টিজেন, অ্যান্টিবডি ইত্যাদি।

লালার কাজ (Functions of saliva)

i. লালার অধিকাংশই পানি। খাদ্যের স্বাদ অনুভব এবং পরিপাকের সময় বিক্রিয়া ঘটানোর জন্য পানি খাদ্যের দ্রাবক হিসেবে খাদ্যকে ভিজিয়ে নরম করে। পানি মুখ অভ্যন্তরকেও আর্দ্র করে, ফলে স্বাদ অনুভবসহ খাদ্য চিবানো ও গিলতে সুবিধা হয়। জিহ্বার স্বাদকুঁড়িগুলো শুকনো খাদ্যে প্রভাবিত হয় না। লালায় ভিজে খাদ্যকণা মুক্ত হলে তা থেকে স্বাদকুঁড়িগুলো অনুভূতি গ্রহণের মাধ্যমে খাদ্যের স্বাদ উপলব্ধি সম্ভব হয়।

ii. মুখ, জিহ্বা ও ঠোঁট লালায় সিক্ত থাকার কারণে কথা বলতে সহজ হয়। ভয়, উত্তেজনা ইত্যাদি সময়ে কিংবা অসুখের সময় লালাক্ষরণ কমে যায়। তখন কথা বলতে অসুবিধা হয়।

iii. মিউসিন নামক গ্লাইকোপ্রোটিন খাদ্যের সঙ্গে মিশে পিচ্ছিল খাদ্যকে দলায় পরিণত করে। লালা খাদ্য চর্বণ এবং গলাধঃকরণে সহায়ক। এসিড ও বেসকে প্রশমন (বাফার) করতেও এটি সাহায্য করে।

iv. ক্লোরাইড (Chloride) : স্যালিভারি অ্যামাইলেজকে সক্রিয় করে।

v. স্যালিভারি অ্যামাইলেজ বা টায়ালিন এনজাইম (Salivary amylase or Ptyaline): রান্না করা স্টার্চের পলিস্যাকারাইডকে ভেঙ্গে মলটোজ এবং ডেক্সট্রিন নামক ডাইস্যাকারাইডে পরিণত করে।

vi. বাইকার্বনেট (Bicarbonate) : লালার অম্লতা pH 6.2 – 7.4 এর মধ্যে বজায় রাখতে সাহায্য করে। এটি বাফার (buffer) হিসেবে কাজ করে। ফলে মুখে সৃষ্ট এসিডের শক্তি কমিয়ে রাখার মাধ্যমে দাঁতের এনামেল ক্ষয় রোধ করে।

vii. লাইসোজাইম এনজাইম (Lysozyme enzyme) : গৃহীত খাদ্যের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসের মাধ্যমে দাঁতকে রক্ষা করে।

viii. ইম্যুনোগ্লোবুলিন (Immunoglobulin) : লালা হচ্ছে এন্টিব্যাকটেরিয়াল সিস্টেমের অংশ।

ix. লালা সামগ্রিকভাবে মুখ অভ্যন্তর এবং দাঁত থেকে কোষীয় ও খাদ্যের ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার করে, এবং মুখের নরম অংশের সংবেদনশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

২. যকৃত (Liver)

অবস্থান : যকৃত উদর-গহ্বরের উপরভাগে ডানদিকে ডায়াফ্রামের ঠিক নিচে ডিওডেনাম ও ডান বৃক্কের উপরদিকে পাকস্থলির ডান পাশে অবস্থিত।

গঠন : যকৃত মানবদেহের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থি। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মানুষে এর ওজন প্রায় ১.৫–২.০০

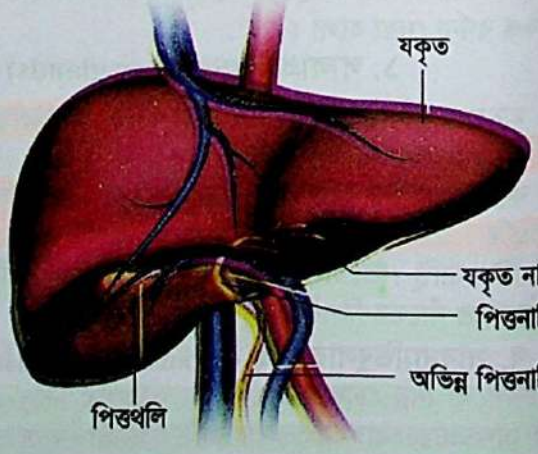

চিত্র ৩.৭ : মানুষের যকৃত

www.Educationblog24.Com

কেজি। ডান, বাম, কোয়াড্রেট ও কডেট নামে ৪টি অসম্পূর্ণ খণ্ড নিয়ে যকৃত গঠিত। খণ্ডগুলো স্থিতিস্থাপক তন্তুসমৃদ্ধ ক্যাপসুলে আবৃত। ডান খণ্ডটি সবচেয়ে বড়। যকৃতের নিচের পিঠে **পিত্তথলি** (gall bladder) সংলগ্ন থাকে। প্রত্যেক খণ্ড বহুভূজাকার কোষে গঠিত। কোষগুলো একেকটি ক্ষুদ্র অণুখণ্ড নির্মাণ করে। প্রত্যেক অণুখণ্ডের কেন্দ্রে থাকে **কেন্দ্রীয় শিরা** (central vein)। যকৃত কোষগুলো চাকার স্পোকের মতো বিন্যস্ত। কোষগুলোর গা বেয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র **সাইনুসয়েড** (sinusoid) ও **পিত্তনালিকা** প্রসারিত হয়। পিত্তনালিকাগুলো পিত্তনালিতে গিয়ে শেষ হয়। যকৃত থেকে আসা ডান ও বাম **যকৃত নালি** মিলে একটি **অভিন্ন যকৃত নালি** গঠন করে। এটি পিত্তনালির সাথে মিলিত হয়ে **অভিন্ন পিত্তনালি** গঠন করে যা **অ্যাম্পুলা অব ভ্যাটার** (ampulla of vater) নামে নালির মাধ্যমে ডিওডেনামে উন্মুক্ত হয়।

যকৃতের সঞ্চয়ী ও বিপাকীয় ভূমিকা (Storage & Metabolic Role of Liver)

মানবদেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি হচ্ছে যকৃত যা দেহের ওজনের প্রায় ৩–৫%। এটি মূলত পরিবর্তনশীল বাহ্যিক অবস্থা সত্ত্বেও দেহের অভ্যন্তরীণ স্থিতি বা সাম্য রক্ষাকারী গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। যকৃতে নানা ধরনের জৈব রাসায়নিক (bio-chemical) বিক্রিয়া সংঘটিত হয় যা দেহের **বিপাক** (metabolism) ক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ জন্য একে মানবদেহের **জৈব রসায়নাগার** (organic laboratory) বলা হয়। যকৃত প্রায় পাঁচ শতাধিক জৈবনিক কাজ সম্পন্ন করে থাকে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। নিচে যকৃতের সঞ্চয়ী ও বিপাকীয় ভূমিকা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

যকৃতের সঞ্চয়ী ভূমিকা (Storage functions of Liver)

নিচে যকৃতের সঞ্চয়ী ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. **গ্লাইকোজেন সঞ্চয়** (Storage of Glycogen) : ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে হেপাটিক পোর্টাল শিরার মাধ্যমে গ্লুকোজ যকৃতে প্রবেশ করে। রক্তের অতিরিক্ত গ্লুকোজ **গ্লাইকোজেনেসিস** (glycogenesis) প্রক্রিয়ায় গ্লাইকোজেন-এ রূপান্তরিত হয়ে যকৃতের সঞ্চয়ী কোষে জমা থাকে। **ইনসুলিন** (insulin) নামক হরমোন এ প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে। প্রয়োজনে এ গ্লাইকোজেন ভেঙ্গে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা ঠিক রাখে।

২. **রক্ত সঞ্চয়** (Blood reservoir) : প্লীহা ও অন্ত্র থেকে বেরিয়ে রক্তবাহিকাগুলো মিলিত হয়ে **হেপাটিক পোর্টাল শিরা** গঠন করে। যকৃতের ভিতর দিয়ে রক্ত যদিও অনবরত প্রবাহিত হয় তারপরও এর রক্তবাহিকাগুলোসহ এ শিরা বিপুল পরিমাণ রক্তের **ভান্ডার** (reservoir) হিসেবে কাজ করে। যকৃত প্রায় ১৫০০ ঘন সে.মি. পর্যন্ত রক্ত সঞ্চয় করে রাখতে পারে যা দেহের বিভিন্ন রক্তক্ষরণজনিত ঘটনায় মূল রক্তসংবহনের সাথে মিলিত হয়ে রক্তচাপের সমন্বয় ঘটায়।

৩. **ভিটামিন সঞ্চয়** (Storage of Vitamins) : যকৃত স্নেহে (fat) দ্রবণীয় ভিটামিনসমূহ (A, D, E, K), পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন (B ও C), সায়ানো কোবালামিন (B_{12}) এবং ফলিক এসিড সঞ্চয় করে। B_{12} এবং ফলিক এসিড অস্থিমজ্জায় লোহিত কণিকা তৈরিতে প্রয়োজন হয়।

৪. **পিত্তরস তৈরি** (Production of Bile) : যকৃত কর্তৃক উৎপন্ন **পিত্তরস** (bile) যকৃতের ডান খন্ডাংশের নিচে অবস্থিত পিত্তথলিতে (gall bladder) জমা থাকে।

৫. **চর্বি ও অ্যামিনো এসিড সঞ্চয়** (Storage of Fat & Amino acid) : যে শর্করা (গ্লুকোজ) দেহে ব্যবহৃত হতে পারে না বা গ্লাইকোজেন হিসেবে সঞ্চিত থাকে না, যকৃত সেই অতিরিক্ত গ্লুকোজকে চর্বিতে পরিণত করে জমা রাখে। যকৃত অ্যামিনো এসিডও জমা রাখে। দেহের প্রয়োজনে চর্বি এবং অ্যামিনো এসিড ব্যবহারযোগ্য গ্লুকোজে পরিবর্তিত হয়।

৬. **মিনারেল সঞ্চয়** (Storage of Mineral) : যকৃত লৌহ ও পটাসিয়াম সঞ্চয় করে। লোহিত রক্ত কণিকার ভাঙনে হিমোগ্লোবিন যকৃতের **কাপফার** (Kupffer) কোষের মাধ্যমে **হিম** (haem) ও **গ্লোবিন** (globin)-এ পরিণত হয়। হিমের লৌহ অংশ **ফেরিটিন** (ferritin) হিসেবে যকৃতে জমা থাকে। এছাড়াও কপার, জিঙ্ক, কোবাল্ট ইত্যাদি মিনারেল স্বল্পমাত্রায় যকৃতে সঞ্চিত থাকে।

যকৃতের বিপাকীয় ভূমিকা (Metabolic functions of Liver)

যকৃতে নিচে বর্ণিত বিপাকীয় কার্যাবলী সংঘটিত হয়।

১. **শর্করা বিপাক** (Carbohydrate Metabolism) : যকৃতে শর্করার বিপাককে নিচে বর্ণিত উপায়ে ব্যাখ্যা করা হয়।

- **গ্লাইকোজেনেসিস** (Glycogenesis) : অন্ত্র থেকে হেপাটিক পোর্টাল শিরার মাধ্যমে চিনি (যেমন–গ্লুকোজ) যকৃতে প্রবেশ করে। এ শিরাটি বিভিন্ন মাত্রায় চিনি বহনকারী একমাত্র রক্তবাহিকা। শর্করা বিপাকে যকৃতই দেহে গ্লুকোজ লেভেল প্রতি ১০০ ঘন সেন্টিমিটারে ৯০ মিলিগ্রাম গ্লুকোজ হিসেবে নিয়ন্ত্রণ করে। যে ধরনের

www.Educationblog24.Com

খাবারই গ্রহণ করা হোক না কেন রক্তে গ্লুকোজ লেভেল যেন না বাড়ে বা কমে, যকৃত তা প্রতিরোধ করে। গ্যালাকটোজ, ফ্রুকটোজসহ সমস্ত হেক্সোজ চিনিকে যকৃত গ্লুকোজে পরিবর্তিত করে গ্লাইকোজেন (glycogen) নামক অদ্রবণীয় পলিস্যাকারাইড হিসেবে সঞ্চিত রাখে। গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন রূপান্তর প্রক্রিয়াটিকে গ্লাইকোজেনেসিস বলে। প্রক্রিয়াটি ইনসুলিনের উপস্থিতিতে উদ্দীপ্ত হয়। ইনসুলিন (insulin) হচ্ছে রক্তে চিনির লেভেল বেড়ে গেলে তার প্রতি সাড়া হিসেবে অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স (islets of Langerhans) থেকে উৎপন্ন হরমোন।

- **গ্লুকোনিওজেনেসিস** (Gluconeogenesis) : গ্লুকোজের চাহিদার প্রেক্ষিতে যদি যকৃতে গ্লাইকোজেনের ঘাটতি পড়ে তখন ননকার্বোহাইড্রেট উৎস যেমন অ্যামিনো এসিড ও গ্লিসারল প্রভৃতি থেকে গ্লুকোজ সংশ্লেষিত হওয়ায় এ প্রক্রিয়াকে গ্লুকোনিওজেনেসিস বলে।

২. **প্রোটিন বিপাক** (Protein Metabolism) : প্রোটিন বিপাকে যকৃত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব ভূমিকাকে নিচে বর্ণিত চারটি শিরোনামের অধীনে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

- **ডিঅ্যামিনেশন** (Deamination) : কোন অ্যামিনো এসিড বা অন্য উপাদান থেকে অ্যামিনো গ্রুপের অপসারণ প্রক্রিয়াকে ডিঅ্যামিনেশন বলে। খাদ্যের সঙ্গে গৃহীত অতিরিক্ত অ্যামিনো এসিড দেহ জমিয়ে রাখতে পারে না। যকৃত অতিরিক্ত ও অব্যবহৃত অ্যামিনো এসিড ডিঅ্যামিনেশন প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে কিটো এসিড ও অ্যামিন মূলক ($-NH_2$) তৈরি করে। কিটো এসিড শক্তি উৎপাদনের জন্য ক্রেবস চক্রে প্রবেশ করে। অ্যামিন মূলক ($-NH_2$) হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) এর সাথে যুক্ত হয়ে অ্যামোনিয়া (NH_3) সৃষ্টি হয়।
- **ইউরিয়া তৈরি** (Urea formation) : অ্যামোনিয়া অত্যন্ত বিষাক্ত ক্ষতিকর যা দেহে সঞ্চিত হলে মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে। যকৃতে অরনিথিন চক্রে (Ornithine cycle) শর্করা বিপাকে সৃষ্ট CO_2 এর সাথে অ্যামোনিয়া যুক্ত হয়ে ইউরিয়া সৃষ্টি করে। ইউরিয়া রক্তবাহিত হয়ে বৃক্ক হতে মূত্ররূপে দেহ থেকে নিষ্কাশিত হয়।
- **প্লাজমা প্রোটিন সংশ্লেষ** (Synthesis of plasma proteins) : যকৃত γগ্লোবিউলিন ছাড়া প্রায় সকল ধরনের প্লাজমা প্রোটিন সংশ্লষ করে। যকৃতে যেসব প্লাজমা প্রোটিন সংশ্লেষিত হয় সেগুলো হচ্ছে: অ্যালবুমিন, লিপোপ্রোটিন, ট্রান্সফেরিন, সেরোপ্লাজমিন, গ্লোবিউলিন, α_1ফেটোপ্রোটিন এবং রক্ত তঞ্চন ফ্যাক্টর I, II, V, VII, IX, X, XI, XII.
- **হরমোন সংশ্লেষ** (Synthesis of hormone) : যকৃত অ্যানজিওটেনসিনোজেন (angiotensinogen) নামক হরমোন সংশ্লেষ করে যা বৃক্ক নিঃসৃত রেনিন (renin) এনজাইম দিয়ে সক্রিয় হয়ে দেহে রক্তচাপ বৃদ্ধি করে।

৩. **ফ্যাট বিপাক** (Fat Metabolism) : ফ্যাটগুলোকে জমা রাখার বদলে যকৃত এগুলোর পরিশোধন ও পরিবহনে নিয়োজিত থাকে। যকৃত কোষ এক্ষেত্রে যে কাজ করে তা হচ্ছে অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেটকে ফ্যাটে রূপান্তর; এবং রক্ত থেকে কোলেস্টেরল সরিয়ে নেয়া, ভেঙে ফেলা বা প্রয়োজনে সংশ্লেষ করা। গ্লুকোজের ঘাটতি হলে শ্বসনের উদ্দেশে যকৃত ফ্যাটকে ভেঙে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে পরিণত করে। ফ্যাটি এসিড বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থে পরিণত হয়ে যকৃত থেকে নির্গত হয়। গ্লুকোনিওজেনেসিস প্রক্রিয়ায় গ্লিসারল গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয়।

৪. **লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদন ও ভাঙন** (Production and Destruction of Red Blood Cells) : শিশুদেহে লোহিত কণিকা উৎপাদনে যকৃত নিয়োজিত থাকে। পরবর্তীতে অস্থিমজ্জার কোষগুলো এ দায়িত্ব পালন করে। এ প্রক্রিয়া একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে যকৃত তখন বিপরীত ভূমিকা পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে অর্থাৎ যকৃত তখন লোহিত রক্তকণিকা ভাঙনে সহযোগিতা করে।

৫. **হিমোগ্লোবিনের ভাঙন** (Breakdown of Haemoglobin) : লোহিত রক্তকণিকার আয়ু ১২০ দিন (৪ মাস)। এরপর এগুলো যকৃত, প্লীহা ও অস্থিমজ্জায় ফ্যাগোসাইটিক ম্যাক্রোফেজ কোষের ক্রিয়ায় ভেঙে যায় এবং কণিকার হিমোগ্লোবিন রক্তের প্লাজমায় মুক্ত হয়ে মিশে যায়। এগুলোকে তখন যকৃত, প্লীহা ও লসিকা গ্রন্থির ম্যাক্রোফেজ (macrophage) নামক বিশেষ শ্বেত-রক্তকণিকা গ্রহণ করে। যকৃতের ম্যাক্রোফেজকে কাপফার কোষ (Kupffer cell) বলে। ম্যাক্রোফেজের অভ্যন্তরে হিমোগ্লোবিন ভেঙ্গে হিম ও গ্লোবিন গঠন করে। গ্লোবিন হচ্ছে অণুর প্রোটিন অংশ, এটি তার নিজস্ব অ্যামিনো এসিডে বিশ্লিষ্ট হয়। হিম থেকে আয়রন অংশ সরে গেলে অণুর বাকি অংশ বিলিভারডিন (biliverdin) নামে সবুজ রঞ্জক উৎপন্ন করে। এ রঞ্জক হলদে বিলিরুবিন (bilirubin)-এ পরিবর্তিত হয়। আয়রন বর্জিত হয় না। এটি হিমোগ্লোবিন উৎপন্নে অস্থিমজ্জার কোষে পুনর্ব্যবহৃত হয়।

www.Educationblog24.Com

৬. পিত্ত উৎপাদন (Bile production) : যকৃত কোষ (হেপাটোসাইট) অবিরাম পিত্ত ক্ষরণ করে এবং পিত্তথলিতে জমা রাখে। যকৃত কোষ স্টেরয়েড থেকে পিত্ত লবণ, যেমন–সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট (sodium glycocholate) ও সোডিয়াম টরোকোলেট (sodium taurocholate) সংশ্লেষ করে। পরিপাক অঙ্গ হিসেবে যকৃতের পিত্ত উৎপাদন ও ক্ষরণ গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

৭. হরমোনের ভাঙন (Breakdown of Hormones) : যকৃত প্রায় সব হরমোনই কম-বেশি ধ্বংস করে। তবে টেস্টোস্টেরন ও অ্যালডোস্টেরন যতদ্রুত ধ্বংস হয় অন্য হরমোনগুলো (ইনসুলিন, গ্লুকাগোন, আন্ত্রিক হরমোন, স্ত্রী যৌন হরমোন, অ্যাড্রেনাল হরমোন, থাইরক্সিন প্রভৃতি) ততদ্রুত ধ্বংস হয় না। এভাবে যকৃত বিভিন্ন হরমোনের কর্মকান্ডে স্থায়ী অভ্যন্তরীণ পরিবেশ (হোমিওস্ট্যাসিস) সৃষ্টি করে।

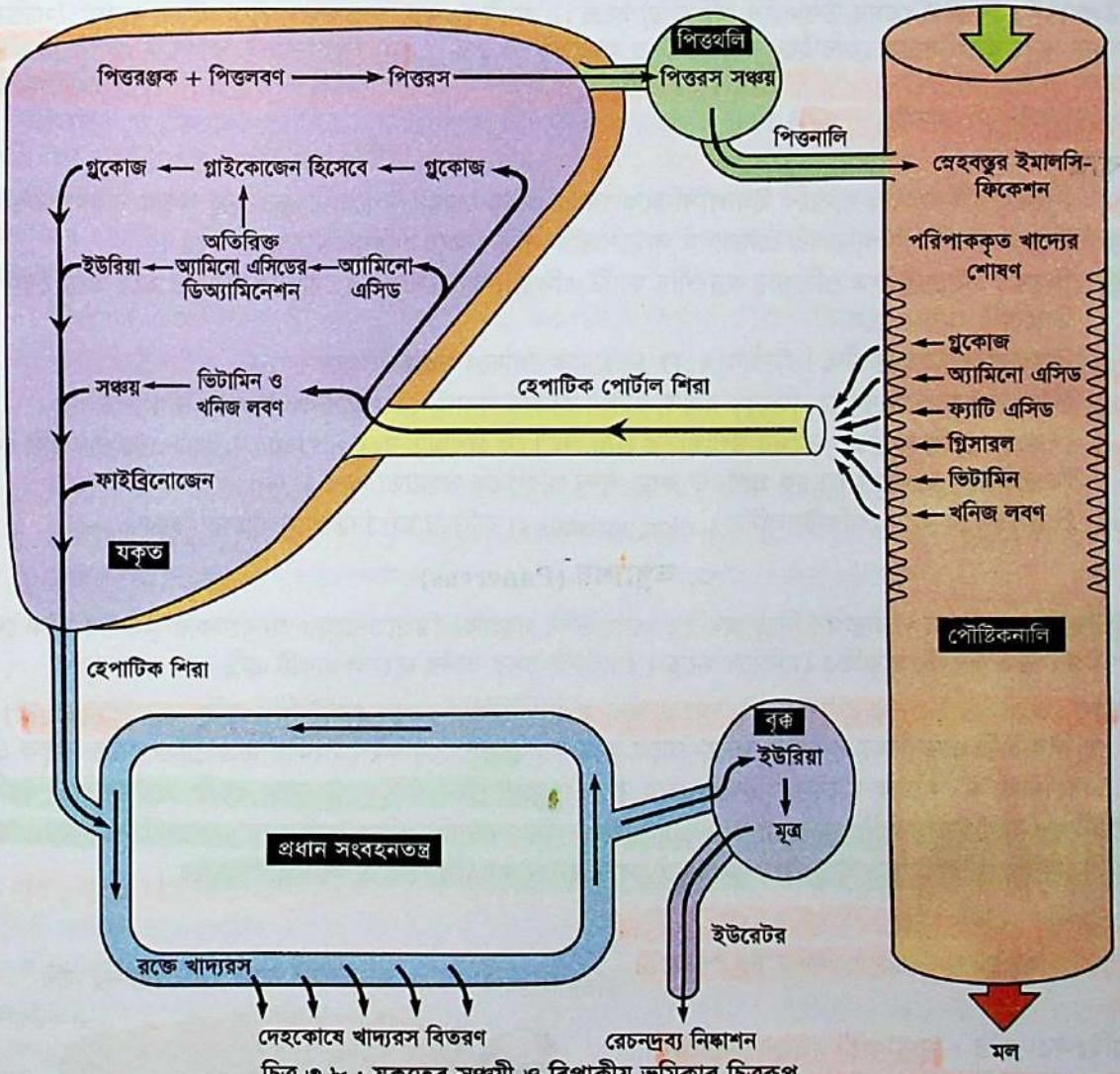

চিত্র ৩.৮ : যকৃতের সঞ্চয়ী ও বিপাকীয় ভূমিকার চিত্ররূপ

৮. টক্সিন বা বিষ অপসারণ (Detoxification) : শরীরের ভিতর স্বাভাবিক কর্মকান্ডের ফলে উৎপন্ন যেসব পদার্থ মাত্রাতিরিক্ত জমা হলে দেহে বিষময়তার সৃষ্টি করে এমন পদার্থকে টক্সিন (toxin) বা বিষ বলে। যকৃত কোষের অভ্যন্তরে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এ বিষ প্রশমিত হয়ে যায়। অনেক ওষুধও দেহ থেকে অপসারণ করে।

৯. তাপ উৎপাদন (Production of Heat) : যকৃতের অভ্যন্তরে নানা ধরনের বিক্রিয়া সংঘটিত হওয়ায় এখানে প্রচুর তাপ উৎপাদিত হয়। এ তাপ রক্তবাহিকার মাধ্যমে সমগ্র দেহে সঞ্চালিত হয়, ফলে দেহে তাপমাত্রা স্থিতিশীল থাকে (homeotherm) অর্থাৎ বাইরের তাপমাত্রার পরিবর্তনে দেহের তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটে না।

www.Educationblog24.Com

১০. রক্ত ব্যাকটেরিয়ামুক্ত রাখা (Blood cleanliness) : পোর্টাল শিরা দিয়ে যখন রক্ত অতিক্রম করে তখন কাপফার কোষ এর মধ্যে থাকা ব্যাকটেরিয়াগুলোকে ধ্বংস করে ফলে সিস্টেমিক সংবহনে ব্যাকটেরিয়াগুলো প্রবেশ করতে পারেনা।

যকৃতের নিঃসরণ– পিত্তরস (Secretion of Liver — Bile)

পিত্তরস (Bile) বা **পিত্ত** : যকৃত কোষ থেকে নিঃসৃত পিত্তরস হলদে-সবুজ, আঠালো, তিক্ত স্বাদধারী ক্ষারীয় তরল পদার্থ। পিত্তরস যকৃত থেকে নিঃসৃত হয়ে বাম ও ডান যকৃতনালি পথে **অভিন্ন যকৃত নালিতে** আসে এবং **সিস্টিক নালি** দিয়ে পিত্তথলিতে জমা হয়। অভিন্ন যকৃত নালি **অ্যাম্পুলা অব ভ্যাটার** (ampulla of vater)– এর মাধ্যমে ডিওডেনামে উন্মুক্ত হয়।

উপাদান : পিত্তরস যেসব উপাদানে গঠিত তা হচ্ছে (i) পানি (৯৭% – ৯৮%), (ii) অজৈব লবণ (সোডিয়াম, পটাসিয়াম এবং ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, কার্বোনেট ও ফসফেট–০.৫%), (iii) পিত্তলবণ (সোডিয়াম টোরোকোলেট ও সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট–০.৮%), (iv) পিত্ত রঞ্জক (বিলিরুবিন ও বিলিভারডিন–০.২%), (v) কোলেস্টেরল (০.৩৮%) এবং (vi) ফ্যাট (০.৮%)।

কাজ

i. পিত্তরস চর্বি জাতীয় খাদ্যকে **ইমালসিফিকেশন** প্রক্রিয়ায় শোষণ উপযোগী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করে।
ii. পিত্তলবণ চর্বি পরিপাককারী এনজাইম লাইপেজকে সক্রিয় করে পরিপাকে সাহায্য করে।
iii. পিত্তরস হাইড্রোট্রফিক প্রক্রিয়ায় অদ্রবণীয় ফ্যাটি এসিড, কোলেস্টেরল ইত্যাদিকে দ্রবীভূত করে অন্ত্রে শোষণের উপযোগী করে তোলে।
iv. পিত্তলবণ চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন A, D, E, K-কে শোষণে সহায়তা করে।
v. পিত্তরসের মাধ্যমে কপার, জিংক, পারদ, টক্সিন জাতীয় পদার্থ, কোলেস্টেরল ইত্যাদি নিষ্কাশিত হয়।
vi. পিত্তরসে বেশি ক্ষারক পদার্থের উপস্থিতির জন্য HCl কে প্রশমিত করে p^H নিয়ন্ত্রণ করে এবং পাকস্থলি থেকে ডিওডেনামে আগত HCl কে প্রশমিত করে খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে।
vii. পিত্তলবণ কোলনে পেরিস্ট্যালসিস (colon peristalsis) বাড়িয়ে মল নিষ্কাশনে সাহায্য করে।

৩. অগ্ন্যাশয় (Pancreas)

অবস্থান : অগ্ন্যাশয় পাকস্থলির নিচে অবস্থিত এবং উদর গহ্বরের ডিওডেনামের অর্ধবৃত্তাকার কুন্ডলীর ফাঁক থেকে প্লীহা পর্যন্ত বিস্তৃত লম্বাটে আকৃতির (মরিচের মতো) গোলাপী-ধূসর বর্ণের মাংসল একটি গ্রন্থি।

গঠন : অগ্ন্যাশয় ১২–১৫ সেন্টিমিটার লম্বা ও প্রায় ৫ সেন্টিমিটার চওড়া একটি **মিশ্র গ্রন্থি** (mixed gland)। এর চওড়া যে দিকটি ডিওডেনামের কুন্ডলির ফাঁকে থাকে তার নাম **মাথা**; যে অংশ সংকীর্ণ হয়ে প্লীহা পর্যন্ত বিস্তৃত সেটি **লেজ**; এবং মাথা ও লেজের মাঝের অংশকে **দেহ** বলে। অগ্ন্যাশয়ের গ্রন্থিগুলো থেকে ছোট ছোট নালিকা বেরিয়ে একত্রিত হয় এবং **উইর্সাং নালি** (duct of Wirsung) গঠন করে। এ নালি গ্রন্থির দৈর্ঘ্য বরাবর এসে ডিওডেনামের কাছে অভিন্ন পিত্তনালির সাথে মিলিত হয়ে **অ্যাম্পুলা অব ভ্যাটার**-এর মাধ্যমে ডিওডেনামে প্রবেশ করে।

অগ্ন্যাশয় একটি মিশ্র গ্রন্থি হওয়ায় এটি বহিঃক্ষরা ও অন্তঃক্ষরা উভয় প্রকার গ্রন্থির সমন্বয়ে গঠিত।

বহিঃক্ষরা গ্রন্থি : অগ্ন্যাশয়ে অসংখ্য লোবিওল (lobule) বা অ্যাসিনাস (acinus) থাকে। প্রতিটি লোবিওল একটি কেন্দ্রীয় লুমেন (ক্ষুদ্র নালি) এবং লুমেনকে ঘিরে বৃত্তাকারে সজ্জিত একসারি কোষ নিয়ে গঠিত। লোবিওলের কোষ থেকে অগ্ন্যাশয় রস নিঃসৃত হয়। লুমেন প্রকৃতপক্ষে ক্ষুদ্র অগ্ন্যাশয় নালিকা। সকল অ্যাসিনাসের লুমেন বা ক্ষুদ্র অগ্ন্যাশয় নালিকাগুলো একত্রিত হয়ে প্রধান অগ্ন্যাশয় নালি বা উইর্সাং নালি গঠন করে।

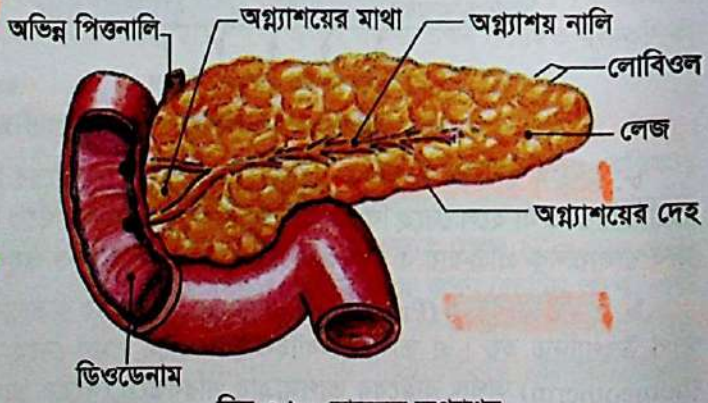

চিত্র ৩.৯ : মানুষের অগ্ন্যাশয়

www.Educationblog24.Com

লোবিওল বা অ্যাসিনাস নালিযুক্ত গ্রন্থি, তাই একে **সনাল গ্রন্থি** বলে এবং এদের ক্ষরণ বহির্মুখী অর্থাৎ নালির মাধ্যমে অগ্ন্যাশয় রস বাহিত হয় বলে এদের **বহিঃক্ষরা গ্রন্থি** (exocrine gland) বলা হয়।

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি : লোবিওলগুলোর ফাঁকে ফাঁকে কিছু বহুভুজাকার কোষ গুচ্ছাকারে অবস্থান করে। এদের **আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স** (islets of Langerhans) বা **ল্যাঙ্গারহ্যান্সের দ্বীপপুঞ্জ** বলে। এতে ৪ ধরনের কোষ পাওয়া যায়। কোষগুলো নালিবিহীন এবং এসব কোষগুলো থেকে **হরমোন** নিঃসৃত হয়। কোষগুলো হচ্ছে :

i. **আলফা কোষ** (α cell)-এটি গ্লুকাগন (glucagon) হরমোন ক্ষরণ করে যা রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।
ii. **বিটাকোষ** (β cell) - এটি ইনসুলিন (insulin) হরমোন ক্ষরণ করে যা রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমায়।
iii. **ডেল্টা কোষ** (δ cell)– এটি সোমাটোস্টাটিন (somatostatin) হরমোন ক্ষরণ করে, যা আলফা ও বিটা কোষের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং
iv. **পিপি কোষ** (PP cell)– এটি প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড ক্ষরণ করে।

পরিপাকে অগ্ন্যাশয়ের ভূমিকা : খাদ্য পাকস্থলি থেকে ক্ষুদ্রান্ত্রে যাওয়ার সময় ক্ষারীয় তরলরূপী **অগ্ন্যাশয় রস** নিঃসৃত হয়। অগ্ন্যাশয়ের বহিঃক্ষরা অংশ থেকে দুধরনের ক্ষরণ মিলে অগ্ন্যাশয় রস গঠন করে, যেমন– **পরিপাক এনজাইম** এবং একটি **ক্ষারীয় তরল**। বহিঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে অগ্ন্যাশয় থেকে বিভিন্ন ধরনের পরিপাককারী এনজাইম নিঃসৃত হয়। আমিষ, শর্করা ও স্নেহজাতীয় খাদ্য পরিপাককারী এসব এনজাইমসমূহের পরিপাকে অংশগ্রহণের ধরন নিম্নরূপ:

- **ট্রিপসিন** এনজাইম প্রোটিওজ ও পেপটোন জাতীয় আমিষ অণুকে পলিপেপটাইডে পরিণত করে।
- **কাইমোট্রিপসিন** এনজাইম প্রোটিওজ ও পেপটোন জাতীয় আমিষ অণুকে পলিপেটাইডে পরিণত করে।
- **কার্বক্সিপেপটাইডেজ** এনজাইম পলিপেপটাইডের প্রান্তীয় লিঙ্কেজকে সরল পেপটাইড ও অ্যামিনো এসিডে রূপান্তরিত করে।
- **অ্যামিনোপেপটাইডেজ** এনজাইম পলিপেপটাইডকে ভেঙে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।
- **ট্রাইপেপটাইডেজ** এনজাইম ট্রাইপেপটাইডকে ভেঙে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।
- **ডাইপেপটাইডেজ** এনজাইম ডাইপেপটাইডকে ভেঙে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।
- **কোলাজিনেজ** এনজাইম কোলাজেন জাতীয় প্রোটিনকে সরল পেপটাইডে রূপান্তরিত করে।
- **ইলাস্টেজ** এনজাইম যোজক টিস্যুর প্রোটিন ইলাস্টিনকে ভেঙে পেপটাইড উৎপন্ন করে।
- **অ্যামাইলেজ** এনজাইম স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন জাতীয় জটিল শর্করাকে মল্টোজে পরিণত করে।
- **মল্টেজ** এনজাইম মল্টোজ জাতীয় শর্করাকে গ্লুকোজে পরিণত করে।
- **লাইপেজ** এনজাইম চর্বি (লিপিড)-কে ভেঙে ফ্যাটি এসিডে রূপান্তরিত করে।
- **কোলেস্টেরল এস্টারেজ** এনজাইম কোলেস্টেরল এস্টারকে ফ্যাটি এসিডে বিশ্লিষ্ট করে।

অগ্ন্যাশয়ের বহিঃক্ষরা অংশ থেকে অগ্ন্যাশয় রসের অংশ হিসেবে ক্ষরিত হয় **বাইকার্বনেট আয়ন**। পাকস্থলিতে আংশিক পাচিত খাদ্য (অর্থাৎ কাইম) গ্যাস্ট্রিনের কর্মকান্ডে অতিমাত্রায় আম্লিক থাকে। বাইকার্বনেটের প্রকৃতি ক্ষারীয় হওয়ায় অর্ধপাচিত খাদ্য নিরপেক্ষ হয়ে যায়। ফলে এ খাদ্য ক্ষুদ্রান্ত্রে গেলেও আন্ত্রিক প্রাচীরের কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। বাইকার্বনেট আয়ন ক্ষরিত হয় বহিঃক্ষরা অগ্ন্যাশয়ের নালিপ্রাচীরের কোষ থেকে। অগ্ন্যাশয় রস এভাবে **অম্ল-ক্ষারের সাম্য, পানিসাম্য, দেহতাপ** প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে।

৪. গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি (Gastric gland)

পাকস্থলি (stomach) একটি থলিসদৃশ অঙ্গ এবং এর প্রাচীর **পেশি** ও **মিউকোসা** (mucosa) দিয়ে গঠিত। মিউকোসা স্তরটি সরল স্তম্ভাকার এপিথেলিয়ামে (columnar epithelium) আবৃত যা প্রায় ৩.৫ মিলিয়ন **গ্যাস্ট্রিক পিট** (gastric pit) সম্পন্ন। গ্যাস্ট্রিক পিট গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি ধারণ করে। গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি এক ধরনের নলাকার গ্রন্থি এবং চার ধরনের কোষ নিয়ে গঠিত। প্রত্যেক ধরনের কোষের ক্ষরণ পৃথক। সম্মিলিতভাবে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির রসকে **গ্যাস্ট্রিক জুস** (gastric juice) বলে। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ দিনে প্রায় ২ লিটার গ্যাস্ট্রিক জুস তৈরি করে। গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির কোষগুলোর নাম ও কাজ নিম্নরূপ–

www.Educationblog24.Com

১. **অক্সিনটিক কোষ** (Oxyntic cell) : এগুলো **প্যারাইটাল কোষ** (parietal cell)-নামে পরিচিত এবং হাইড্রোক্লোরিক এসিড উৎপন্ন করে।

২. **মিউকাস কোষ** (Mucous cell) : পিচ্ছিল মিউকাস উৎপন্ন করে।

৩. **আর্জেন্টাফিন কোষ** (Argentaffin cell) : গ্যাস্ট্রিক ইনট্রিনসিক ফ্যাক্টর সৃষ্টি করে।

৪. **জাইমোজেনিক কোষ** (Zymogenic cell) : জাইমোজেনিক কোষকে **চীফ কোষ** (Chief Cell)-ও বলে। এ কোষ থেকে নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেন উৎপন্ন হয়।

গ্যাস্ট্রিক জুসের উপাদান

১. পানি : ৯৯.৪৫%।

২. অজৈব পদার্থ : ০.১৫%; HCl, সোডিয়াম ক্লোরাইড, পটাসিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম ফসফেট, ম্যাগনেসিয়াম ফসফেট ইত্যাদি।

৩. জৈব পদার্থ : ০.৪০%; মিউসিন, ইনট্রিনসিক ফ্যাক্টর; এনজাইম (পেপসিন, রেনিন, লাইপেজ ইত্যাদি)।

গ্যাস্ট্রিক জুসের কাজ

১. গ্যাস্ট্রিক জুসে বিদ্যমান HCl পাকস্থলিতে অম্লীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে, ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে এবং নিষ্ক্রিয় এনজাইমকে সক্রিয় করে।

২. গ্যাস্ট্রিক জুসে বিদ্যমান পেপসিন এনজাইম HCl-এর সাথে মিশে প্রোটিনকে পেপটোনে পরিণত করে।

৩. গ্যাস্ট্রিক জুসে বিদ্যমান রেনিন এনজাইম দুধের ক্যাসিনোজেনকে ক্যাসিনে পরিণত করে।

৪. গ্যাস্ট্রিক জুস পাকস্থলির প্রাচীর সুরক্ষা করে।

৫. কিছু বিষাক্ত বস্তু, ভারী ধাতু, অ্যালক্যালয়েড বস্তু ইত্যাদি গ্যাস্ট্রিক জুসের সাথে দেহ থেকে বহিষ্কৃত হয়।

৫. আন্ত্রিক গ্রন্থি (Intestinal glands)

অন্ত্রপ্রাচীরের মিউকোসা স্তরে কতগুলো এককোষী গ্রন্থি খাদ্য পরিপাককারী এনজাইম ক্ষরণ করে। এগুলো হচ্ছে– ব্রাশকোষ, গবলেট কোষ, প্যানেথ কোষ, আর্জেনটাইন কোষ, লিবারক্যুন-এর গ্রন্থি এবং ব্রুনার-এর গ্রন্থি। এসব গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসকে **আন্ত্রিক রস বা সাক্কাস ইন্টেরিকাস** (intestinal juice or succus intericus) বলে।

আন্ত্রিক রসের উপাদান

i. পানি: ৯৮.৫%।

ii. অজৈব পদার্থ : ০.৮%; সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের লবণ।

iii. জৈব পদার্থ : ০.৭%; সক্রিয়ক – এন্টারোকাইনেজ; এনজাইম – ট্রিপসিনোজেন, পেপটাইডেজ, অ্যামাইলেজ, মল্টেজ, ল্যাক্টেজ, সুক্রেজ, লাইপেজ ইত্যাদি।

আন্ত্রিক রসের কাজ

i. আন্ত্রিক রসের মিউকাস অন্ত্র প্রাচীরকে বিভিন্ন এনজাইমের ক্রিয়া থেকে রক্ষা করে।

ii. এতে উপস্থিত সক্রিয়ক এন্টারোকাইনেজ নিষ্ক্রিয় ট্রিপসিনোজেনকে ট্রিপসিনে পরিণত করে।

iii. এরসের সুক্রেজ ও ল্যাক্টেজ এনজাইম যথাক্রমে, মল্টোজ, সুক্রোজ ও ল্যাক্টোজ শর্করাকে গ্লুকোজে পরিণত করে।

iv. এতে অবস্থিত পেপটাইডেজ এনজাইম পলিপেপটাইডকে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।

এনজাইম ও পিত্তরসের মধ্যে পার্থক্য

এনজাইম	পিত্তরস
১. এনজাইম নালিযুক্ত গ্রন্থি নিঃসৃত জৈব রাসায়নিক পদার্থ।	১. পিত্তরস যকৃত নিঃসৃত মিশ্র পদার্থ।
২. এনজাইম পানি ও প্রোটিন জাতীয় জৈব পদার্থ।	২. পিত্তরস পানি, জৈব ও অজৈব পদার্থ।
৩. এনজাইম গ্রন্থি থেকে তাৎক্ষণিক উৎপন্ন হয় এবং কোথাও সঞ্চিত থাকে না।	৩. পিত্তরস যকৃত থেকে উৎপন্ন হয়ে পিত্তথলিতে সঞ্চিত থাকে।
৪. এনজাইমের সমগ্র কার্যক্ষেত্র দেহের বিভিন্ন অঙ্গে।	৪. পিত্তরসের কার্যক্ষেত্র কেবল পরিপাকনালিতে সীমাবদ্ধ।
৫. এনজাইম রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিকে ত্বরান্বিত করে।	৫. পিত্তরস খাদ্য পরিপাকে ক্ষারীয় মাধ্যম তৈরি করে।
৬. এনজাইম কার্যশেষে অপরিবর্তিত থাকে।	৬. পিত্তরস কাজ শেষে বর্জ্য হিসেবে দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়।

www.Educationblog24.Com

পরিপাকে স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোনের ভূমিকা (Role of Nervous System & Hormone in Digestion)

খাদ্য পরিপাক ও শ্বসন যে জটিল প্রক্রিয়া তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এসব প্রক্রিয়া শেষে উৎপন্ন হয় শক্তি। শক্তির সুষ্ঠু ব্যবহারই হচ্ছে সুস্থ জীবন অব্যাহত রাখার একমাত্র কৌশল। শক্তির সংরক্ষণ ও ব্যবহার প্রক্রিয়া যে কত সূক্ষ্মভাবে দেহে পরিচালিত হচ্ছে সে বিষয়টি পরিষ্কার জানতে হলে পরিপাকে স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোনের ভূমিকা সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

পরিপাকের জন্য বিভিন্ন এনজাইম ও অন্যান্য পদার্থের (যেমন–HCl) ক্ষরণ হয় শক্তির বিনিময়ে। শক্তির উৎপাদন ও ব্যবহার কখনও বৃথা যায় না। এ কারণে খাদ্যের অনুপস্থিতিতে শক্তি ও পদার্থ উৎপন্ন হয় না। বরং খাদ্য পরিপাকের উদ্দেশেই বিপুল পরিমাণ গ্যাস্ট্রিক জুস (gastric juice) উৎপন্ন ও ক্ষরিত হয়। পরিপাকের প্রত্যেক ধাপের কর্মকাণ্ডে স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোনতন্ত্র (অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র; endocrine system) নিম্নোক্তভাবে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে।

পরিপাকে স্নায়ুতন্ত্রের ভূমিকা

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (central nervous system) পৌষ্টিকতন্ত্র সংশিষ্ট স্নায়ুর মাধ্যমে উত্তেজিত হয় এবং বিভিন্ন নির্দেশনা ও সংকেত প্রেরণের মাধ্যমে পৌষ্টিকনালি ও গ্রন্থিগুলোকে পরিচালনা করে। এতে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র (autonomic nervous system)-ও কার্যকর ভূমিকা পালন করে। পরিপাক ক্রিয়া দুটি ভিন্ন ধরনের স্নায়ুজালক দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়, যেমন– (i) **বহির্নিহিত স্নায়ুজালক** (extrinsic plexus) এবং (ii) **অন্তর্নিহিত স্নায়ুজালক** (intrinsic plexus)।

স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের **সিমপ্যাথেটিক** (sympathetic) ও **প্যারাসিমপ্যাথেটিক** (parasympathetic) শাখা থেকে আগত বহির্নিহিত স্নায়ুজালক পৌষ্টিকনালির বাহির থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে পরিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। অপরদিকে পৌষ্টিকনালির প্রাচীরে ঘনসন্নিবিষ্ট জালিকা গঠন করে বিন্যস্ত থেকে অন্তর্নিহিত স্নায়ুজালক পৌষ্টিকনালির ভিতর থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে পরিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। দুধরনের অন্তর্নিহিত স্নায়ুজালক পৌষ্টিকতন্ত্রের সংক্ষিপ্ত প্রতিবর্তী ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। একটি হচ্ছে– পৌষ্টিকনালির বাইরের দিকে অবস্থিত **মায়েনটেরিক স্নায়ুজালক** (myenteric plexus) যা পৌষ্টিকতন্ত্রের মসৃণ পেশিগুলোর সঙ্কোচন বা পেরিস্ট্যালসিস ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে এবং অন্যটি **সাব–মিউকোসাল স্নায়ুজালক** (submucosal plexus) যা পৌষ্টিকতন্ত্রের বিভিন্ন ধরনের নিঃসরণ ও স্থানীয় রক্ত প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে।

১. লালাক্ষরণ : দুধরনের প্রতিবর্ত ক্রিয়া মুখগহ্বরে লালাক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। প্রথমটি হচ্ছে **অনপেক্ষ প্রতিবর্ত**, দ্বিতীয়টি **সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া**।

❒ খাদ্য মুখগহ্বরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে **অনপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া** (unconditional reflex; উদ্দীপনা-সাড়াদান শেখার বিষয় নয়) শুরু হয়ে যায়। জিভের স্বাদকুঁড়ির গ্রাহক বা রিসেপ্টর খাদ্যের স্বাদে উদ্দীপ্ত হয়। এসব রিসেপ্টর থেকে সেন্সরি নিউরন স্নায়ুউদ্দীপনা (nerve impluse) মস্তিষ্কে বহন করে। মস্তিষ্ক থেকে মোটর নিউরনের সাহায্যে স্নায়ু উদ্দীপনা লালাগ্রন্থিতে এলে সেখান থেকে লালা ক্ষরিত হয়। যে প্রতিবর্ত ক্রিয়া মস্তিষ্ক হয়ে অতিক্রম করে তাকে **করোটিক প্রতিবর্ত** (cranial reflex) বলে।

❒ দ্বিতীয় প্রতিবর্ত ক্রিয়া হচ্ছে **সাপেক্ষ প্রতিবর্ত** (conditional reflex; সাড়াটি শিক্ষণজনিত)। খাবার দেখে, গন্ধ শুঁকে, চিন্তাভাবনা শেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এ প্রতিবর্তের অন্তর্ভুক্ত। কেউ যদি একান্তে বসে তেঁতুল বা চালতার আচার মুখে দেওয়ার কথা চিন্তা করে তাহলে হয়তো লালা ক্ষরণ শুরু হয়ে যাবে। এসব আচার খাওয়ার অভিজ্ঞতা যার আছে তার ক্ষেত্রে এমনটি ঘটবে। অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষা গ্রহণকে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত বলে। (আরও বিস্তারিত দ্বাদশ অধ্যায়: **প্রাণীর আচরণ**-এ আলোচিত হয়েছে।

২. গ্যাস্ট্রিক জুস (রস) ক্ষরণ : গ্যাস্ট্রিক জুসের ক্ষরণ হয় ৩টি ধাপে, যেমন- (i) **স্নায়বিক বা সেফালিক পর্যায়** (Cephalic phase), (ii) **গ্যাস্ট্রিক পর্যায়** (Gastric phase) এবং (iii) **আন্ত্রিক পর্যায়** (Intestinal phase)।

i. **স্নায়বিক পর্যায় :** মুখগহ্বরে খাদ্যের উপস্থিতি ও গলাধঃকরণের সঙ্গে সঙ্গে স্নায়বিক প্রতিবর্ত (স্নায়ুউদ্দীপনা) শুরু হয়ে যায়। এ উদ্দীপনা মস্তিষ্ক থেকে **ভ্যাগাস স্নায়ুর** মাধ্যমে পাকস্থলিতে পৌছায়। খাদ্য দেখা, গন্ধ ও স্বাদ নেয়া, এমনকি চিন্তা করলেও একই অবস্থা হবে। পাকস্থলির গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থিগুলো গ্যাস্ট্রিক জুস ক্ষরণে উদ্দীপ্ত হয়। এটি হচ্ছে প্রস্তুতি পর্ব। পাকস্থলিতে খাদ্য পৌঁছার আগেই এটি ঘটে এবং এভাবে পাকস্থলি খাদ্য গ্রহণে প্রস্তুত হয়। পাকস্থলির ক্ষরণে স্নায়বিক পর্যায় প্রায় এক ঘন্টা স্থায়ী হয়।

www.Educationblog24.Com

ii. **গ্যাস্ট্রিক পর্যায় :** এটি অনুষ্ঠিত হয় পাকস্থলিতে। খাদ্য ধারণে পাকস্থলি প্রসারিত হলে প্রসারণ গ্রাহক (stretch receptor) উদ্দীপ্ত হয় এবং পাকস্থলির সাবমিউকোসায় অবস্থিত স্নায়ু জালিকায় স্নায়ু উদ্দীপনা প্রেরণ করে। সেখান থেকে স্নায়ু উদ্দীপনা গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থিতে পৌঁছে জুস ক্ষরণে উদ্দীপ্ত করে। গ্যাস্ট্রিক জুস ক্ষরণ প্রায় ৪ ঘন্টা স্থায়ী হয়।

iii. **আন্ত্রিক পর্যায় :** এ পর্বটি ক্ষুদ্রান্ত্রে সংঘটিত হয়। এসিডধর্মী কাইম যখন প্রবেশ করে এবং ডিওডেনামের প্রাচীর স্পর্শ করে তখন স্নায়বিক সাড়া প্রদানকে উৎসাহিত করে। ক্ষুদ্রান্ত্র প্রাচীরের রিসেপ্টরগুলো খাদ্যের উপস্থিতিতে উদ্দীপ্ত হওয়ার খবর মস্তিষ্কে পৌঁছালে প্রতিবর্ত ক্রিয়ার অংশ হিসেবে মস্তিষ্ক গ্যাস্ট্রিক জুসের ক্ষরণ কমিয়ে দেয় এবং পাকস্থলি থেকে কাইমের নির্গমন গতি মন্থর করে দেয়। এর ফলে একসঙ্গে বেশি খাদ্য অন্ত্রে প্রবেশ করতে পারে না। শুধু তাই নয়, ডিওডেনামের মিউকোসা দুধরনের হরমোন ক্ষরণ করে, কোলেসিস্টোকাইনিন (Cholecystokinin, CCK) এবং সিক্রেটিন (Secretin)। CCK আবার প্যানক্রিওজাইমিন (Pancreozymin) নামেও পরিচিত। উভয় হরমোনই রক্তে সংবহিত হয়ে পাকস্থলি, অগ্ন্যাশয় ও যকৃতে পৌঁছায়। সিক্রেটিন পাকস্থলিতে গ্যাস্ট্রিক জুস ক্ষরণে বাধা দেয়, আর CCK পাইলোরিক স্ফিংক্টারের পেশিকে সংকুচিত করে পাকস্থলি শূন্য হতে বাধা দেয়।

৩. **অগ্ন্যাশয় রস ও পিত্ত :** অগ্ন্যাশয় রস ও পিত্তের ক্ষরণেও স্নায়বিক প্রতিবর্তের ভূমিকা আছে। পাকস্থলিতে পরিপাকের স্নায়বিক ও গ্যাস্ট্রিক ধাপে ভ্যাগাস স্নায়ু যকৃতকে পিত্ত ও অগ্ন্যাশয়কে এনজাইম ক্ষরণে উদ্দীপ্ত করে।

পরিপাকে হরমোনের ভূমিকা

খাদ্য পরিপাকে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন ধরনের এনজাইমের নিঃসরণ কয়েকটি নির্দিষ্ট হরমোন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। হরমোনগুলো পাকস্থলি ও অন্ত্রের মিউকোসা স্তরের কোষ থেকে ক্ষরিত হয়ে পৌষ্টিকতন্ত্রের বিভিন্ন রক্তবাহিকার মাধ্যমে হৃৎপিন্ডে পৌঁছে। হৃৎপিন্ড থেকে ধমনির মাধ্যমে পুনরায় পৌষ্টিকতন্ত্রে এসে পৌঁছায় এবং এনজাইম নিঃসরণ ও অঙ্গের সঞ্চালন কাজকে উদ্দীপিত করে। নিচে খাদ্য পরিপাক নিয়ন্ত্রণকারী কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হরমোন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. **গ্যাস্ট্রিন** (Gastrin) : পাকস্থলির পাইলোরিক প্রান্তের গ্রন্থিগুলোর গাত্রের জি–কোষ থেকে গ্যাস্ট্রিন ক্ষরিত হয়। এর প্রভাবে পাকস্থলির প্রাচীরে অবস্থিত গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে গ্যাস্ট্রিক জুস নিঃসৃত হয়। এটি HCl এর ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং অন্ননালি থেকে পাকস্থলিতে খাদ্যগ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টি করে।

২. **সিক্রেটিন** (Secretin) : অন্ত্রের (ডিওডেনামের) মিউকোসা থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এর প্রভাবে অগ্ন্যাশয় থেকে অগ্ন্যাশয় রস নিঃসৃত হয়। তাছাড়া এটি পাকস্থলির প্রাচীরকে পেপসিন এনজাইম এবং যকৃতকে পিত্ত (bile) ক্ষরণে উদ্দীপিত করে। এটি প্রথম আবিষ্কৃত হরমোন।

৩. **কোলেসিস্টোকাইনিন** (Cholecystokinin) : এর অপর নাম প্যানক্রিওজাইমিন। ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর থেকে ক্ষরিত হরমোনটি অগ্ন্যাশয়ের বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণকে উদ্দীপিত করে। এটি পিত্তথলি থেকে পিত্ত বের হতেও উদ্দীপনা যোগায়।

৪. **সোমাটোস্ট্যাটিন** (Somatostatin) : এ হরমোনটি পাকস্থলি ও অন্ত্রের মিউকোসাতে অবস্থিত ডি–কোষ থেকে ক্ষরিত হয়। এটি গ্যাস্ট্রিনের ক্ষরণ নিবারণ করে ফলে পাকস্থলি রসের ক্ষরণ হ্রাস পায়। এটি অগ্ন্যাশয় রসের ক্ষরণও হ্রাস করে।

৫. **এন্টেরোকাইনিন** (Enterokinin) : ইলিয়ামের প্রাচীর থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এর প্রভাবে ইলিয়ামের প্রাচীরে বিদ্যমান আন্ত্রিক গ্রন্থি থেকে মল্টেজ, সুক্রেজ, ইনভারটেজ ও ল্যাক্টেজ এনজাইম নিঃসৃত হয়।

৬. **পেপটাইড YY** (Peptide YY) : ইলিয়ামের প্রাচীর থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এর প্রভাবে অন্ত্রের ভিতর দিয়ে ধীর গতিতে খাদ্য প্রবাহিত হয় যাতে দক্ষতার সাথে খাদ্যের পরিপাক ও শোষণ সম্পন্ন হয়।

৭. **এন্টারোগ্যাস্ট্রোন** (Enterogastrone = Gastric Inhibitory Peptide–GIP) : এটি ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর (ডিওডেনাম) থেকে নিঃসৃত হয়। এ হরমোন পাকস্থলির বিচলন ও গ্যাস্ট্রিক জুস নিঃসরণে বাধা সৃষ্টি করে। গ্যাস্ট্রিক সংকোচন হ্রাস করার জন্য একে গাস্ট্রিক ইনহিবিটরি পেপটাইড বলা হয়।

৮. **এন্টারোক্রাইনিন** (Enterocrinin) : এটি ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর (ডিওডেনাম) থেকে ক্ষরিত হয়। এটি লিবারকুন গ্রন্থিকে (crypts of liberkuhn) উদ্দীপিত করে আন্ত্রিক রসে এনজাইম ও মিউকাস ক্ষরণ করে।

৯. **ডিওক্রাইনিন** (Deocrinin) : এটি ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর (ডিওডেনাম) থেকে ক্ষরিত হয়। এ হরমোন ব্রুনারের গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করে আন্ত্রিক রসে এনজাইম ও মিউকাস ক্ষরণ করে।

১০. **প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড** (Pancreatic Polypeptide) : এটি আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্সের প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড কোষ থেকে ক্ষরিত হয় এবং অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণে বাধা দেয়।

১১. **ভিলিকাইনিন** (Villikinin) : ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর থেকে এ হরমোন নিঃসৃত হয় এবং ভিলাই এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।

www.Educationblog24.Com

পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন অংশে খাদ্য পরিপাকের রূপরেখার ছক

পরিপাকস্থল	পরিপাকগ্রন্থি ও পরিপাক রস	পরিপাক রসের এনজাইম	প্রভাবিত খাদ্যের নাম	সরলীকৃত উপাদান
মুখবিবর	লালাগ্রন্থি নিঃসৃত "লালারস"	কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী ১. টায়ালিন ২. মল্টেজ (অল্পমাত্রায়)	 স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন মল্টোজ	 মল্টোজ গ্লুকোজ
পাকস্থলি	গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি নিঃসৃত "পাকরস"	প্রোটিন পরিপাককারী ১. পেপসিন ২. জিলেটিনেজ ৩. রেনিন	 প্রোটিন জিলেটিন দুগ্ধ কেসিন	 প্রোটিওজ ও পেপটোন পেপটোন ও পলিপেপটাইড প্যারাকেসিন
		লিপিড পরিপাককারী ১. গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ	 মাখনের চর্বি	 ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল
ক্ষুদ্রান্ত্র	অগ্ন্যাশয় নিঃসৃত "অগ্ন্যাশয় রস"	প্রোটিন পরিপাককারী ১. ট্রিপসিন ২. কাইমোট্রিপসিন ৩. কার্বোক্সিপেপটাইডেজ ৪. অ্যামিনোপেপটাইডেজ ৫. ট্রাইপেপটাইডেজ ৬. ডাইপেপটাইডেজ ৭. কোলাজিনেজ	 প্রোটিওজ ও পেপটোন প্রোটিওজ ও পেপটোন পলিপেপটাইডের প্রান্তীয় লিঙ্কেজ পলিপেপটাইড ট্রাইপেপটাইড ডাইপেপটাইড কোলাজেন	 পলিপেপটাইড পলিপেপটাইড সরল পেপটাইড ও অ্যামিনো এসিড অ্যামিনো এসিড অ্যামিনো এসিড অ্যামিনো এসিড সরল পেপপাইড
		শর্করা পরিপাককারী ১. অ্যামাইলেজ ২. মল্টেজ	 স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন মল্টোজ	 মল্টোজ গ্লুকোজ
		লিপিড পরিপাককারী ১. লাইপেজ ২. ফসফোলাইপেজ ৩. কোলেস্টেরল এস্টারেজ	 চর্বি (লিপিড) ফসফোলিপিড কোলেস্টেরল এস্টার	 ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল ফ্যাটি এসিড ফ্যাটি এসিড
	আন্ত্রিক গ্রন্থি নিঃসৃত এনজাইমসমূহ	প্রোটিন পরিপাককারী ১. অ্যামিনোপেপটাইডেজ	 পেপটাইড অণু	 অ্যামিনো এসিড
		লিপিড পরিপাককারী ১. লাইপেজ ২. অ্যালকালাইন ফসফেটেজ	 ট্রাইগ্লিসারাইড ও ডাইগ্লিসারাইড ফসফোলিপিড	 মনোগ্লিসারাইড ও ফ্যাটি এসিড গ্লিসারল, ফ্যাটি এসিড, ফসফোরিক এসিড এবং এদের বেস (যেমন-কোলিন)
		কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী ১. ল্যাক্টেজ ২. মল্টেজ ৩. সুক্রেজ ৪. অ্যামাইলেজ	 ল্যাক্টোজ মল্টোজ সুক্রোজ স্টার্চ ও ডেক্সট্রিন	 গ্লুকোজ ও গ্যালাক্টোজ গ্লুকোজ গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ সরল শর্করা
		নিউক্লিক এসিড পরিপাককারী ১. নিউক্লিয়েডেজ ২. নিউক্লিওটাইডেজ ৩. নিউক্লিওসাইডেজ	 নিউক্লিক এসিড নিউক্লিওটাইড নিউক্লিওসাইড	 মনোনিউক্লিওটাইড নিউক্লিওসাইড ও ফসফেট গ্রুপ পেন্টোজ শুগার ও নাইট্রোজেন বেস

www.Educationblog24.Com

খাদ্যবস্তুর শোষণ (Absorption of Food)

পুষ্টি অণু গ্রহণের প্রক্রিয়াকে শোষণ বলে। ক্ষুদ্রান্ত্রের ইলিয়াম অংশে পরিপাকের চূড়ান্ত পর্যায়ের শেষে উৎপন্ন পদার্থ শোষিত হয়। এর অন্তঃপ্রাচীরে অবস্থিত অসংখ্য ক্ষুদ্র অভিক্ষেপ বা **ভিলাই** (villi; একবচনে villus) শোষণের জন্য যথাযথভাবে অভিযোজিত। ভিলাইগুলোর উপরিভাগের তল **স্তম্ভাকার আবরণী কোষ** (columnar epithelial cells) দিয়ে আবৃত থাকে। মানুষের অন্ত্রে প্রায় ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) ভিলাই থাকে। ক্ষুদ্রান্ত্রে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের শোষণ প্রক্রিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

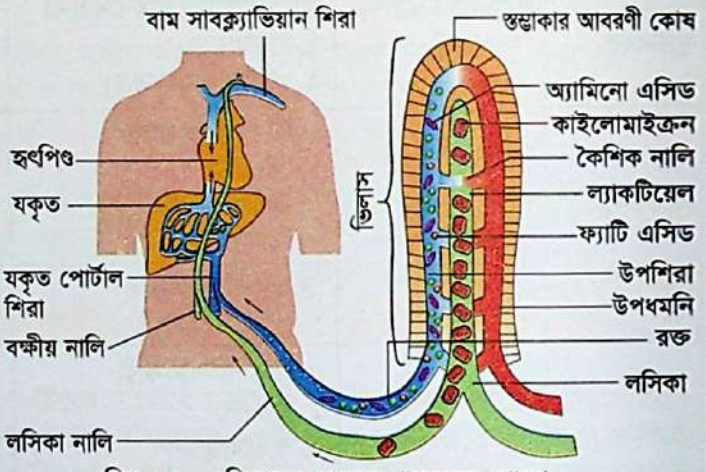

চিত্র ৩.১০ : ভিলাসের মাধ্যমে খাদ্যবস্তুর শোষণ

১. শর্করা শোষণ (Absorption of Carbohydrate) : গ্লুকোজ ও গ্যালাকটোজ ক্ষুদ্রান্ত্রের মিউকাস ঝিল্লির **কাইনেজ** নামক এনজাইমের সহায়তায় অতি দ্রুত ফসফরাস যুক্ত হয়ে সক্রিয় শোষণের মাধ্যমে শোষিত হয়ে পোর্টাল শিরার রক্তে প্রবেশ করে। ফ্রুক্টোজ, সুক্রোজ ও ল্যাকটোজ ব্যাপন প্রক্রিয়ায় শোষিত হয়। পোর্টাল শিরায় শোষিত খাদ্যসার যকৃতে মুক্ত করে।

২. আমিষ শোষণ (Absorption of Protein) : আমিষের পরিপাকজাত অ্যামিনো এসিডগুলো শোষিত হয়ে পোর্টাল শিরার রক্তে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে যকৃতে পৌঁছে। সাধারণত এল-অ্যামিনো এসিডগুলো সক্রিয় পদ্ধতিতে এবং ডি-অ্যামিনো এসিডগুলো ব্যাপন প্রক্রিয়ায় শোষিত হয়। অ্যামিনো এসিড ব্যতীত কিছু প্রোটিওজ, পেপটোন ও পলিপেপটাইড অণু অপরিবর্তিত অবস্থায় সামান্য পরিমাণে শোষিত হয়।

৩. চর্বি বা লিপিড শোষণ (Absorption of Lipid) : চর্বির পরিপাকজাত ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ভিলাইয়ের স্তম্ভাকার আবরণী কোষে প্রবেশ করে এবং পুনরায় লিপিডে পরিণত হয়। আবরণী কোষে যে প্রোটিন থাকে তা লিপিড অণুকে আবৃত করে **লিপোপ্রোটিন** কণা গঠন করে, এর নাম **কাইলোমাইক্রন** (chylomicrons)। এগুলো **এক্সোসাইটোসিস** (exocytosis, প্লাজমাঝিল্লির মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় পদার্থসমূহ কোষের বাইরে নিষ্কাশিত হওয়া) প্রক্রিয়ায় আবরণী কোষ ত্যাগ করে এবং ভিলাইয়ের লসিকা বাহিকায় প্রবেশ করে। লসিকা তখন সাদা বর্ণ ধারণ করে। এ কারণে তখন লসিকা বাহিকাকে **ল্যাকটিয়েল** (lacteal) বলে। ল্যাকটিয়েল অর্থ হচ্ছে **সাদাটে** (milky)। কাইলোমাইক্রনগুলো লসিকার মাধ্যমে লসিকাতন্ত্রের ভিতর দিয়ে হৃৎপিন্ডের কাছে শিরারক্তের প্লাজমায় প্রবেশ করে। প্লাজমায় একটি এনজাইম লিপিডকে বিশ্লিষ্ট করে আবার কোষের গ্রহণ উপযোগী ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল সৃষ্টি করে। এগুলো শ্বসনে ব্যবহৃত হয় কিংবা স্নেহ পদার্থ (fat) হিসেবে যকৃত, মেসেন্টারি বা চামড়ার নিচে সঞ্চিত থাকে।

৪. পানি শোষণ (Absorption of Water) : ক্ষুদ্রান্ত্রই পানি শোষণের প্রধান স্থল। ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাইয়ের প্রাচীরের আবরণী কোষে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি শোষিত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের শোষণের পর অবশিষ্ট পানি বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করে।

৫. খনিজ লবণ শোষণ (Absorption of Minerals) : ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাইয়ের প্রাচীরের আবরণী কোষ দ্বারা সক্রিয় পদ্ধতিতে খনিজ লবণ শোষিত হয়।

৬. ভিটামিন শোষণ (Absorption of Vitamins) : খাদ্যের ভিটামিন A, D, E, K ক্ষুদ্রান্ত্রে শোষিত হয়। সাধারণ পিত্তলবণ এ প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে। ভিটামিন C ও কয়েক প্রকার B ভিটামিন ব্যাপন ও সক্রিয় শোষণ পদ্ধতিতে ক্ষুদ্রান্ত্রের ইলিয়াম অংশে শোষিত হয়।

শোষিত খাদ্যসারের পরিণতি (Fate of absorbed Food Nutrients)

অ্যামিনো এসিড : অ্যামিনো এসিড কোষে গৃহীত হয়ে এনজাইমের সহায়তায় প্রোটিন গঠনে ব্যবহৃত হয়। অপ্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত অ্যামিনো এসিড যকৃতে পরিবর্তিত হয়ে একদিকে ইউরিয়া, অন্যদিকে শর্করা বা চর্বিতে রূপান্তরিত হয়। ইউরিয়া বর্জ্য পদার্থ। শর্করা বা চর্বি শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

গ্লুকোজ : গ্লুকোজ থেকে কোষে শক্তি উৎপন্ন হয়। কিন্তু গ্লুকোজ অন্যান্য বস্তুর সাথে মিলিত হয়ে প্রোটোপ্লাজমের ধাতব উপাদান গঠন করে এবং কিছু গ্লুকোজ যকৃত ও পেশিতে গ্লাইকোজেন হিসেবে জমা থাকে।

www.Educationblog24.Com

ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল : ফ্যাটি এসিডের পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে প্রাণী নিজ দেহের উপযোগী চর্বি তৈরি করে। ফ্যাটি এসিড প্লাজমামেমব্রেন ও নিউক্লিয়ার মেমব্রেন গঠনে ব্যবহৃত হয়। চর্বির শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা গ্লুকোজের তুলনায় দ্বিগুণ।

বৃহদন্ত্রের কাজ (Functions of Large Intestine)

খাদ্যের পরিপাক এবং পরিপাককৃত খাদ্য দেহে শোষণের পর যে অংশটুকু অপাচ্য থাকে বা শোষিত হয় না, তা বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করে। মানুষের পৌষ্টিকতন্ত্রের ক্ষুদ্রান্ত্রের ইলিয়ামের পিছন থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত মোটা, নলাকার ও খাঁজযুক্ত অংশকে বৃহদন্ত্র বলে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১.৫ মিটার। এটি তিন অংশে বিভক্ত। সম্মুখের জেজুনাম সংলগ্ন স্ফীত গোল অংশটি **সিকাম** (caecum), মধ্যবর্তী U আকৃতির বৃহৎ অংশটি **কোলন** (colon) এবং পশ্চাতের পায়ু সংলগ্ন থলি আকৃতির অংশটি **মলাশয়** (rectum)। সিকামের সাথে একটি বদ্ধ ধরনের থলি যুক্ত থাকে, এর নাম **অ্যাপেনডিক্স** (appendix)। কোলনের আবার ৪টি অংশ রয়েছে– (i) **ঊর্ধ্বমুখী কোলন** (ascending colon), (ii) **অনুপ্রস্থ কোলন** (transverse colon), (iii) **নিম্নমুখী কোলন** (descending colon) এবং (iv) **সিগময়েড কোলন** (sigmoid colon)। মানুষের বৃহদন্ত্র প্রধানত নিম্নবর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করে।

১. ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়া : বৃহদন্ত্রে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া (প্রায় ৫০০ প্রজাতির) মিথোজীবী হিসেবে বাস করে। এসব ব্যাকটেরিয়া উদ্ভিদতন্তুর সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ (যেগুলো পরিপাক করার মতো এনজাইম মানুষের পৌষ্টিকনালিতে থাকেনা) প্রভৃতির ফারমেন্টেশন ও হাইড্রোলাইসিস ঘটিয়ে ক্ষুদ্র খাদ্যাণুতে পরিণত করে।

২. শোষণ : ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে আগত পরিপাক বর্জ্যে অবস্থিত পানির প্রায় ৭০–৮০% অভিস্রবণের মাধ্যমে বৃহদন্ত্রে শোষিত হয়ে কঠিন মলের আকার ধারণ করে। কিছু পরিমাণ অজৈব লবণ, গ্লুকোজ, অ্যামিনো এসিড, ফলিক এসিড, ভিটামিন-B এবং K বৃহদন্ত্রে শোষিত হয়।

৩. ক্ষরণ : বৃহদন্ত্রের মিউকোসা স্তরে অবস্থিত **গবলেট কোষ** (goblet cell) মিউকাস ক্ষরণ করে বৃহদন্ত্রের অভ্যন্তর ভাগকে পিচ্ছিল রাখে।

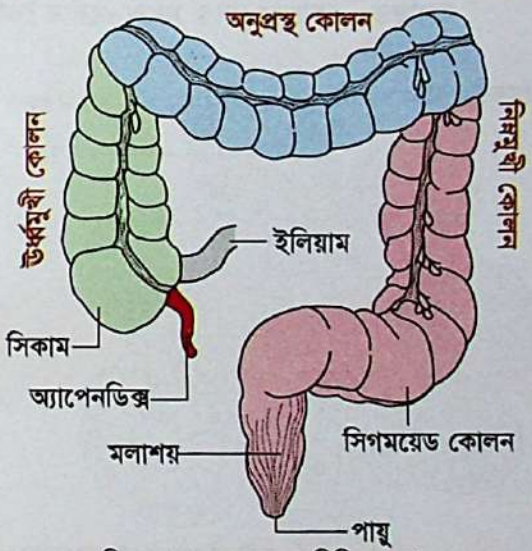

চিত্র ৩.১১ : বৃহদন্ত্রের বিভিন্ন অংশ

৪. খাদ্যের অসার অংশ সঞ্চয় : ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিপাক ও শোষণের পর খাদ্য ও পাচকরসগুলোর অবশিষ্ট উপাদান ইলিওকোলিক পেশিবলয় অতিক্রম করে সিকাম ও কোলনে প্রবেশ করে এবং সেখানে দীর্ঘসময় জমা থাকে।

৫. মল উৎপাদন : দৈনিক প্রায় ৩৫০ গ্রাম তরল মন্ড (chyle) বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করে। মন্ড থেকে শোষণের মাধ্যমে প্রায় ১৩৫ গ্রাম আর্দ্র মল (faeces) উৎপন্ন হয়ে দেহের বাইরে নিষ্ক্রান্ত হয়।

মলত্যাগ (Defaecation) : যে প্রক্রিয়ায় খাদ্যের অপাচ্য অংশ মলরূপে দেহের বাইরে নির্গত হয় তাকে **মলত্যাগ** বা **ডেফিকেশন** বা **ইজেসশন** (egestion) বলে। খাদ্যের অপাচ্য, অশোষিত ও দেহে পুষ্টিমূল্যহীন বস্তুকে **রাফেজ** (roughage) বলে। এ রাফেজ বিশেষ প্রক্রিয়ায় মলে পরিণত হয়। বৃহদন্ত্রের প্রাচীর থেকে ক্ষরিত মিউকাস **লুব্রিক্যান্ট** (lubricant) এর মতো কাজ করে ফলে মল নির্গমন সহজ হয়। মল বৃহদন্ত্রে কয়েক ঘন্টা অবস্থান করে। এ সময়ের ভিতর ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের ফলে বিভিন্ন সালফারঘটিত গ্যাস (যেমন-হাইড্রোজেন সালফাইড) উৎপন্ন হয় এবং মল দুর্গন্ধযুক্ত হয়। মল মলাশয়ে প্রবেশ করলে মলাশয়ের প্রাচীরে যে চাপ সৃষ্টি হয় তা থেকে **ডেফিকেশন প্রতিবর্তী** (defaecation reflex) ঘটে। ফলে কোলনে **পেরিস্ট্যালসিস** শুরু হয় এবং মলকে নিচের দিকে ঠেলে দেয়। উদর পেশি এবং ডায়াফ্রামের ঐচ্ছিক সংকোচনের ফলে পায়ুনালির ভিতরে স্ফিংক্টার পেশি শিথিল হয় এবং মল পায়ু পথে দেহের বাইরে বেরিয়ে আসে। পূর্ণবয়স্ক মানুষ দিনে একবার কিংবা দুবার, আর শিশুরা বেশ কয়েকবার মলত্যাগ করে।

www.Educationblog24.Com

ব্যবহারিক অংশ

স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ

❐ যকৃতের অনুচ্ছেদ (Section through liver)

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. যকৃত কতকগুলো ক্ষুদ্র খন্ড বা হেপাটিক লোবিওল (lobule)-এ বিভক্ত।

২. প্রত্যেক লোবিওল অসংখ্য বহুভুজাকার হেপাটিক কোষ (hepatic cell)-এ গঠিত।

৩. বহুভুজাকার কোষগুলো এক বা দ্বিনিউক্লিয়াসবিশিষ্ট।

৪. লোবিওলের মাঝে মাঝে সাইনুসয়েড (sinusoid) নামক ফাঁকা স্থান থাকে।

৫. প্রত্যেক লোবিওলের কেন্দ্রে একটি কেন্দ্রীয় শিরা অবস্থিত। কোষের মাঝে মাঝে রয়েছে কৈশিকনালি ও পিত্তনালি।

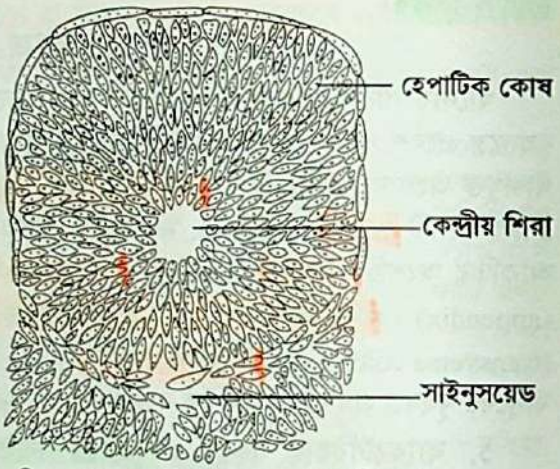

চিত্র ৩.১২ : যকৃতের অনুচ্ছেদ (অংশবিশেষ)

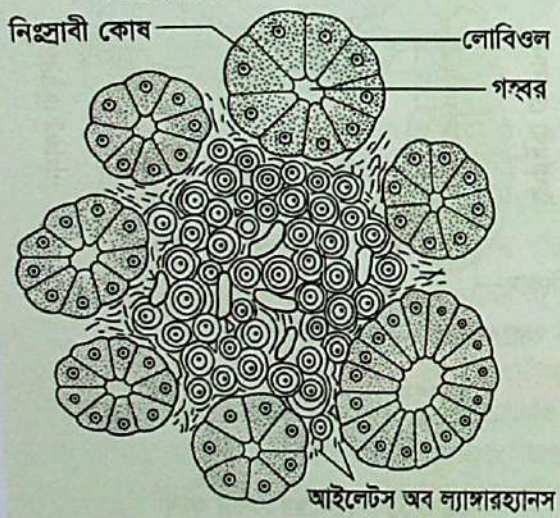

চিত্র ৩.১৩ : অগ্ন্যাশয়ের অনুচ্ছেদ (অংশবিশেষ)

❐ অগ্ন্যাশয়ের অনুচ্ছেদ

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. ক্ষরণকারী কোষে গঠিত ও কেন্দ্রীয় গহ্বরযুক্ত লোবিওল বা অ্যাসিনাস (acinus) উপস্থিত।

২. লোবিওলের ফাঁকে ফাঁকে আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স (islets of Langerhans) নামক কোষপুঞ্জ বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত।

৩. কোষগুলোর মধ্যে রক্তনালি ও অগ্ন্যাশয় নালি আছে।

৪. অ্যাসিনাসগুলোর ফাঁকে ফাঁকে যোজক টিস্যু দেখা যায়।

❐ পাকস্থলির প্রস্থচ্ছেদ

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. প্রাচীর পাঁচটি পর্যায়ক্রমিক স্তরে বিভক্ত, যথা–সেরোসা, পেশিস্তর, সাবমিউকোসা, মাসকিউলারিস মিউকোসা ও মিউকোসা।

২. পেশিস্তর বহিঃস্থ অনুদৈর্ঘ্য ও অন্তঃস্থ বৃত্তাকার পেশিতে গঠিত। সাবমিউকোসা অ্যারিওলার যোজক টিস্যুতে নির্মিত এবং রক্তনালি, স্নায়ু প্রভৃতি ধারণ করে।

৩. মিউকোসা স্তর থেকে বলী (rugae) নামক কতকগুলো অভিক্ষেপ বের হয়েছে।

৪. মিউকোসায় গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি (gastric gland) দেখা যায়।

চিত্র ৩.১৪ : পাকস্থলির প্রস্থচ্ছেদ (অংশবিশেষ)

www.Educationblog24.Com

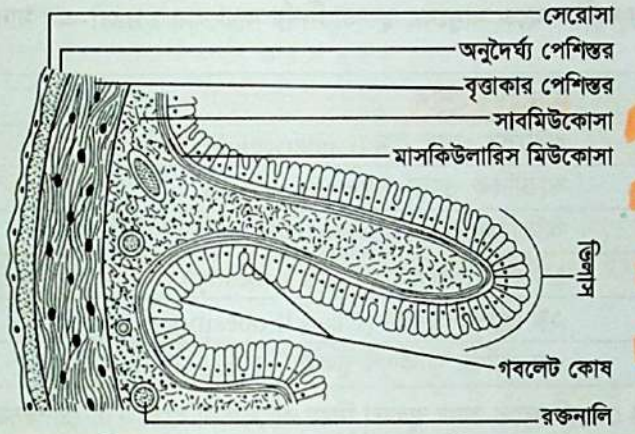

চিত্র ৩.১৫ : ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রস্থচ্ছেদ (অংশবিশেষ)

❐ ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রস্থচ্ছেদ

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. সেরোসা, পেশিস্তর, সাবমিউকোসা, মাসকিউলারিস মিউকোসা ও মিউকোসা স্তর বিদ্যমান।

২. পেশিস্তর বহিঃস্থ অনুদৈর্ঘ্য ও অন্তঃস্থ বৃত্তাকার পেশিতে গঠিত।

৩. সাবমিউকোসা অ্যারিওলার যোজক টিস্যুতে নির্মিত এবং রক্তনালি ও স্নায়ু সমৃদ্ধ।

৪. মিউকোসা থেকে **ভিলাই** (villi; একবচনে– villus) নামের আঙ্গুলের মতো কতগুলো অভিক্ষেপ বেরিয়েছে। মিউকোসাতে গবলেট ও শোষণক্ষম কোষ রয়েছে।

স্থূলতা (Obesity)

'স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল'– একটি সুপরিচিত ও জনপ্রিয় প্রবচন। আগে সাধারণ মানুষের চোখে স্বাস্থ্যবান মানুষ বলতে দীর্ঘকায় ও মোটা-সোটা ব্যক্তিকে বোঝাত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে আমরা জানতে পেরেছি যে 'মোটা-সোটা' ব্যক্তি মানেই স্বাস্থ্যবান মানুষ নয়। স্বাস্থ্যের আধুনিক সংজ্ঞা হচ্ছে : **রোগ-ব্যাধি বা অন্যান্য অস্বাভাবিক পরিস্থিতিমুক্ত শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক মঙ্গলকর অবস্থাকে স্বাস্থ্য বলে** (Mosby's Medical Dictionary, 8th edition, 2009)। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী, স্থূলতাকে স্বাস্থ্যের পরিবর্তে অসুস্থতা হিসেবে বিবেচনা করে চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক নতুন শাখার সৃষ্টি হয়েছে।

আদর্শ দৈহিক ওজনের ২০% বা তারও বেশি পরিমাণ মেদ দেহে সঞ্চিত হলে তাকে স্থূলতা বলে। স্থূলতার ফলে দেহের ওজন স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যায়। পূর্ণবয়স্ক মানুষে দেহের মাত্রাতিরিক্ত ওজন নির্ধারণের জন্য উচ্চতা ও ওজনের যে আনুপাতিক হার উপস্থাপন করা হয় তাকে **দেহের ওজন সূচক বা বডি মাস ইনডেক্স** (Body Mass Index = BMI) বলে। BMI কে নিম্নরূপে প্রকাশ করা হয়।

$$\text{BMI} = \frac{\text{দেহের ওজন (কিলোগ্রাম)}}{\text{ব্যক্তির উচ্চতা (মিটার}^2\text{)}}$$

একজন স্বাভাবিক মানুষের BMI - এর বিস্তৃতি হলো ২৫ - ২৯.৯৯ পর্যন্ত অর্থাৎ এই মান ৩০ বা তার চেয়ে বেশি হলে তাকে **স্থূলকায় বা মোটা** বলা যাবে।

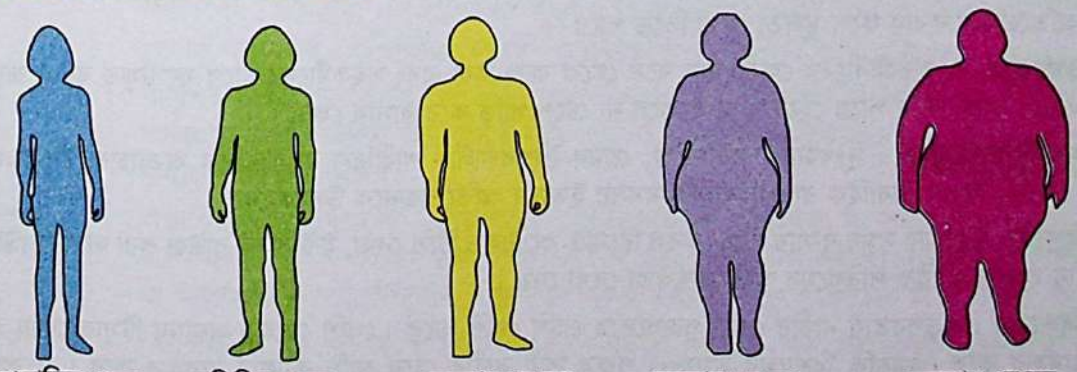

চিত্র ৩.১৫ : BMI নির্ণয়

পাশাপাশি এই মান ১৮.৫ এর নিচে হলে তাকে নিম্ন মাত্রার ওজন ধরা হয়। তবে মাত্রা যদি ৫০-১০০ হয় তবে এই স্থূলতাকে **মরবিড স্থূলতা** (morbid obesity) বা ব্যাধিগ্রস্থ বিভৎস স্থূলতা বলে। ২০০০ সালে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)

www.Educationblog24.Com

BMI-এর এই মান নির্দেশিকা প্রকাশ করে। এর সাহায্যে অতি সহজে মানুষের স্থূলতা নির্ণয় করা যায়। BMI-এর মান নির্দেশিকাটি নিচের ছকে প্রকাশ করা হলো –

ক্রমিক	বিএমআই (BMI)	মানুষের শ্রেণি
1	<18.5 kg/m²	শরীরের ওজন কম (Underweight)
2	18.5 – 24.99 kg/m²	স্বাভাবিক ওজন (Normal weight)
3	25.0 – 29.99 kg/m²	অতিরিক্ত ওজন (Overweight)
4	30.0 – 34.99 kg/m²	১ম শ্রেণির স্থূলতা (Class I obesity)
5	35.0 – 39.99 kg/m²	২য় শ্রেণির স্থূলতা (Class II obesity)
6	≥ 40.0 kg/m²	৩য় শ্রেণির ঝুঁকিপূর্ণ স্থূলতা (Class III obesity)

স্থূলতার ব্যাপকতায় সারা পৃথিবীর চিকিৎসা ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে আজ স্থূলতা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি শাখাও সৃষ্টি হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের যে শাখায় স্থূলতার কারণ, প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় তাকে **বেরিয়াট্রিকস** (Bariatrics) বলে। স্থূলতার কারণে যে সব রোগ হতে পারে তার মধ্যে রয়েছে–করোনারি হৃদরোগ, টাইপ–২ ডায়াবেটিস, ক্যান্সার (স্তন, কোলন), উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক, যকৃত ও পিত্তথলির অসুখ, স্লিপ অ্যাপনিয়া, অস্টিও-আর্থ্রাইটিস, বন্ধ্যাত্ব ইত্যাদি।

স্থূলতার কারণ (Causes of Obesity)

ব্যক্তি পর্যায়ে অতিরিক্ত ক্যালরি গ্রহণ, কিন্তু পর্যাপ্ত কায়িক পরিশ্রম না করাকে স্থূলতার প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। অন্যদিকে, সামাজিক পর্যায়ে সুলভ ও মজাদার খাবার, গাড়ীর উপর নির্ভরতা বেড়ে যাওয়া এবং উৎপাদন যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহারকে স্থূলতা বৃদ্ধির কারণ বলে মনে করা হয়। তবে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা যে সব কারণকে স্থূলতার জন্য বিশেষভাবে দায়ী করেছেন তা নিচে উল্লেখ করা হলো।

১. **জিনগত** : সফল বিপাক এবং দেহে মেদ সঞ্চয় ও বিস্তারের ক্ষেত্রে গুচ্ছ জিন ভূমিকা পালন করে। স্থূলকায় বাবা-মায়ের সন্তান প্রায় ৮০ ভাগ ক্ষেত্রে স্থূলকায় হয়। নিম্ন বিপাক হার এবং জিনগত সংবেদনশীলতা স্থূলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

২. **পারিবারিক জীবনযাত্রা** : পরিবারের জীবনযাত্রার উপর স্থূলতা প্রকাশ অনেকখানি নির্ভর করে। খাদ্যাভ্যাস পারিবারিকভাবেই গড়ে উঠে। চর্বিযুক্ত ফাস্টফুড (বার্গার, পিৎজা ইত্যাদি) খাওয়া, ফল, সব্জি ও অপরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট (লাল চালের ভাত) না খাওয়া, অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় পান করা; দামী রেস্তোঁরায় খাওয়ার আগে ক্ষুধাবর্ধক ও খাওয়ার শেষে চর্বি ও চিনিযুক্ত ডেসার্ট (dessert) খাওয়া।

৩. **আবেগ** : বিষণ্নতা, আশাহীনতা, ক্রোধ, একঘেঁয়েমিজনিত বিরক্তি, নিজেকে ছোট ভাবা প্রভৃতি মানষিক কারণে ক্রমাগত অতিভোজন করার ফলে স্থূলতা দেখা দিতে পারে ।

৪. **কর্মক্ষেত্র** : চাকুরিজীবীদের ক্ষেত্রে ঠায় বসে থেকে কাজ করা এবং সহকর্মীদের চাপে ফাস্টফুড বা এ জাতীয় খাবার খাওয়া। কাজ শেষে পায়ে হেঁটে বা সাইকেলে না চেপে গাড়ি করে বাসায় ফেরা।

৫. **মানসিক আঘাত** : দুঃখজনক ঘটনাবলী, যেমন-শৈশবকালীন শারীরিক বা মানসিক অত্যাচার; পিতা-মাতা হারানোর বেদনা; কিংবা বৈবাহিক বা পারিবারিক সমস্যা ইত্যাদি অতিভোজনকে উসকে দেয়।

৬. **বিশ্রাম** : বিশ্রামের সময় বাসায় বসে কেবল রিমোট-কন্ট্রোলড টিভি দেখা, ইন্টারনেট ব্রাউজ করা বা কম্পিউটারে গেম খেলার কারণে কায়িক পরিশ্রমের অভাবে স্থূলতা দেখা দেয়।

৭. **লিঙ্গভেদ** : গড়পরতায় নারীর চেয়ে পুরুষদেহে বেশি পেশি থাকে। পেশি যেহেতু অন্যান্য টিস্যুর চেয়ে বেশি ক্যালরি ব্যবহার করে (এমনকি বিশ্রামের সময়ও) পুরুষ তাই নারীর চেয়ে বেশি ক্যালরি ব্যবহার করে। এ কারণে নারী-পুরুষ একই পরিমাণ আহার করলেও নারীদেহে মেদ জমার আশঙ্কা বেশি থাকে।

৮. **গর্ভাবস্থা** : প্রতিবার গর্ভধারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীদেহে ৪-৬ পাউন্ড ওজন বেড়ে যায়।

৯. **নিদ্রাহীনতা** : রাতে ৬ ঘন্টার কম ঘুম হলে দেহে হরমোনজনিত পরিবর্তন ঘটে ক্ষুধা বেড়ে যায় ফলে বেশি পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করায় স্থূলতার সৃষ্টি হয়।

www.Educationblog24.Com

১০. শিক্ষার অভাব : সুস্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারণা না থাকা, সুষম খাদ্য সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, স্থূলতার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে না জানা ইত্যাদি কারণে স্থূলতা দেখা দেয়।

১১. অসুখ : পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম (Polycystic Ovary Syndrome) হলে নারীদেহে স্থূলতা দেখা দিতে পারে। তা ছাড়া, কুসিং সিনড্রোম (Cushing's Syndrome), হাইপোথাইরয়ডিজম (Hyporthyroidism) হলেও স্থূলতা হতে পারে।

১২. কতক ওষুধ : কিছু ওষুধ স্থূলতার সম্ভাবনাকে বাড়াতে পারে, যেমন–কর্টিকোস্টেরয়েডস, বিষণ্নতা দূর করার ওষুধ (অ্যান্টিডিপ্রেসেন্টস), জন্মবিরতিকরণ বড়ি প্রভৃতি। তাছাড়া ইনসুলিন ও কিছু ডায়াবেটিক প্রতিষেধক ওষুধও স্থূলতা সৃষ্টি করে।

স্থূলতা প্রতিরোধ (Prevention of Obesity)

স্থূলতাজনিত ঝুঁকির মধ্যে কেউ থাক বা না থাক সবারই এ বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত। স্থূলতা প্রতিরোধের জন্য নিচে উল্লেখিত আচরণ-কেন্দ্রিক বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ, পালন ও অনুসরণ করতে হবে।

১. নিয়মিত ব্যায়াম : সপ্তাহে অন্তত ১৫০–২৫০ মিনিট দ্রুত হাঁটা বা সাঁতার কাটার অভ্যাস করতে হবে।

২. স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যগ্রহণ : কম ক্যালোরি ও পুষ্টিসমৃদ্ধ ফল, সব্জি ও গোটা শস্য দানা গ্রহণ করতে হবে।

৩. খাদ্য নিয়ন্ত্রণ : চর্বিযুক্ত খাবার, মিষ্টিসমৃদ্ধ আহার গ্রহণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। অ্যালকোহল গ্রহণ নিষিদ্ধ করতে হবে।

৪. লোভনীয় খাবার পরিহার : লোভনীয় খাবারের দিকে হাত বাড়ানো ঠিক নয়। ভুক্তভোগীরা যেন আহার গ্রহণের সময় তাদের জন্য নির্ধারিত খাবার তালিকা কঠোরভাবে মেনে চলেন সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

৫. দেহের ওজন নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা : প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত অন্তত একবার নিজের ওজন মেপে দেখতে হবে রুটিন অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণের প্রভাব কতখানি সফল হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদী ফল পেতে হলে খাদ্য ও ব্যায়াম সংক্রান্ত তালিকার প্রতি অটল ও বিশ্বস্ত থাকতে হবে।

৬. চিকিৎসা : Orlistat (Xenical), Lorcaserin (Belviq), Phentermine (Suprenza) প্রভৃতি ওষুধ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়ে থাকে। স্থূলতা প্রতিকারে মানুষ আজ ঝুঁকিপূর্ণ অস্ত্রোপচারেও পিছপা হচ্ছে না।

প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

কাইম : পাকস্থলিতে খাদ্য প্রবেশের পর পাকস্থলির পেশির সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্যদলা গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি নিঃসৃত গ্যাস্ট্রিক জুসের সাথে মিশে দলিত মথিত হয়ে নরম পিচ্ছিল খাদ্যপিণ্ডে পরিণত হয়। একে কাইম (chyme) বলে।

এপিগ্লটিস : মানুষসহ বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীর জিহ্বার একেবারে গোড়ায় (গলবিলে) সংযুক্ত একটি ক্ষুদ্র নমনীয় অঙ্গবিশেষ। খাদ্যদ্রব্য গলাধঃকরণের সময় এটি শ্বাসরন্ধ্রকে (গ্লটিস) আবৃত করে শ্বাসনালিতে খাদ্য প্রবেশে বাধা দেয়। এপিগ্লটিস স্থিতিস্থাপক তরুণাস্থি ও শ্লেষ্মাস্তর দিয়ে গঠিত।

লালা : মানুষের মুখের তিনজোড়া লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত একপ্রকার বর্ণহীন জলীয় দ্রবণের নাম লালা। লালায় অবস্থিত মিউসিন খাদ্যদ্রব্যকে নরম ও পিচ্ছিল করে এবং টায়ালিন ও মল্টেজ এনজাইম শর্করা খাদ্যকে পরিপাক করে।

অগ্ন্যাশয় : অগ্ন্যাশয় একটি মিশ্রগ্রন্থি। অগ্ন্যাশয়ের লোবিওল নামক বহিঃক্ষরা বা সনালগ্রন্থি নিঃসৃত অগ্ন্যাশয় রসের নানা প্রকার এনজাইম খাদ্য পরিপাক করে এবং আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স নামক অন্তঃক্ষরা বা অনালগ্রন্থি নিঃসৃত ইনসুলিন ও গ্লুকাগন নামক হরমোন রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

সিকাম : মেরুদন্ডী প্রাণীর ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রের সংযোগস্থলে অবস্থিত বদ্ধ থলির মতো স্ফীত অংশের নাম সিকাম। মাংসাশী প্রাণীর সিকাম ক্ষুদ্রাকৃতির হয়। কিন্তু অধিকাংশ তৃণভোজী প্রাণীর ক্ষেত্রে এটি বেশ বড় ও সুগঠিত থাকে। এখানে সেলুলোজ পরিপাক হয়। মানুষের ক্ষেত্রে এটি একটি লুপ্তপ্রায় অঙ্গ।

ডিঅ্যামিনেশন : যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অ্যামিনো এসিড থেকে অ্যামিন মূলক ($-NH_2$) অপসারিত হয় তাকে ডিঅ্যামিনেশন বলে। যকৃত অতিরিক্ত ও অব্যবহৃত অ্যামিনো এসিড ডিঅ্যামিনেশন প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে কিটো এসিড ও অ্যামিন মূলক তৈরি করে।

www.Educationblog24.Com

লাইপোজেনেসিস: যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ থেকে লিপিড সৃষ্টি হয় তাকে **লাইপোজেনেসিস** বলে। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা যদি এমন পরিমাণ বেড়ে যায় যে তা শক্তি উৎপাদন ও গ্লাইকোজেন সঞ্চয় ক্ষমতার মাত্রাকে ছাড়িয়ে যায় তখন ইনসুলিন হরমোনের প্রভাবে যকৃত অতিরিক্ত গ্লুকোজকে ট্রাইগ্লিসারাইডে (লিপিড) রূপান্তর করে।

গ্লাইকোজেনোলাইসিস : যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যকৃতের সঞ্চিত গ্লাইকোজেন ভেঙে গ্লুকোজ তৈরি হয় তাকে **গ্লাইকোজেনোলাইসিস** বলে। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমে গেলে গ্লাইকোজেনোলাইসিস প্রক্রিয়ায় যকৃতে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন ভেঙে গ্লুকোজ তৈরি হয় এবং রক্তে মিশে যায়।

মেমব্রেন এনজাইম : অন্ত্রের অন্তঃপ্রাচীরে বিদ্যমান মাইক্রোভিলাইয়ের কোষের প্লাজমা মেমব্রেনে কতগুলো এনজাইম পরিপাক ক্রিয়ায় নিয়োজিত থেকে সর্বদা শর্করা, আমিষ ও ফসফেট জাতীয় যৌগকে পরিপাক করে। মাইক্রোভিলাই কোষের প্লাজমা মেমব্রেনে বিদ্যমান এসব এনজাইমকে **মেমব্রেন এনজাইম** বলে।

গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল হরমোন : খাদ্য পরিপাকের সকল প্রক্রিয়া কয়েকটি হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। খাদ্য পরিপাকের সাথে জড়িত সকল হরমোন পাকস্থলি ও অন্ত্রের মিউকোসা স্তরের কোষ থেকে ক্ষরিত হয়। এসব হরমোন রাসায়নিকভাবে পেপটাইড জাতীয় এবং সামগ্রিকভাবে **গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল হরমোন** বা **জিআই হরমোন** নামে পরিচিত।

স্থূলতা : দেহের ওজন অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ার কারণে যে স্বাস্থ্যগত সমস্যা সৃষ্টি হয় তাকেই স্থূলতা (obesity) বলে। এক্ষেত্রে চর্বি জমার কারণে দেহের উচ্চতার তুলনায় ওজন অনেক বেড়ে যায় যা বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটায়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মানুষের অ্যাপেনডিক্স পরিপাক নালির কোন অংশের সাথে যুক্ত ?
ক) জেজুনাম খ) ইলিয়াম
গ) সিকাম ঘ) কোলন

২. পরিপাকে সাহায্যকারী হরমোন কোনটি ? [চ.বো.১৫]
ক) গ্লুকাগন খ) এড্রিন্যালিন
গ) ইনসুলিন ঘ) সিক্রেটিন

৩. সাইনুসয়েড পাওয়া যায় কোথায় ?
ক) যকৃতে খ) অগ্ন্যাশয়ে
গ) ফুসফুসে ঘ) হৃৎপিণ্ডে

৪. কোনটিকে মানবদেহের ল্যাবরেটরি বলা হয় ? [ব.বো.১৫]
ক) যকৃত খ) অগ্ন্যাশয়
গ) হৃৎপিন্ড ঘ) ফুসফুস

৫. ক্ষুদ্রান্ত্রের অংশ নয় কোনটি ? [ঢা.বো.১৫]
ক) ডিওডেনাম খ) সিকাম
গ) জেজুনাম ঘ) ইলিয়াম

৬. মানুষের মুখের দুপাশে কয়জোড়া লালাগ্রন্থি আছে ?
ক) ২ খ) ৩
গ) ৪ ঘ) ৬

৭. নিচের কোন এনজাইম অম্লীয় পরিবেশে অধিক কার্যকরী ?
ক) ট্রিপসিন খ) ইরেপসিন
গ) পেপসিন ঘ) কাইমোট্রিপসিন

৮. কোনটি দুগ্ধ প্রোটিন পরিপাককারী এনজাইম ?
ক) রেনিন খ) কেসিন
গ) পেপসিন ঘ) ট্রিপসিন

৯. আমাদের প্রতি চোয়ালের সামনে কয়টি কর্তন দাঁত আছে ?
ক) ১টি খ) ২টি
গ) ৩টি ঘ) ৪টি

১০. দুধ দাঁতে অনুপস্থিত থাকে কোনটি ?
ক) ইনসিসর খ) ক্যানাইন
গ) প্রিমোলার ঘ) মোলার

১১. 'কেসিন' কোন ধরনের উপাদান ?
ক) শর্করা খ) প্রোটিন
গ) ফ্যাট ঘ) ভিটামিন

১২. ভাত মুখগহ্বরে রাখলে কী ঘটবে ?
ক) খাদ্য কাইমে পরিণত হবে
খ) ইমালসিফিকেশন হবে
গ) খাদ্য পলিপেপটাইডে পরিণত হবে
ঘ) খাদ্য মল্টোজ-এ পরিণত হবে

১৩. গলবিলে উন্মুক্ত হয় না কোনটি ? [ব.বো.১৭]
ক) শ্বাসনালি খ) অন্ননালি
গ) ইউস্টেশিয়ান নালি ঘ) উইর্সাং এর নালি

www.Educationblog24.Com

লাল-সবুজে দাগানো

TEXT BOOK

প্রাণিবিজ্ঞান

উন্মেষ

মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল এডমিশন কেয়ার

www.Educationblog24.Com

৪ মানব শারীরতত্ত্ব : রক্ত ও সঞ্চালন
Human Physiology : Blood & Circulation

মানবদেহের অভ্যন্তরে এক বিশেষ তন্ত্র খাদ্যসার, শ্বসন গ্যাস ও রেচন বর্জ্য পরিবহন এবং দেহের তাপমাত্রা ও বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন অঙ্গ ও তন্ত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও রোগজীবাণু প্রতিরোধের কাজে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত। এর নাম রক্ত সংবহনতন্ত্র। **রক্তবাহিকাসমৃদ্ধ এবং হৃৎপিন্ড দিয়ে নিয়ন্ত্রিত যে তন্ত্রের মাধ্যমে রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশে সঞ্চালিত হয় তাকে রক্ত সংবহনতন্ত্র বলে।** ব্রিটিশ চিকিৎসক Willium Harvey, 1628 খ্রিস্টাব্দে মানুষের রক্ত সংবহন সম্পর্কে সর্বপ্রথম ধারণা প্রদান করেন। এ অধ্যায়ে মানব রক্ত সংবহনতন্ত্র এবং এর কিছু জটিলতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রধান শব্দাবলি (Key words)

- রক্ত
- রক্ত তঞ্চন
- ব্যারোরিসেপ্টর
- পেসমেকার
- লসিকা
- হৃৎচক্র
- অ্যানজাইনা
- প্লাক

পিরিয়ড সংখ্যা-১৪ : এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে (শিখনফল)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. রক্তকণিকা ও লসিকা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।	● রক্তকণিকা ও লসিকা
২. রক্ত জমাট বাঁধার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● রক্ত জমাট বাঁধা
৩. ব্যবহারিক : রক্তের কণিকাসমূহ শনাক্ত ও চিত্র অংকন করতে পারবে।	● ব্যবহারিক ○ রক্ত কণিকাসমূহের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ
৪. হৃৎপিণ্ডের গঠন বর্ণনা করতে পারবে।	● হৃৎপিন্ডের গঠন
৫. হার্টবিটের দশাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● হার্টবিট, বিভিন্ন দশা ও এর নিয়ন্ত্রণে SA নোড, BM নোড এবং পারকিনজি আঁশের ভূমিকা
৬. হার্টবিট নিয়ন্ত্রণে SA নোড, BM নোড এবং পারকিনজি আঁশের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● রক্তচাপ ও ব্যারোরিসেপ্টর এবং আয়তন রিসেপ্টরের ভূমিকা
৭. রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যারোরিসেপ্টর এবং আয়তন রিসেপ্টরের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● মানবদেহে রক্ত সংবহন ○ সিস্টেমিক সংবহনতন্ত্র ○ পালমোনারি সংবহন
৮. মানবদেহের রক্ত সংবহন পদ্ধতির তুলনা করতে পারবে।	● হৃদরোগের বিভিন্ন অবস্থায় করণীয় ○ বুকের ব্যাথা ○ হার্ট এটাক ○ হার্ট ফেইলিউর
৯. হৃদরোগের বিভিন্ন অবস্থা ও করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● হৃদরোগের চিকিৎসার ধারণা ○ পেস মেকার কার্যক্রম ○ ওপেন হার্ট সার্জারি ○ করোনারি বাইপাস ○ এনজিওপ্লাস্টি
১০. হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক রক্ত সঞ্চালনে পেস মেকারের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবে।	
১১. ওপেন হার্ট সার্জারি, করোনারি বাইপাস এবং এনজিওপ্লাস্টির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	

রক্ত (Blood)

রক্ত হচ্ছে মানুষের জীবন রক্ষাকারী এক বিশেষ তরল যোজক টিস্যু যার মাধ্যমে বিভিন্ন রক্তবাহিকা দেহের সকল কোষে পুষ্টি, ইলেক্ট্রোলাইট, হরমোন, ভিটামিন, অ্যান্টিবডি, O_2, ইমিউন কোষ ইত্যাদি বহন করে এবং CO_2 ও বর্জ্য পদার্থ প্রত্যাহৃত হয়। একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষের দেহে প্রায় ৫–৬ লিটার রক্ত থাকে অর্থাৎ দেহের মোট ওজনের প্রায় ৮%। রক্ত সামান্য ক্ষারীয়। এর p^H মাত্রা ৭.৩৫-৭.৪৫ (গড়ে ৭.৪০) এবং তাপমাত্রা ৩৬-৩৮° সেলসিয়াস। রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব পানির চেয়ে বেশি, প্রায় ১.০৬৫। অজৈব লবণের উপস্থিতির জন্য রক্তের স্বাদ নোনতা। সুনির্দিষ্ট বাহিকার মাধ্যমে রক্ত দেহের সবখানে সঞ্চালিত হয়।

রক্তের উপাদান (Components of Blood)

টেস্টটিউবে রক্ত নিয়ে সেন্ট্রিফিউগাল যন্ত্রে ঘুরালে রক্ত দুটি স্তরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। উপরের হালকা হলুদ বর্ণের প্রায় ৫৫% যে অংশ থাকে তা **রক্তরস** বা **প্লাজমা** (plasma) এবং নিচের গাঢ়তর বাকি ৪৫% অংশ **রক্তকণিকা** (blood corpuscles)। স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তকণিকাগুলো রক্তরসে ভাসমান থাকে। লোহিত কণিকার আধিক্যের কারণে রক্ত লাল দেখায়।

www.Educationblog24.Com

রক্তরস বা প্লাজমা (Plasma)

রক্তরস বা প্লাজমা হচ্ছে রক্তের হালকা হলুদ বর্ণের তরল অংশ। এতে পানির পরিমাণ ৯০–৯২% এবং দ্রবীভূত কঠিন পদার্থের পরিমাণ ৮–১০%। রক্তরসের কঠিন পদার্থ বিভিন্ন জৈব (৭–৯%) ও অজৈব (০.৯%) উপাদান নিয়ে গঠিত। তা ছাড়া, কয়েক ধরনের গ্যাসও রক্তরসে পাওয়া যায়। রক্তরসে নিম্নোক্ত উপাদানগুলো উপস্থিত।

ক. অজৈব পদার্থ (Inorganic constituents) : রক্তরসে অজৈব পদার্থের পরিমাণ প্রায় ০.৯%। এর মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম বাইকার্বোনেট, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ, তামা, আয়োডিন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

খ. জৈব পদার্থ (Organic constituents) : রক্তের জৈব উপাদানগুলো হচ্ছে:

i. **প্লাজমা প্রোটিন** (Plasma protein) : জৈব পদার্থের মধ্যে প্লাজমা প্রোটিনের পরিমাণ প্রায় ৭.৫%। প্লাজমা প্রোটিনের মধ্যে অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন, প্রোথ্রম্বিন, ফাইব্রিনোজেন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ii. **নাইট্রোজেনঘটিত রেচন পদার্থ** (Nitrogenous excretory products): রেচন পদার্থের মধ্যে রয়েছে– ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, ক্রিয়েটিনিন, জ্যানথিন, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি।

iii. **অন্যান্য পদার্থ** : গ্লুকোজ, ফ্যাট, কোলেস্টেরল, হরমোন, বিভিন্ন প্রকার এনজাইম রক্তরসে অবস্থান করে। বিভিন্ন ভিটামিন, রঞ্জক পদার্থ (বিলিরুবিন, ক্যারোটিন) ইত্যাদিও রক্তরসে পাওয়া যায়।

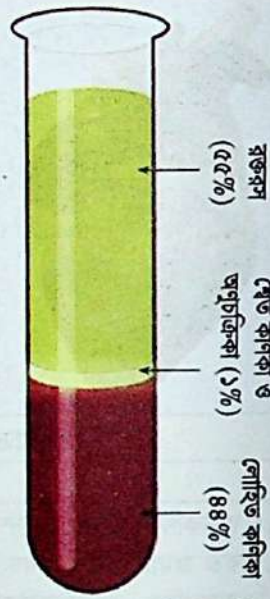

চিত্র ৪.১ রক্তরস ও কণিকার পরিমাণ

রক্তরসের কাজ : (i) রক্তের তরলতা রক্ষা করে এবং ভাসমান রক্ত কণিকাসহ অন্যান্য দ্রবীভূত পদার্থ দেহের সর্বত্র পরিবাহিত হয়। (ii) পরিপাকের পর খাদ্যসার রক্তরসে দ্রবীভূত হয়ে দেহের বিভিন্ন টিস্যু ও অঙ্গে বাহিত হয়। (iii) টিস্যু থেকে যে সব বর্জ্যপদার্থ বের হয় তা রেচনের জন্য বৃক্কে নিয়ে যায়। (iv) টিস্যুর অধিকাংশ কার্বন ডাইঅক্সাইড রক্তরসে বাইকার্বনেটরূপে দ্রবীভূত থাকে। (v) অল্প পরিমাণ অক্সিজেন বাহিত হয়। (vi) লোহিত কণিকায় সংবদ্ধ হওয়ার আগে অক্সিজেন প্রথমে রক্তরসেই দ্রবীভূত হয়। (vii) রক্তরসের মাধ্যমে হরমোন, এনজাইম, লিপিড প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গে বাহিত হয়। (viii) রক্তরস রক্তের অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা করে। (ix) রক্ত জমাট বাঁধার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো পরিবহন করে। (x) যকৃত, পেশি ইত্যাদি অঙ্গে উৎপন্ন তাপ শক্তিকে সমগ্র দেহে পরিবহন করে দেহে তাপের সমতা রক্ষা করে।

রক্তকণিকা (Blood Corpuscles)

রক্তে ভাসমান বিভিন্ন কোষকে রক্তকণিকা বলা হয়। এগুলো হিমাটোপয়েসিস (hematopoiesis) প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়। অন্যান্য কোষের মতো স্ববিভাজিত হয়ে সৃষ্টি হয় না বলে এদের কোষ না বলে কণিকা বলা হয়। রক্তের ৪৫% হলো রক্তকণিকা যা রক্তরসের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। রক্তকণিকা তিন ধরনের, যথা– এরিথ্রোসাইট বা লোহিত রক্তকণিকা, লিউকোসাইট বা শ্বেত রক্তকণিকা ও প্লেইটলেট বা অণুচক্রিকা।

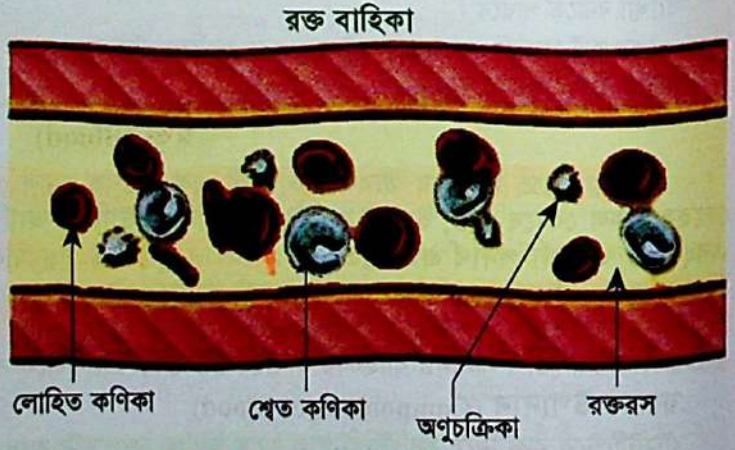

চিত্র ৪.২ : রক্তের উপাদানসমূহ

www.Educationblog24.Com

নিচের ছকের মাধ্যমে রক্তের উপাদানগুলো দেখানো হলো।

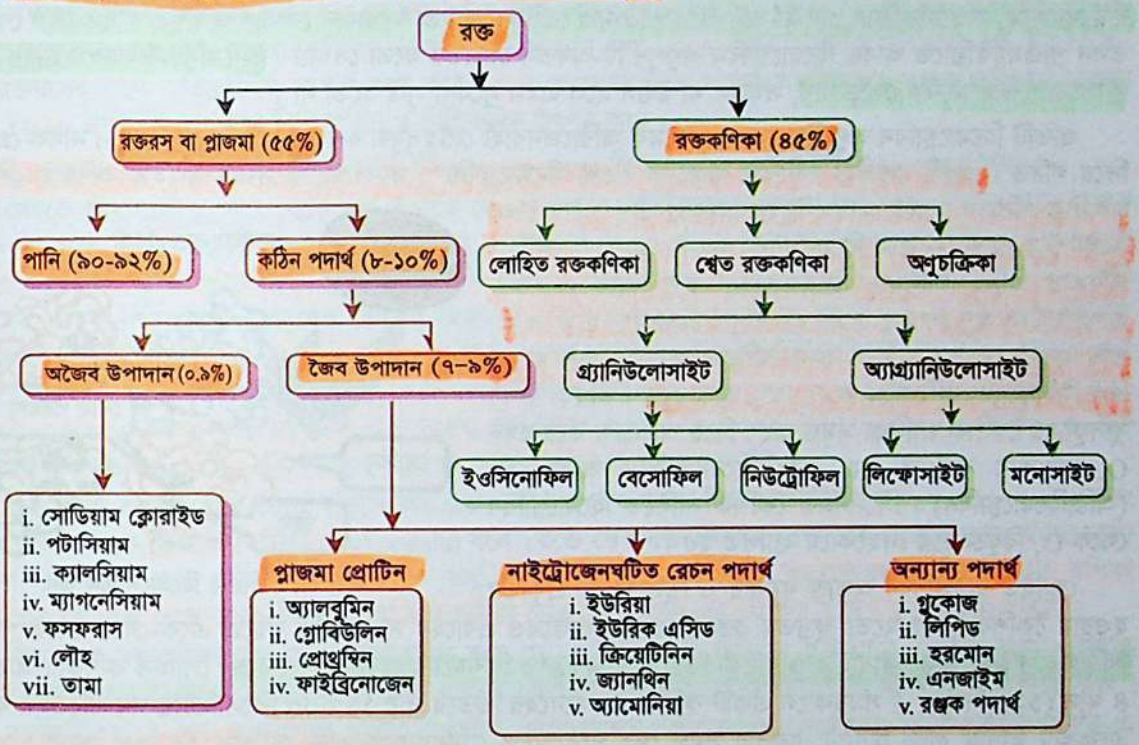

১. লোহিত রক্তকণিকা বা এরিথ্রোসাইট (Erythrocyte; গ্রিক, *erythros* = লোহিত + *kytos* = কোষ)

মানবদেহের রক্তরসে ভাসমান গোল, দ্বি-অবতল চাকতির মতো, নিউক্লিয়াসবিহীন কিন্তু অক্সিজেনবাহী হিমোগ্লোবিনযুক্ত, লাল বর্ণের কণিকাকে **লোহিত রক্তকণিকা** বলে। এ ধরনের কণিকার গড় ব্যাস ৭.৩ μm ও গড় স্থূলতা ২.২μm, এবং কিনারা অপেক্ষা মধ্যভাগ অনেক পাতলা। স্তন্যপায়ী প্রাণিদের মধ্যে কেবল উটের লোহিত কণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে-এ তথ্যটি ভুল। উটের এরিথ্রোসাইটও নিউক্লিয়াসবিহীন, তবে কণিকার আকার কিছুটা ভিন্নতর।

বিভিন্ন বয়সের মানবদেহে প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে রক্তকণিকার সংখ্যা হচ্ছে: ভ্রূণদেহে ৮০–৯০ লাখ; শিশুর দেহে ৬০–৭০ লাখ; পূর্ণবয়স্ক পুরুষে ৫৪ লাখ; পূর্ণবয়স্ক স্ত্রীদেহে ৪৮ লাখ। বিভিন্ন শারীরিক অবস্থায় এ সংখ্যার তারতম্য ঘটে, যেমন– ব্যায়াম ও গর্ভাবস্থায় কণিকার সংখ্যা বেশি হয়।

মানব ভ্রূণের প্রাথমিক পর্যায়ে (তিন সপ্তাহ বয়সে) কুসুম থলিতে, মাধ্যমিক পর্যায়ে (ছয় মাস বয়স পর্যন্ত) যকৃত এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় থেকে পর্শুকা, কশেরুকা, স্টার্ণাম ও শ্রোণিচক্রের লাল অস্থিমজ্জায় অবস্থিত বড় নিউক্লিয়াসযুক্ত **এরিথ্রোব্লাস্ট** (erythroblast) নামক স্টেমকোষ থেকে অবিরাম লোহিত কণিকা সৃষ্টি হয়। এ সময় হিমোগ্লোবিন সংশ্লেষিত হয় এবং একটি এরিথ্রোব্লাস্ট কয়েকবার মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়। লোহিত কণিকা পরিস্ফুটনের সময় নিউক্লিয়াস সংকুচিত ও অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং অবশেষে **এক্সোসাইটোসিস** (exocytosis; প্লাজমাঝিল্লির মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় পদার্থসমূহ

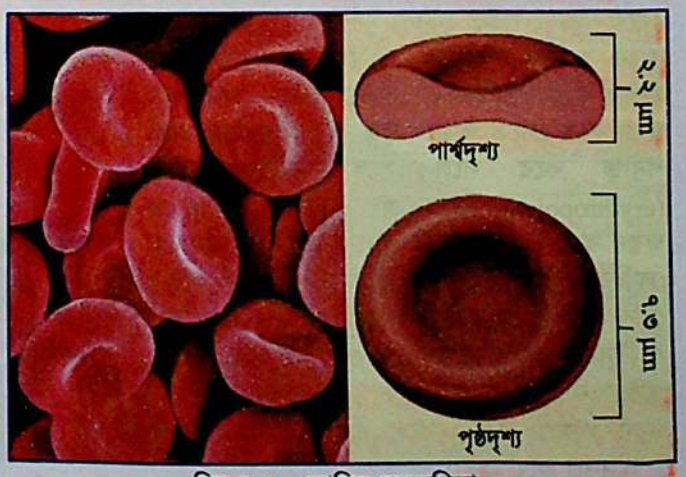

চিত্র ৪.৩ : লোহিত রক্তকণিকা

www.Educationblog24.Com

কোষের বাইরে নিষ্কাশিত হওয়া) প্রক্রিয়ায় রক্তরসে পরিত্যক্ত হয়। নিউক্লিয়াস না থাকায় আর বিভাজনও ঘটে না। তখন রাইবোজোম, মাইটোকন্ড্রিয়া, গলজি বস্তু, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ইত্যাদি প্রধান কোষীয় অঙ্গাণুও বর্জিত হয়। কোষটি তখন প্লাজমাঝিল্লিতে আবদ্ধ হিমোগ্লোবিন অণুপূর্ণ দ্বি-অবতল চাকতির মতো দেখায়। কণিকা দ্বি-অবতল হওয়ায় গ্যাস ব্যাপনের ক্ষেত্র অনেক বেড়ে যায়, সমতল বা উত্তল হলে এমন সুযোগ সৃষ্টি হতো না।

প্রতিটি হিমোগ্লোবিন অণু **হিম** (heme) নামক অক্সিজেনবাহী লৌহসমৃদ্ধ রঞ্জক ও **গ্লোবিন** (globin) নামক প্রোটিন দিয়ে গঠিত। একটি লোহিত কণিকার ওজনের ৩৩% হিমোগ্লোবিন। মানবদেহের সকল লোহিত কণিকায় লৌহের সামগ্রিক পরিমাণ দেহের মোট লৌহের প্রায় ৬৫ ভাগ। প্রতি ১০০ মিলিলিটার রক্তে ১৬ গ্রাম হিমোগ্লোবিন থাকে। প্রত্যেক লোহিত কণিকায় ২৮০ মিলিয়ন হিমোগ্লোবিন অণু থাকে। একটি হিমোগ্লোবিন অণু যেহেতু চারটি O_2 অণুর সাথে যুক্ত হতে পারে, তাই একটি লোহিত কণিকা অন্য কণিকার তুলনায় ক্ষুদ্র হলেও এক বিলিয়নের বেশি সংখ্যক O_2 অণু বহন করে। কণিকা তখন ফুসফুসের কৈশিক জালিকা সমৃদ্ধ অংশ দিয়ে অতিক্রম করে যখন O_2 কণিকায় ব্যাপিত হয় এবং হিমোগ্লোবিনে আবদ্ধ হয় (অক্সিহিমোগ্লোবিন)। সিস্টেমিক কৈশিক নালিতে হিমোগ্লোবিন থেকে O_2 বিযুক্ত হয়ে দেহকোষে ব্যাপিত হয়।

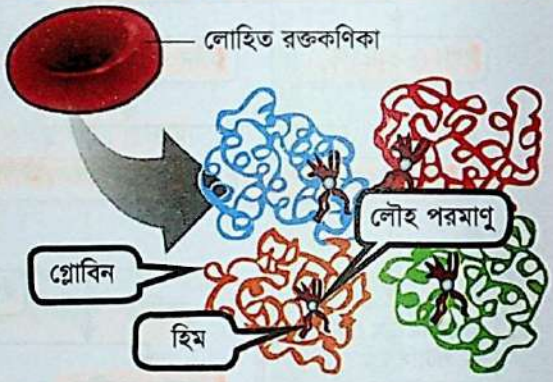

চিত্র ৪.৪ : হিমোগ্লোবিন অণু

লোহিত রক্তকণিকা অত্যন্ত নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক প্রকৃতির হওয়ায় কৈশিকনালির মতো ক্ষুদ্রতম রক্তবাহিকার অভ্যন্তরেও প্রবাহের সময় অতি সহজে এঁকে-বেঁকে যেতে পারে। কণিকার প্লাজমাঝিল্লি ক্লোরাইড ও বাইকার্বনেট আয়নের দ্রুত বিনিময়ের জন্য বিশেষায়িত। লোহিত কণিকার আয়ুষ্কাল ৪ মাস (১২০ দিন)। এ সময়কালে একটি কণিকা মানবদেহের ভিতরে প্রায় ১১,০০০ কিলোমিটার পথ পরিভ্রমণ করে। একেকটি কণিকা প্রতি মিনিটে একবার সমগ্র দেহ ঘুরে আসে। মানবদেহে প্রতি সেকেন্ডে ২০ লক্ষ থেকে ১ কোটি লোহিত কণিকা সৃষ্টি হয় এবং সমপরিমাণ বিনষ্ট হয়। বিনষ্ট কণিকার ভগ্নাবশেষ দ্রুত যকৃত, অস্থিমজ্জা ও প্লীহায় অবস্থিত বড় বড় **ম্যাক্রোফেজ** (macrophaoge) নামক কোষে ভক্ষিত ও বিশ্লিষ্ট হয়। এগুলোর লৌহ অংশ **ফেরিটিন** (ferritin) হিসেবে যকৃতে জমা থেকে নতুন লোহিত কণিকা সৃষ্টিতে অংশ গ্রহণ করে, কিন্তু রঞ্জকগুলো **বিলিরুবিন** (bilirubin) নামক পিত্তরঞ্জকে রূপান্তরিত হয় এবং পিত্তের সাথে রেচন প্রক্রিয়ায় দেহ থেকে নিষ্কাশিত হয়।

রাসায়নিকভাবে লোহিত কণিকার ৬০–৭০% পানি এবং ৩০–৪০% কঠিন পদার্থ। কঠিন পদার্থের মধ্যে প্রায় ৯০% **হিমোগ্লোবিন**। অবশিষ্ট ১০% প্রোটিন, ফসফোলিপিড, কোলেস্টেরল, অজৈব লবণ, অজৈব ফসফেট, পটাসিয়াম ইত্যাদি নিয়ে গঠিত।

লাল অস্থিমজ্জার মধ্যে **স্টেমকোষ** (stem cell) থেকে লোহিত রক্তকণিকা উদ্ভূত হয়। রক্তে অক্সিজেন মাত্রা কমে গেলে নতুন লোহিত কণিকা সৃষ্টি হয়। রক্তপাত, উঁচু স্থানে অবস্থান, ব্যায়াম, অস্থিমজ্জার ক্ষতি, কম মাত্রার হিমোগ্লোবিনসহ বিভিন্ন কারণে অক্সিজেন মাত্রা কমে যেতে পারে। বৃক্ক কম অক্সিজেন মাত্রা শনাক্ত করে সঙ্গে সঙ্গে **এরিথ্রোপয়েটিন** (erythropoietin) নামে এক হরমোন উৎপন্ন ও ক্ষরণ করে। এ হরমোন লাল অস্থিমজ্জার মাধ্যমে লোহিত কণিকা উৎপাদন প্রক্রিয়াকে উদ্দীপ্ত করে। বেশি লোহিত রক্তকণিকা রক্তপ্রবাহে যুক্ত হলে রক্ত ও টিস্যুতে অক্সিজেনের মাত্রাও বেড়ে যায়। রক্তে অক্সিজেন মাত্রা বৃদ্ধি পেলে বৃক্ক এরিথ্রোপয়েটিন ক্ষরণ কমিয়ে দেয়, ফলে লোহিত রক্তকণিকার উৎপাদনও কমে যায়।

চিত্র ৪.৫ : বিভিন্ন ধরনের রক্তকণিকার উৎপত্তি

www.Educationblog24.Com

লোহিত কণিকার কাজ : (i) হিমোগ্লোবিনের মাধ্যমে ফুসফুস থেকে দেহকোষে অধিকাংশ O_2 ও সামান্য পরিমাণ CO_2 সরবরাহ করে। (ii) রক্তের ঘনত্ব ও আঠালো ভাব রক্ষা করে। (iii) হিমোগ্লোবিন বাফার হিসেবে রক্তে অম্ল-ক্ষারের সমতা রক্ষা করে এবং রক্তের সাধারণ ক্রিয়া বজায় রাখতে সাহায্য করে। (iv) রক্তের আয়নিক ভারসাম্য অব্যাহত রাখে। (v) রক্তরসের সাথে অভিস্রবণিক সম্পর্ক রক্ষা করে। (vi) প্লাজমাঝিল্লিতে সংযুক্ত অ্যান্টিজেন রক্তের গ্রুপিংয়ে সাহায্য করে। (vii) এসব কণিকা রক্তে বিলিভার্ডিন ও বিলিরুবিন উৎপন্ন করে।

২. শ্বেত রক্তকণিকা বা লিউকোসাইট (Leucocytes; গ্রিক *leucos* = বর্ণহীন, *Kytos* = কোষ)

দেহকে জীবাণুঘটিত রোগ থেকে মুক্ত রাখতে যে রক্তকণিকা ইমিউনতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে সদা তৎপর থাকে তা হচ্ছে লিউকোসাইট বা শ্বেত রক্তকণিকা। যেভাবেই বা যে পথেই জীবাণুর অনুপ্রবেশ ঘটুক না কেন শ্বেত রক্তকণিকার দুটি বিশেষ সতর্ক প্রহরী B-লিম্ফোসাইট ও ফ্যাগোসাইট অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সেগুলো মোকাবিলা করে মানুষের জীবন রক্ষা করে। মানুষের চোখের অন্তরালে এ কণিকাগুলো আজীবন সংঘবদ্ধভাবে দেহের **ভ্রাম্যমাণ প্রতিরক্ষামূলক ইউনিট** (mobile defensive unit) হিসেবে কাজ করে চলেছে। সব বয়সে শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা এক নয়। নবজাতকে প্রতি মাইক্রোলিটার (mL) রক্তে শ্বেত কণিকার সংখ্যা ৯,০০০–৩০,০০০; দুবছরের কম বয়সীর দেহে ৬,২০০–১৭,০০০; এবং দুবছরের বেশি ও পূর্ণবয়স্ক মানবদেহে ৪,০০০–১০,০০০ (গড়ে ৭,০০০)। লোহিত ও শ্বেত কণিকার অনুপাত ৭০০ ঃ ১। পরিণত সুস্থ মানুষের রক্তের মাত্র ১% শ্বেত রক্তকণিকা।

রক্তে শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকলে তাকে **লিউকোসাইটোসিস** (leukocytosis) এবং কম থাকেলে তাকে **লিউকোপেনিয়া** (leukopenia) বলে। রক্তে শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা কম থাকলে দুর্বল অনাক্রম্যতা প্রকাশ পায় অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। **লিউকেমিয়া** (leukamia) ক্যানসারের ক্ষেত্রে লোহিত কণিকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় কিন্তু শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যায় এবং রোগীর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কিছু শ্বেত রক্তকণিকা রক্ত থেকে স্থানান্তরিত হয়ে দেহের অন্য কোন টিস্যুতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করে। যকৃতে বিদ্যমান **কাপফার কোষ** (Kupffer cells) এক ধরনের শ্বেত রক্তকণিকা যা অনাক্রম্যতন্ত্রের অংশ হিসেবে কাজ করে।

রাসায়নিকভাবে শ্বেত রক্তকণিকা নিউক্লিউপ্রোটিন, গ্লাইকোজেন, লিপিড, কোলেস্টেরল, অ্যাস্করবিক এসিড ও প্রোটিন বিশ্লেষী এনজাইম সমৃদ্ধ।

রঞ্জিত শ্বেত কণিকার সাইটোপ্লাজমে ক্ষুদ্র দানার উপস্থিতির ভিত্তিতে শ্বেত কণিকা দুধরনের– **গ্র্যানিউলোসাইট** ও **অ্যাগ্র্যানিউলোসাইট**।

ক. গ্র্যানিউলোসাইট (Granulocytes)

যে শ্বেত কণিকার সাইটোপ্লাজম দানাদার সেসব কণিকাকে **গ্র্যানিউলোসাইট** বলে। এ কোষের একেকটি দানা হচ্ছে ঝিল্লিবদ্ধ এনজাইম যা প্রধানত কোষে ভক্ষিত পদার্থ পরিপাকে অংশ নেয়। গ্র্যানিউলোসাইটের নিউক্লিয়াস একাধিক (২-৭টি) খণ্ডযুক্ত। জীবাণু ইত্যাদি শনাক্তের জন্য এ কোষ বিশেষ প্রোটিন শৃঙ্খল বহন করে। শ্বেত কণিকার ৭২% হচ্ছে গ্র্যানিউলোসাইট। অস্থিমজ্জার **মায়েলোব্লাস্ট** (myeloblast) নামে কোষ থেকে এগুলো উৎপন্ন হয়ে রক্ত প্রবাহের মাধ্যমে সমগ্র দেহ পরিভ্রমণ করে। এদের আয়ুষ্কাল মাত্র ৪–৮ ঘণ্টা। গ্র্যানিউলোসাইটের সাইটোপ্লাজমের দানাগুলো **লিইশম্যান রঞ্জক** (Leishman stain)-এ নানাভাবে রঞ্জিত হয়। বর্ণধারনের বিভিন্নতায় গ্র্যানিউলোসাইট নিচে বর্ণিত তিন ধরনের।

১. নিউট্রোফিল (Neutrophil) : এ ধরনের শ্বেত কণিকা গোল, ১২–১৫μm ব্যাস ও ২–৫ (সাধারণত ৩টি) খণ্ডবিশিষ্ট নিউক্লিয়াস, গোলাপী সাইটোপ্লাজম ও রক্তাভ দানাযুক্ত গ্র্যানিউলোসাইট। শ্বেত রক্তকণিকার ৭০% নিউট্রোফিল। প্রতি মাইক্রোলিটারে ৪৯০০টি নিউট্রোফিল থাকে। [বিস্তারিত বর্ণনা ১০ম অধ্যায়ে।] এগুলোর আয়ুষ্কাল ২– ৫ দিন।

নিউট্রোফিল অ্যামিবয়েড চলনে সক্ষম এবং সংকুচিত হয়ে কৈশিক জালিকা প্রাচীরে কণিকার চেয়ে ছোট ছিদ্র ভেদ করে টিস্যুতে ও সংক্রমণস্থলে উপস্থিত হতে পারে। এ প্রক্রিয়াকে **ডায়াপেডেসিস** (diapedesis) বলে।

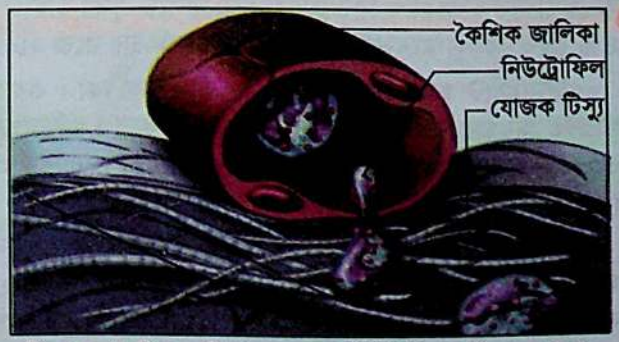

চিত্র ৪.৬ :কৈশিক জালিকা ভেদ করে নিউট্রোফিলের টিস্যুতে প্রবেশ

www.Educationblog24.Com

কাজ : নিউট্রোফিলের প্রধান কাজ হচ্ছে : (i) ফ্যাগোসাইটোসিসের মাধ্যমে দেহে প্রবিষ্ট জীবাণুকে সম্পূর্ণ গ্রাস করা। (ii) দেহের অন্যান্য কোষকে যথাযথ সাড়া দেয়ার জন্য অণুপ্রবেশকারী সম্পর্কে রাসায়নিক বার্তা প্রেরণ করা। (iii) লিপিডজাত এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে, ফলে রক্তবাহিকার প্রাচীর আরও ভেদ্য হয় এবং আরও বেশি নিউট্রোফিল এসে সংক্রমণস্থলে জমা হয়ে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

২. **ইওসিনোফিল** (Eosinophil) : এ ধরনের শ্বেত কণিকা গোল, ১২–১৭μm ব্যাস ও দুই খণ্ডবিশিষ্ট নিউক্লিয়াস, নীলাভ সাইটোপ্লাজম ও লালচে-কমলা রঙের দানাযুক্ত গ্র্যানিউলোসাইট। শ্বেত কণিকার ১.৫% ইওসিনোফিল। রক্তবাহিকা অপেক্ষা পৌষ্টিকনালিতে এগুলো বেশি পাওয়া যায়।

কাজ : (i) প্রধান কাজ হচ্ছে অ্যালার্জিজনিত প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করা এবং তার মাত্রা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কষ্ট লাঘব করা। (ii) ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় গ্রাস করা অসম্ভব এমন বড় জীবাণু ধ্বংসের উদ্দেশে ইওসিনোফিল সংক্রমণস্থলে জড়ো হয়ে হাইড্রোলাইটিক এনজাইম ক্ষরণ ও মারাত্মক প্রতিক্রিয়াশীল অক্সিজেন ত্যাগ করে *Schistosoma, Trichinella* প্রভৃতি পরজীবীর মৃত্যু ঘটায়। (iii) সাইটোপ্লাজমের দানা থেকে জীবাণুর লার্ভানাশক পলিপেপটাইড ক্ষরণ করে।

৩. **বেসোফিল** (Basophil) : এ ধরনের শ্বেত কণিকা গোল, ১২–১৫μm ব্যাস ও দুই খণ্ডবিশিষ্ট নিউক্লিয়াস, নীলচে-কালো রঙের দানাযুক্ত গ্র্যানিউলোসাইট। শ্বেত রক্তকণিকার ০.৫% বেসোফিল। প্রতি মাইক্রোলিটারে ৩৫টি বেসোফিল থাকে। এগুলোর আয়ুষ্কাল ১২–১৫ দিন।

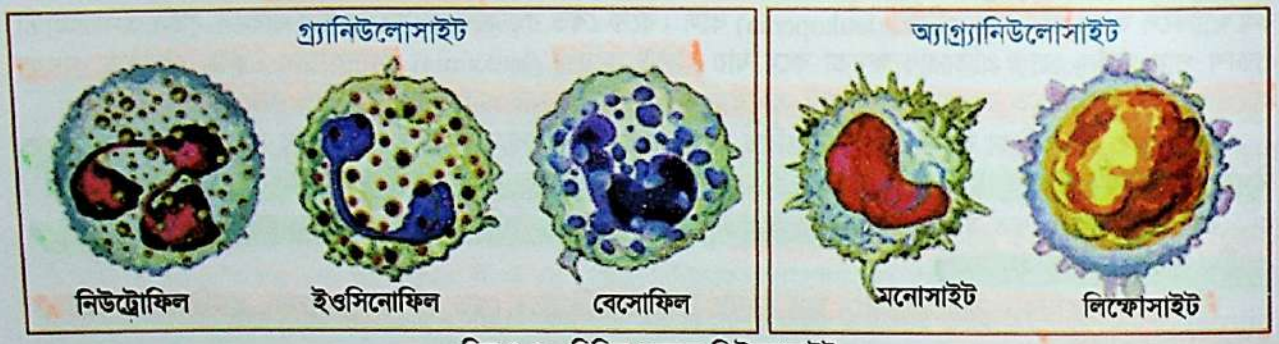

চিত্র ৪.৭ : বিভিন্ন ধরনের লিউকোসাইট

কাজ : বেসোফিলের সাইটোপ্লাজমে যে দানা থাকে তা থেকে হিস্টামিন (histamine) ও হেপারিন (heparin) তৈরি হয়। সংক্রমিত অংশে দ্রুত শ্বেত রক্তকণিকা প্রবাহের জন্য হিস্টামিন বিভিন্ন রক্তবাহিকাকে প্রসারিত করে দেয়। হেপারিন রক্তবাহিকার ভিতরে রক্ত জমাট প্রতিরোধ করে।

খ. অ্যাগ্র্যানিউলোসাইট (Agranulocytes)

যে শ্বেত রক্তকণিকার সাইটোপ্লাজম দানাবিহীন এবং নিউক্লিয়াসটি বড় ও অখণ্ডায়িত সেসব কণিকাকে অ্যাগ্র্যানিউলোসাইট বলে। শ্বেত কণিকার ২৮% হচ্ছে অ্যাগ্র্যানিউলোসাইট। এসব কণিকা অস্থিমজ্জা ও লিম্ফয়েড টিস্যু থেকে উৎপন্ন হয়। এগুলো দুধরনের : মনোসাইট ও লিম্ফোসাইট।

১. **মনোসাইট** (Monocytes) : যেসব অ্যাগ্র্যানিউলার শ্বেত রক্তকণিকা গোল, ১২–২০μm ব্যাস ও বড় বৃক্ক বা অশ্বক্ষুরাকার অখন্ডায়িত নিউক্লিয়াস এবং নীলচে–ধূসর সাইটোপ্লাজমযুক্ত সেসব রক্তকণিকাকে মনোসাইট বলে। দেহের ৪% শ্বেত কণিকা মনোসাইট। প্রতি মাইক্রোলিটার রক্তে ২৮০টি মনোসাইট থাকে। এগুলোর আয়ুষ্কাল ২–৫ দিন।

মনোসাইট হচ্ছে সবচেয়ে বড় শ্বেত রক্তকণিকা। এর নিউক্লিয়াস প্রাথমিক অবস্থায় গোল বা ডিম্বাকার হলেও পরিণত অবস্থায় বৃক্ক বা অশ্বক্ষুরাকার ধারণ করে। অস্থিমজ্জার **মনোব্লাস্ট** (monoblast) কোষ থেকে উৎপত্তির পর ৩০–৪০ ঘন্টা পর্যন্ত রক্তে কাটিয়ে অবশেষে কৈশিকনালির প্রাচীর ভেদ করে টিস্যুতে প্রবেশ করে এবং ম্যাক্রোফেজ (macrophage)-এ পরিণত হয়।

কাজ : (i) বিপুল পরিমাণ ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, পচনরূপ দেহাংশ (necrotics) বা অন্যান্য বহিরাগত পদার্থ ম্যাক্রোফেজ গ্রাস করে দেহের প্রাকৃতিক ধাঙর (scavenger) হিসেবে কাজ করে। (ii) কতিপয় অ্যান্টিজেনকে কাজে লাগিয়ে ইমিউনতন্ত্রে ভূমিকা পালন করে। (iii) সংক্রমণের বিরুদ্ধে সারা দেহে ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখে প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর হিসেবে কাজ করে।

www.Educationblog24.Com

২. **লিম্ফোসাইট** (Lymphocytes) : যেসব অ্যাগ্র্যানিউলার শ্বেত কণিকা গোল, ৬ – ১৬μm ব্যাস ও সম্পূর্ণ কোষ জুড়ে গোল অখণ্ডায়িত নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিয়াসের চারদিক ঘিরে সংকীর্ণ নীলাভ সাইটোপ্লাজম যুক্ত সেসব রক্তকণিকাকে **লিম্ফোসাইট** বলে। দেহের ২৪% শ্বেত কণিকা লিম্ফোসাইট। প্রতি মাইক্রোলিটার রক্তে ১৬৮০টি লিম্ফোসাইট থাকে। এদের আয়ুষ্কাল প্রায় ৭ দিন।

লিম্ফোসাইট হচ্ছে দ্বিতীয় বড় শ্বেত রক্তকণিকা। এগুলো রক্ত প্রবাহে পাওয়া গেলেও সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় লসিকা পর্ব, বিশেষ লিম্ফয়েড টিস্যুতে, যেমন প্লীহা, পৌষ্টিকনালির সাবমিউকোসা, থাইমাস, টনসিল ও অ্যাডেনয়েড। লিম্ফোসাইট দুধরনের : **B-লিম্ফোসাইট** ও **T-লিম্ফোসাইট**। এ দুধরনের কণিকাকে যথাক্রমে B-কোষ ও T-কোষ নামে অভিহিত করা হয়। দুধরনের কোষই অস্থিমজ্জার স্টেমকোষ থেকে সৃষ্টি হয়, দেখতেও অভিন্ন থাকে। কিন্তু পরে কিছু কোষ থাইমাসে পরিযায়ী হয়ে সেখানে T-কোষে পরিণত হয়। বাকি কোষগুলো অস্থিমজ্জায় রয়ে যায় এবং মানবদেহে এগুলো B-কোষে পরিণত হয়। লিম্ফোসাইটের আয়ুষ্কাল এক সপ্তাহের মতো হলেও কিছু কোষের (B ও T কোষ) বংশধর দীর্ঘজীবী হয়ে স্মৃতিকোষে (memory B-কোষ ও T-কোষ) পরিণত হয়। [বিস্তারিত বর্ণনা ইমিউনিটি অধ্যায়ে]।

কাজ : (i) বহিরাগত জীবাণু দেহে ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টির আগেই অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে তা ধ্বংস করে ফেলে। (ii) একই ধরনের অণুজীব ভবিষ্যতে দেহে প্রবেশ করলে স্মৃতি B-কোষ সহজেই শনাক্ত ও ধ্বংসে সহযোগিতা করে। (iii) বিভিন্ন ধরনের T-কোষ সক্রিয়ভাবে ভাইরাসকে আক্রমণ ছাড়াও আক্রান্ত দেহকোষ, ক্যান্সারকোষ ইত্যাদিও ধ্বংস করে। (iv) বিকৃত (defective) T-কোষ দেহে ক্যান্সার বা অটোইমিউন ব্যাধির (autoimmune disease) সৃষ্টি করতে পারে।

শ্বেত রক্তকণিকার কাজ : (i) মনোসাইট ও নিউট্রোফিল **ফ্যাগোসাইটোসিস** (phagocytosis) প্রক্রিয়ায় জীবাণু ভক্ষণ করে ধ্বংস করে। (ii) লিম্ফোসাইটগুলো অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে রোগ প্রতিরোধ করে (এজন্য এদের আণুবীক্ষণিক সৈনিক বলে)। বেসোফিল **হেপারিন** (heparin) উৎপন্ন করে যা রক্তনালির অভ্যন্তরে রক্তজমাট রোধ করে। (iii) দানাদার লিউকোসাইট **হিস্টামিন** (histamine) সৃষ্টি করে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। (ii) নিউট্রোফিলের বিষাক্ত দানা জীবাণু ধ্বংস করে। (v) ইওসিনোফিল রক্তে প্রবেশকৃত কৃমির লার্ভা এবং অ্যালার্জিক-অ্যান্টিবডি ধ্বংস করে।

৩. অণুচক্রিকা বা প্লেইটলেট (Platelets)

দেহের লাল অস্থিমজ্জার **মেগাক্যারিওসাইট** (megakaryocyte) নামে বড় কোষ থেকে উৎপন্ন ও রক্তরসে ভাসমান ১–৪μm ব্যাসসম্পন্ন, অনিয়তাকার, ঝিল্লি-আবৃত, সামান্য সাইটোপ্লাজমযুক্ত কিন্তু নিউক্লিয়াসবিহীন, কোষ-ভগ্নাংশকে (cell fragments) **অণুচক্রিকা** বা **প্লেইটলেট** বলে। প্রতি mL রক্তে প্রায় ১,৫০,০০০–৩,০০,০০০ অণুচক্রিকা থাকতে পারে। প্রতিদিন প্রায় ২০০ বিলিয়ন (২০ হাজার কোটি) অণুচক্রিকা উৎপন্ন হয়। এগুলোর আয়ুষ্কাল ৮–১২ দিন, ধ্বংস প্রাপ্তি ঘটে যকৃত ও প্লীহার ম্যাক্রোফেজের মাধ্যমে।

প্রত্যেক অণুচক্রিকার সাইটোপ্লাজমে (i) সংকোচনে সহায়ক অ্যাকটিন, মায়োসিন ও থ্রম্বোস্থেনিন প্রোটিন; (ii) বিভিন্ন এনজাইম ও বিপুল পরিমাণ ক্যালসিয়াম আয়ন সংশ্লেষের জন্য এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ও গলজি বস্তুর অংশ; (iii) ATP ও ADP উৎপন্নের জন্য মাইটোকন্ড্রিয়া; (iv) বিভিন্ন বাহিকায় প্রভাব সৃষ্টিকারী হরমোন-সদৃশ পদার্থ; (v) ফাইব্রিন তন্তু সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ফ্যাক্টর; (vi) এন্ডোথেলিয়াল কোষ সৃষ্টি, ক্ষতিগ্রস্ত বাহিকার প্রাচীর নির্মাণ ও ফাইব্রোব্লাস্টের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য বৃদ্ধি ফ্যাক্টর উৎপন্ন হয়।

চিত্র ৪.৮ : অণুচক্রিকা

অণুচক্রিকার শুধু সাইটোপ্লাজমই নয় ঝিল্লিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে। ঝিল্লিতে অবস্থিত গ্লাইকোপ্রোটিন রক্তবাহিকার ক্ষতস্থানে বিশেষ করে এন্ডোথেলিয়ামে যুক্ত হয় এবং ঝিল্লি থেকে বিপুল পরিমাণ ফসফোলিপিড নির্গত হয়ে রক্ত জমাটের বিভিন্ন ধাপ ত্বরান্বিত করতে সচেষ্ট হয়। এত কাজ করা সত্ত্বেও অণুচক্রিকাকে অনেক বিজ্ঞানী কোষ বলতে নারাজ কারণ এগুলোর অভ্যন্তরে না আছে নিউক্লিয়াস, কিংবা

www.Educationblog24.Com

DNA। অনেকে কথিত অণুচক্রিকাকে স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রে **থ্রম্বোসাইট** (thrombocyte) নামে অভিহিত করে থাকেন।

কাজ : (i) অস্থায়ী প্লেইটলেট প্লাগ (platelet plug) সৃষ্টির মাধ্যমে রক্তপাত বন্ধ করে। (ii) রক্তজমাট ত্বরান্বিত করতে বিভিন্ন ক্লটিং ফ্যাক্টর (clotting factor) ক্ষরণ করে। (iii) প্রয়োজন শেষে রক্তজমাট বিগলনে সাহায্য করে। (iv) ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস ধ্বংস করে। (v) দেহের কোথাও ব্যথার সৃষ্টি হলে নিউট্রোফিল ও মনোসাইটকে আকৃষ্ট করতে রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে। (vi) রক্তবাহিকার এন্ডোথেলিয়ামের অন্তঃপ্রাচীর সুরক্ষার জন্য গ্রোথ-ফ্যাক্টর ক্ষরণ করে। (vii) সেরোটোনিন (serotonin) নামক রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে রক্তপাত বন্ধের উদ্দেশে রক্তবাহিকাকে দ্রুত সংকোচনে উদ্বুদ্ধ করে। (viii) স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি অণুচক্রিকা থাকলে রক্তনালির ভিতরে অদরকারী রক্তজমাট সৃষ্টি, স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয়।

রক্ত জমাট বাঁধা বা রক্ত তঞ্চন (Blood Clotting)

মানবদেহে রক্তবাহিকার অভ্যন্তরে রক্ত জমাট বাঁধতে পারেনা কারণ বাহিকার অন্তঃস্থ প্রাচীর থাকে মসৃণ এবং রক্তে **হেপারিন** (heparin) নামে এক ধরনের মিউকোপলিস্যাকারাইড সংবহিত হয়। দেহের কোথাও ক্ষত সৃষ্টির ফলে কোনো রক্তবাহিকার এন্ডোথেলিয়াম ক্ষতিগ্রস্ত হলে রক্তপাত বন্ধের উদ্দেশে ও সংক্রমণ প্রতিরোধে যে জটিল জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় **ফাইব্রিন জালক** সৃষ্টির মাধ্যমে ক্ষতস্থানে রক্তকে থকথকে পিণ্ডে পরিণত করে সে প্রক্রিয়াকে রক্তের **জমাট বাঁধা** বা **রক্ত তঞ্চন** বলে। এ প্রক্রিয়ায় অণুচক্রিকা ও রক্তরসে অবস্থিত ১৩ ধরনের **ক্লটিং ফ্যাক্টর** (clotting factor) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ ৪টি ফ্যাক্টর হলো– (i) ফাইব্রিনোজেন, (ii) প্রোথ্রম্বিন, (iii) থ্রম্বোপ্লাস্টিন ও (iv) Ca^{2+}। দেহের শারীরবৃত্তিক স্থিতাবস্থার জন্য রক্তবাহিকায় রক্তরস, রক্তকণিকা, অণুচক্রিকা ইত্যাদির নির্বিঘ্ন প্রবাহ অক্ষুন্ন রাখতে রক্তের জমাট বাঁধা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষত নিরাময়ের উদ্দেশে যে কোনো উপায়ে রক্তপাত মন্থর ও বন্ধের প্রক্রিয়াকে **হিমোস্টেসিস** (hemostasis) বলে। মানবদেহে রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়াটিও হিমোস্টেসিসের অংশ। নিচে বর্ণিত কয়েকটি ধারাবাহিক জৈব রাসায়নিক ধাপের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

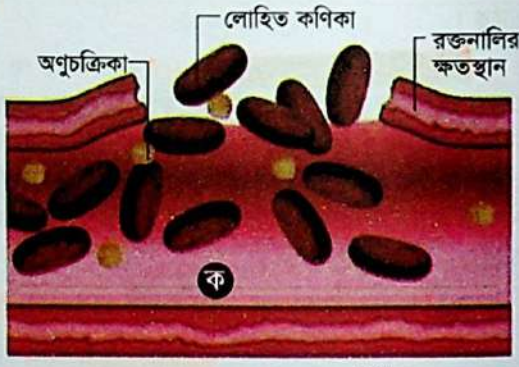

চিত্র ৪.৯ : রক্ত জমাট বাঁধা

১. স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তবাহিকার এন্ডোথেলিয়াল কোষ থেকে ক্ষরিত বিশেষ অণুর (হেপারিন, থ্রম্বোমডিউলিন ইত্যাদি) প্রভাবে রক্ত প্রবাহের সময় অণুচক্রিকাগুলো এন্ডোথেলিয়ামে সংলগ্ন হওয়া থেকে বিরত থাকে, তাই জমাটও বাঁধেনা। কিন্তু বাহিকায় ক্ষত সৃষ্টির ফলে অণুচক্রিকা কোলাজেন তন্তুর সংস্পর্শে এলে স্ফীত হয়ে চারপাশ থেকে ক্ষণপদ সৃষ্টি করে এবং বিপুল পরিমাণ ADP ক্ষরণ করে। ADP-র সক্রিয়তায় আশেপাশের অণুচক্রিকাও পরস্পর আসঞ্জিত হয়ে স্তূপাকার ধারণ করে।

২. রক্তবাহিকার ক্ষতস্থানে অণুচক্রিকা ও ক্ষতের টিস্যু থেকে **প্রোথ্রম্বিন সক্রিয়কারী পদার্থ** (prothrombin activator) ক্ষরিত হয়। এ পদার্থ Ca^{2+}-এর সহায়তায় রক্তরসে অবস্থিত নিষ্ক্রিয় **প্রোথ্রম্বিন** (prothrombin) প্লাজমা প্রোটিনকে সক্রিয় **থ্রম্বিন** (thrombin) এনজাইমে রূপান্তরিত করে।

৩. থ্রম্বিন রক্তরসে অবস্থিত **ফাইব্রিনোজেন** (fibrinogen) নামক গ্লাইকোপ্রোটিনকে **ফাইব্রিন** (fibrin) তন্তুতে পরিণত করে। এসব তন্তু পরস্পর যুক্ত হয়ে **ফাইব্রিন জালক** সৃষ্টি করে।

www.Educationblog24.Com

ক্ষতিগ্রস্ত এন্ডোথেলিয়াম
ও বিমুক্ত অণুচক্রিকা
Ca^{2+} ↓ প্রোথ্রম্বিন সক্রিয়কারী পদার্থ
নিষ্ক্রিয় প্রোথ্রম্বিন
↓
সক্রিয় থ্রম্বিন
Ca^{2+} ↓
ফাইব্রিনোজেন
↓
ফাইব্রিন তন্তু
↓
ফাইব্রিন জালক
↓
রক্ত জমাট বাঁধা

৪. ফাইব্রিন জালক ক্ষতস্থানে জড়ো হয়ে থাকা অণুচক্রিকার চতুর্দিক জড়িয়ে **প্লেইটলেট প্লাগ** (platelet plug) বা **ছিপি** নির্মাণ করে। ছিপিটি রক্ত জমাটের কাঠামো হিসেবে কাজ করে। ফাইব্রিন জালকে অণুচক্রিকা, রক্ত কণিকা, রক্তরস ও অন্যান্য উপাদান বিজড়িত হয়ে আটকে যায়। ফলে রক্ত জমাট বাঁধে। এতে লোহিত কণিকা আটকে যাওয়ায় জমাটটি লালচে দেখায়।

৫. জমাট বাঁধা শেষ হলে জমাট থেকে যে হলুদ তরল বেরিয়ে আসে তা **সিরাম** (serum)। সিরামের গঠন রক্তরসের মতোই কেবল ফাইব্রিনোজেন ও প্রোথ্রম্বিন থাকে না।

৬. ফাইব্রিন জমাট সাময়িক। রক্তবাহিকার পুনর্গঠন শুরু হলে নতুন টিস্যু কোষ সৃষ্টির জন্য **প্লাজমিন** (plasmin) এনজাইম ফাইব্রিন জালককে ধ্বংস করে দেয়।

রক্তস্কন্দনকাল : দেহ থেকে নির্গত রক্ত জমাট বাঁধতে যে সময় লাগে তাকে রক্তস্কন্দনকাল বলে। স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের রক্তস্কন্দনকাল হচ্ছে ৩-৮ মিনিট। তবে ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে সময় অনেক বেশি লাগতে পারে।

রক্তক্ষরণকাল : কোনো বাহ্যিক প্রয়োগ ছাড়া প্রথম রক্ত নির্গত হওয়া শুরু থেকে রক্ত জমাট বাঁধা পর্যন্ত সময়কে রক্তক্ষরণকাল বলে। মানুষের স্বাভাবিক রক্তক্ষরণ কাল ১-৪ মিনিট।

লসিকা বা লিম্ফ (Lymph)

টিস্যু গঠনকারী কোষের ফাঁকে ফাঁকে অবস্থিত বর্ণহীন তরল পদার্থকে **লসিকা** বলে। পরিণত মানব দেহে প্রতিদিন কৈশিক জালিকার প্রাচীর ভেদ করে ৪-৮ লিটার তরল পদার্থ ও রক্তপ্রোটিন চারপাশের টিস্যু কোষের ফাঁকে ফাঁকে লসিকা হিসেবে অবস্থান করে। লসিকাতন্ত্রের মাধ্যমে শুধু লসিকা নয় রক্তপ্রোটিনও রক্তে ফিরে যায়। রক্তপ্রোটিন যদি এভাবে পুনরুদ্ধার না হতো তাহলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মানুষ মারা যেতো।

লসিকার উৎপত্তি : ধমনির শাখা থেকে উৎপন্ন কৈশিক ধমনিতে রক্ত পৌছালে এর অধিকাংশই কৈশিক শিরাতে প্রবাহিত হয়। প্রায় ১০% এর মতো রক্তরস (প্লাজমা) কৈশিকজালিকা থেকে বেরিয়ে দেহ কোষের চারদিকে **ইন্টারস্টিশিয়াল তরল** (interstitial fluid) হিসেবে অবস্থান করে। এ তরল লসিকা নালিকায় প্রবেশ করে লসিকায় পরিণত হয়। লসিকা উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে **লিম্ফোজেনেসিস** (lymphogensis) বলে।

লসিকার উপাদান : লসিকায় প্রধানত দুধরনের উপাদান দেখা যায়, যথা–**কোষ উপাদান ও কোষবিহীন উপাদান**।

কোষ উপাদান : লসিকায় প্রধানত শ্বেত কণিকার লিম্ফোসাইট থাকে। সামান্য পরিমাণ লোহিত কণিকা দেখা গেলেও (কৈশিক জালিকার পাতলা প্রাচীর ভেদ করে ইন্টারস্টিশিয়াল তরলে প্রবেশ করে) অণুচক্রিকা সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। প্রতি কিউবিক মিলিমিটার লসিকায় ৫০০– ৭৫,০০০ লিম্ফোসাইট থাকতে পারে।

কোষবিহীন উপাদান : লসিকায় অবস্থিত কোষবিহীন উপাদানগুলো রক্তরসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। লসিকায় প্রায় ৯৪%ই পানি এবং ৬% কঠিন পদার্থ বিদ্যমান। কঠিন অংশের মধ্যে নিম্নোক্ত উপাদানগুলো পাওয়া যায় :

১. **শর্করা :** প্রতি ১০০ মিলিমিটার লসিকায় শর্করার (গ্লুকোজ) পরিমাণ ১২০–১৩২ গ্রাম।

২. **প্রোটিন :** লসিকায় প্রধানত অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন, ফাইব্রিনোজেন, এনজাইম, অ্যান্টিবডি ইত্যাদি থাকে।

৩. **লিপিড :** প্রধানত কাইলোমাইক্রন হিসেবে থাকে যাতে ট্রাইগ্লিসারাইড ও ফসফোলিপিড উপস্থিত। অভুক্ত অবস্থায় লসিকায় ফ্যাটের পরিমাণ কম থাকে। চর্বিযুক্ত খাবার খেলে লসিকায় ফ্যাটের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং লসিকা দুধের মতো সাদা দেখায়। এ ধরনের লসিকাকে **কাইল** (chyle) বলে। তবে সাধারণত এর পরিমাণ মোট কঠিন অংশের প্রায় ৫–১৫%।

৪. **রেচন বর্জ্য :** লসিকায় ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, ক্রিয়েটিনিন ইত্যাদি পাওয়া যায়।

৫. **অন্যান্য বস্তু :** গ্লুকোজ, জীবাণু, ক্যানসার কোষ, দ্রবীভূত CO_2 ইত্যাদিও লসিকায় পাওয়া যায়।

লসিকাতন্ত্র (Lymphatic system)

লসিকা, লসিকা ক্যাপিলারি, লিম্ফ নোড, লসিকানালি বা লিমফেটিক্স, লিম্ফয়েড অঙ্গ, যথা– প্লীহা, থাইমাস গ্রন্থি, টনসিল, লিম্ফেটিক টিস্যু এবং সমষ্টিভূত (aggregated) লিম্ফ নোড সমন্বয়ে গঠিত তন্ত্রকে **লসিকাতন্ত্র** বলে। কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম এবং লসিকাতন্ত্র উভয়ে সমগ্র দেহে ফ্লুয়িড (fluid) সংবহন করে বলে লসিকা তন্ত্রকে কখনো

www.Educationblog24.Com

কখনো **দ্বিতীয় সংবহনতন্ত্র** বলেও অভিহিত করা হয়। তবে পার্থক্য হলো লসিকাতন্ত্র বদ্ধ নয় এবং এখানে কোন কেন্দ্রিয় পাম্প যন্ত্র নেই। লসিকানালি বদ্ধপ্রান্তবিশিষ্ট সূক্ষ্ম নালিকা। কৈশিক জালকের মতো অসংখ্য সূক্ষ্ম লসিকানালি পরস্পর যুক্ত হয়ে প্রধানত দুটি বড় নালি গঠন করে, যথা–

১. ডান লসিকানালি : মাথা ও গলার ডান দিক, ডান বাহু এবং বক্ষ অঞ্চলের ডান দিকে অবস্থিত লসিকানালিগুলো মিলে ডান লসিকানালি গঠন করে। এটি ডান সাবক্লেভিয়ান শিরা এবং ডান অন্তঃজুগুলার শিরার সংযোগস্থলে শিরাতন্ত্রের সাথে সংযুক্ত।

২. থোরাসিক লসিকানালি : দেহের নিম্নাংশ এবং বাম দিকের লসিকানালিগুলো মিলে থোরাসিক লসিকানালি গঠন করে। এটি বাম সাবক্লেভিয়ান ও বাম অন্তঃজুগুলার শিরার সংযোগস্থলে শিরাতন্ত্রের সাথে সংযুক্ত। পৌষ্টিকনালি অঞ্চলে লসিকানালি সুবিকশিত এবং নালি অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম লসিকা নালিকে **ল্যাকটিল** (lacteal) বলে। লসিকানালিতে শিরার অনুরূপ কপাটিকা থাকে তবে সংখ্যায় বেশি। ফলে লসিকা শুধু এক দিকে প্রবাহিত হয়। চলন বা শ্বসনের সময় কঙ্কাল পেশির সংকোচনে লসিকানালিতে অত্যন্ত ধীর গতিতে লসিকা প্রবাহিত হয়। লসিকানালিতে ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে যার মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া বা কোষের ধ্বংসাবশেষ (cell debris) প্রবেশ করতে পারে। লসিকানালির বিভিন্ন স্থানে গোল বা ডিম্বাকার স্ফীত অংশ থাকে। এগুলো **লিম্ফ নোড বা লসিকা গ্রন্থি**। ঘাড়, বগল, কুচকিতে প্রচুর লিম্ফ নোড থাকে। প্লীহা, টনসিল, অ্যাডেনয়েড ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য লিম্ফেটিক অঙ্গ।

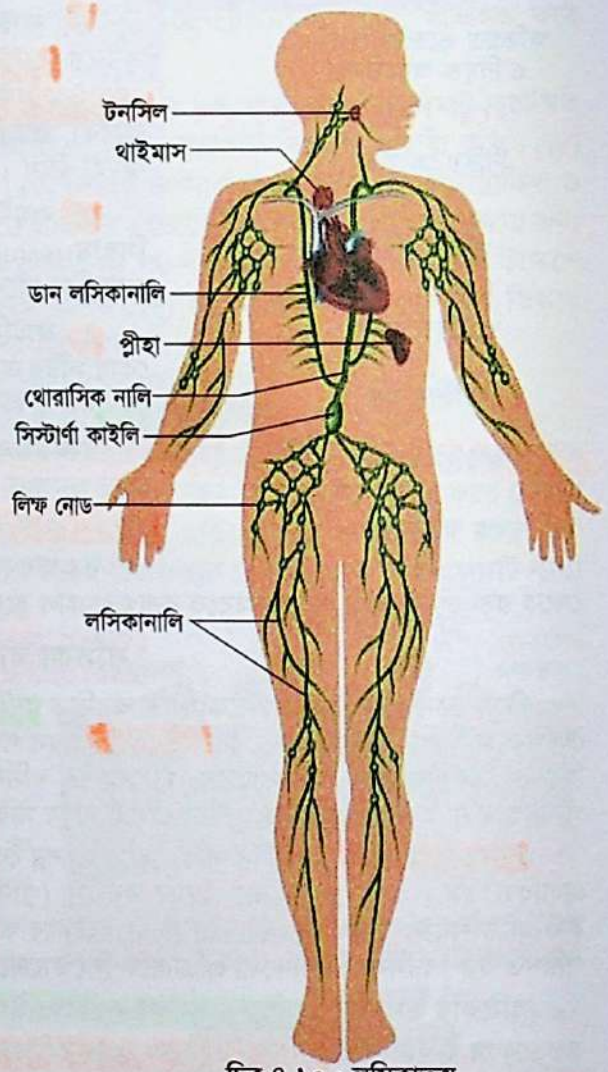

চিত্র ৪.১০ : লসিকাতন্ত্র

লসিকার কাজ : দেহের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ লসিকার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে, যেমন–

১. টিস্যুর ফাঁকা স্থান থেকে অধিকাংশ প্রোটিন লসিকার মাধ্যমে রক্তে ফিরে আসে।
২. যেসব স্নেহকণা ও উচ্চ আণবিক ওজনবিশিষ্ট কণা কৈশিক নালির বাধা অতিক্রমে অক্ষম সেগুলো লসিকার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।
৩. দেহের যেসব টিস্যুকোষে রক্ত পৌছাতে সক্ষম হয় না সেখানে লসিকা অক্সিজেন ও পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করে।
৪. অন্ত্র থেকে স্নেহ পদার্থ শোষিত হয়ে লসিকার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।
৫. লসিকায় উপস্থিত শ্বেত কণিকা (লিম্ফোসাইট ও মনোসাইট) দেহের প্রতিরক্ষায় অবদান রাখে।
৬. লসিকা ও লিম্ফোসাইট থেকে উৎপন্ন অ্যান্টিবডি প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।
৭. লসিকা রক্ত সংবহনের এক অংশ থেকে অন্য অংশে তরল পদার্থ পরিবহনের মাধ্যমে দেহরসের পুনর্বন্টনে অংশ নেয়।
৮. বিভিন্ন অঙ্গে টিস্যুর সাংগঠনিক অখণ্ডতা রক্ষায় লসিকা বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
৯. টিস্যু থেকে টিস্যুরসের প্রায় ১০% অংশ লসিকার মাধ্যমে নিষ্কাশিত হয়।

চিত্র ৪.১১ : লসিকা সংবহন

www.Educationblog24.Com

রক্ত ও লসিকার মধ্যে পার্থক্য		
বৈশিষ্ট্য	রক্ত	লসিকা
১. বর্ণ	লাল বর্ণের পরিবহন টিস্যু।	বর্ণহীন পরিবহন টিস্যু।
২. প্রবাহ	রক্তনালিতে সুনির্দিষ্ট চাপে প্রবাহিত হয়।	লসিকানালিতে চাপহীন প্রবাহিত হয়।
৩. গঠন উপাদান	প্লাজমা, লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা এবং অণুচক্রিকা নিয়ে গঠিত।	প্লাজমা ও শ্বেত রক্তকণিকা নিয়ে গঠিত।
৪. হিমোগ্লোবিন	হিমোগ্লোবিন বিদ্যমান।	হিমোগ্লোবিন অনুপস্থিত।
৫. প্রোটিন ইত্যাদি	অধিক পরিমাণ প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসযুক্ত।	অল্প পরিমাণ প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসযুক্ত।
৬. পরিবহন	রক্তের মাধ্যমে শ্বসন গ্যাস ও খাদ্যকণা (শর্করা ও আমিষ) পরিবাহিত হয়।	লসিকার মাধ্যমে বর্জ্য পদার্থ ও খাদ্যসার (লিপিড) পরিবাহিত হয়।

ব্যবহারিক (Practical)

কাজ : রক্ত কণিকাসমূহের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : জীবাণুমুক্ত সুচ, পরিষ্কার স্লাইড, লিশম্যান রঞ্জক, রক্ত, ড্রপার, তুলা, স্পিরিট, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ইত্যাদি।

রক্ত সংগ্রহ ও স্লাইড প্রস্তুতি

i. একটি জীবাণুমুক্ত নিডলের সাহায্যে নিজের বাম হাতের মধ্যমার অগ্রভাগ ফুটো করে একবিন্দু রক্ত স্লাইডের একপ্রান্তে সংগ্রহ করতে হবে।

ii. অপর একটি পরিষ্কার স্লাইডের প্রান্ত দিয়ে ৪৫° কোণে রক্তের ফোঁটাটি সামনের দিকে এমনভাবে ঠেলে দিতে হবে যাতে প্রথম স্লাইডের উপর চাপ না পড়ে। ফলে প্রথম স্লাইডের উপর রক্তের একটি পাতলা প্রলেপ (blood flim) তৈরি হবে।

iii. প্রলেপটি বাতাসে শুকিয়ে নিতে হবে।

iv. বাতাসে শুকানোর পর প্রলেপটির উপর **লিশম্যান রঞ্জক** দিয়ে প্লাবিত করতে হবে এবং একটি পেট্রিডিস দিয়ে স্লাইডটি ঢেকে রাখতে হবে।

v. এক মিনিট পর (বেশি সময় রাখা যায়) লিশম্যান দ্রবণের সমপরিমাণ পাতিত পানি স্লাইডের উপর অল্প অল্প করে ঢালতে হবে।

vi. এভাবে ১০ মিনিট রাখার পর স্লাইডটি পাতিত পানিতে ভালোভাবে ধুয়ে বাতাসে শুকিয়ে নিতে হবে।

vii. অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত অথবা বিজ্ঞানাগারে সংরক্ষিত রক্ত কণিকাসমূহের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ করে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ মিলিয়ে দেখতে হবে। প্রয়োজনে শ্রেণিশিক্ষকের সাহায্য নিতে হবে।

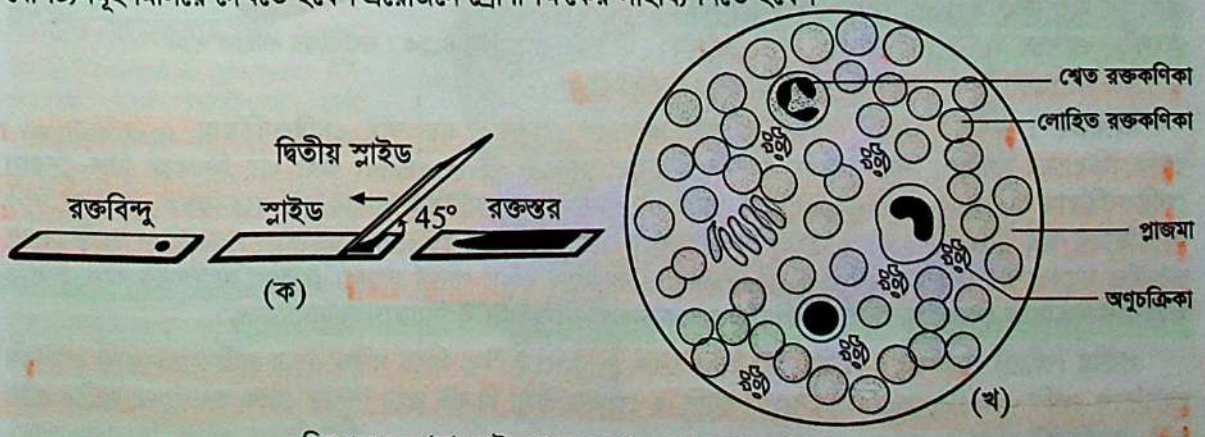

চিত্র ৪.১২ : (ক) স্লাইড প্রস্তুতকরণ ও (খ) মানুষের রক্ত

www.Educationblog24.Com

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. রক্তরস ও রক্তকণিকা নিয়ে রক্ত গঠিত।
২. রক্তরসে অসংখ্য লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা ও অণুচক্রিকা বর্তমান।
৩. লোহিত রক্তকণিকা গোলাকার, দ্বি-অবতল ও নিউক্লিয়াসবিহীন।
৪. শ্বেত রক্তকণিকা বর্ণহীন ও নিউক্লিয়াসযুক্ত এবং অনিয়তাকার ও অপেক্ষাকৃত বড়।
৫. অণুচক্রিকা ক্ষুদ্র ও নিউক্লিয়াসবিহীন।

সতর্কতা : রক্ত সংগ্রহের আগে অ্যালকোহল দিয়ে নিডল্ ও আঙুলের অগ্রভাগ জীবাণু মুক্ত করে নিতে হবে।

মানুষের হৃৎপিণ্ডের গঠন (Structure of Human Heart)

দেহের যে প্রকোষ্ঠময় পেশল অঙ্গের নিরবচ্ছিন্ন ছন্দময় সংকোচন প্রসারণের মাধ্যমে সমগ্র দেহে রক্ত সংবহিত হয় তাকে **হৃৎপিণ্ড** বলে। রক্তকে রক্তবাহিকার ভিতর দিয়ে সঞ্চালনের জন্য হৃৎপিণ্ড মানবদেহের পাম্পযন্ত্র (pumping machine) রূপে কাজ করে। জীবন্ত এ পাম্পযন্ত্রটি দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে শিরার মাধ্যমে আনীত রক্ত ধমনির সাহায্যে শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রেরণ করে।

একজন সুস্থ মানুষের জীবদ্দশায় হৃৎপিন্ড গড়ে ২৬০০ মিলিয়ন বার স্পন্দিত হয়ে প্রতিটি ভেন্ট্রিকল (নিলয়) থেকে প্রায় ১৫৫ মিলিয়ন লিটার (বা দেড় লক্ষ টন) রক্ত বের করে দেয়। প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষে হৃৎপিণ্ডের ওজন ২৫০-৩৯০ গ্রাম ও স্ত্রীতে ২০০-২৭৫ গ্রাম। ভ্রূণ অবস্থায় মাতৃগর্ভে ছয় সপ্তাহ থেকে হৃৎস্পন্দন শুরু হয় এবং আমৃত্যু এ স্পন্দন চলতে থাকে।

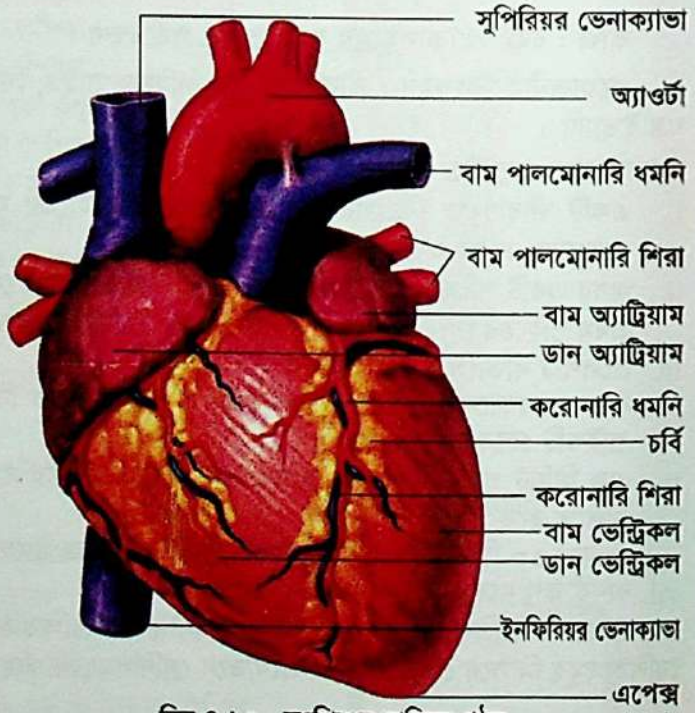

চিত্র ৪.১৩ : হৃৎপিণ্ডের বাহ্যিক গঠন

অবস্থান : মানুষের হৃৎপিণ্ড বক্ষ গহ্বরে মধ্যচ্ছদার উপরে ও দুই ফুসফুসের মাঝ-বরাবর বাম দিকে একটু বেশি বাঁকা হয়ে অবস্থিত। এটি দেখতে ত্রিকোণাকার; গোড়াটি চওড়া ও ঊর্ধ্বমুখী থাকে, কিন্তু সুচালো শীর্ষদেশ নিচের দিকে পঞ্চম পাঁজরের ফাঁকে অবস্থান করে।

আকার ও আকৃতি : লালচে-খয়েরী রংয়ের হৃৎপিণ্ডটি ত্রিকোণা মোচার মতো। এর চওড়া ঊর্ধ্বমুখী অংশটি বেস (base), ক্রমশ সরু নিম্নমুখী অংশটি এপেক্স (apex)। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের হৃৎপিণ্ডের দৈর্ঘ্য ১২ সেন্টিমিটার ও প্রস্থ ৮ সেন্টিমিটার।

আবরণ : হৃৎপিণ্ড একটি পাতলা দ্বিস্তরী আবরণে আবৃত। এর নাম **পেরিকার্ডিয়াম** (pericardium)। পেরিকার্ডিয়ামের বাইরের দিক **তন্তুময় পেরিকার্ডিয়াম** (fibrous pericardium) এবং এর ভিতরের দিক **সেরাস পেরিকার্ডিয়াম** (serous pericardium) নামে পরিচিত। সেরাস পেরিকার্ডিয়াম আবার দুটি স্তরে বিভক্ত, বাইরের দিকে **প্যারাইটাল স্তর** (parietal layer) এবং ভিতরের দিকে **ভিসেরাল স্তর** (visceral layer)। প্যারাইটাল ও ভিসেরাল স্তরদুটির মাঝে **পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড** (pericardial fluid) নামক তরল পদার্থ থাকে। এ তরল হৃৎপিণ্ডকে তাপ, চাপ ও ঘর্ষণজনিত আঘাত থেকে রক্ষা করে হৃৎপিণ্ডের সংকোচনকে সহজসাধ্য ও নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

প্রাচীর (Wall) : হৃৎপিন্ডের প্রাচীর অনৈচ্ছিক পেশি ও যোজক টিস্যু দিয়ে গঠিত। এর প্রাচীর গঠনকারী পেশিকে **কার্ডিয়াক পেশি** (cardiac muscles) বলে। পেশি ও যোজক টিস্যু তিনটি স্তরে বিন্যস্ত থেকে হৃৎপিন্ডের প্রাচীর গঠন করে। স্তরতিনটি হলো–

www.Educationblog24.Com

১. **এপিকার্ডিয়াম** (Epicardium) : এটি পাতলা ও স্বচ্ছ যোজক টিস্যু নির্মিত হৃৎপ্রাচীরের সর্ববহিঃস্থ স্তর। এ স্তরে বিক্ষিপ্তভাবে চর্বি লেগে থাকে।

২. **মায়োকার্ডিয়াম** (Myocardium) : এটি কার্ডিয়াক পেশি নির্মিত হৃৎপ্রাচীরের মধ্যবর্তী স্তর। এ স্তরটি সর্বাপেক্ষা পুরু। এ স্তরের পেশি দৃঢ় প্রকৃতির এবং এগুলো হৃৎপিন্ড সংকোচন– প্রসারণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

৩. **এন্ডোকার্ডিয়াম** (Endocardium) : এটি যোজক টিস্যু নির্মিত হৃৎপ্রাচীরের অন্তঃস্থ স্তর। এটি হৃৎপিন্ডের প্রকোষ্ঠের অন্তঃপ্রাচীর গঠন করে, হৃৎকপাটিকাসমূহ ঢেকে রাখে এবং রক্তবাহিকার সাথে হৃৎপিন্ডের অবিচ্ছিন্ন সংযোগ ঘটায়।

হৃৎপিন্ডের প্রকোষ্ঠসমূহ (Chambers of Heart)

মানব হৃৎপিন্ড সম্পূর্ণরূপে চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট (completely four chambered) একটি ফাঁপা অঙ্গ! এর মধ্যে উপরের দুটি **অ্যাট্রিয়া** (atria: একবচনে atrium) বা **অলিন্দ** ও নিচের দুটি **ভেন্ট্রিকল** (Ventricle) বা **নিলয়**। দুটি অ্যাট্রিয়াকে দেহের অবস্থান অনুসারে **ডান অ্যাট্রিয়াম** ও **বাম অ্যাট্রিয়াম** বলে এবং ভেন্ট্রিকল দুটিকে **ডান ভেন্ট্রিকল** ও **বাম ভেন্ট্রিকল** বলা হয়। অ্যাট্রিয়ামের তুলনায় ভেন্ট্রিকলের প্রাচীর পুরু ও পেশিবহুল। ডান ও বাম অ্যাট্রিয়াম **আন্তঃঅ্যাট্রিয়াল** (আন্তঃঅলিন্দ) **পর্দা** (inter-atrial septum) এবং ডান ও বাম ভেন্ট্রিকল **আন্তঃভেন্ট্রিকুলার** (আন্তঃনিলয়) **পর্দা** (inter-ventricular septum) দিয়ে পৃথক থাকে। নিচে প্রকোষ্ঠগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

❑ **ডান অ্যাট্রিয়াম** : এ প্রকোষ্ঠ ডান দিকে অবস্থিত, তুলনামূলকভাবে বড় ও পাতলা প্রাচীর দিয়ে গঠিত। এর ভিতরের গায়ে **সাইনো- অ্যাট্রিয়াল নোড** (sino-atrial node) বা **পেস মেকার** (pace maker) নামে একটি পেশিখন্ড থাকে। এখান থেকে হৃৎস্পন্দন শুরু হয়। ডান অ্যাট্রিয়াম **সুপিরিয়র** ও **ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভার** মাধ্যমে যথাক্রমে দেহের সম্মুখ ও পশ্চাৎ অঞ্চল থেকে এবং করোনারি শিরা ও করোনারি সাইনাসের মাধ্যমে হৃৎপিন্ডের প্রাচীর থেকে ফিরে আসা CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত গ্রহণ করে। **ডান অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার-ছিদ্র** (right atrio- ventricular aperture)-এর মাধ্যমে ডান অ্যাট্রিয়াম ডান ভেন্ট্রিকলে উন্মুক্ত হয়। এ ছিদ্রপথে **ট্রাইকাসপিড কপাটিকা** (tricupid valves) নামে তিনটি ঝিল্লিময় টুপির মতো কপাটিকা থাকে। এ কপাটিকা ডান অ্যাট্রিয়াম থেকে CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত ডান ভেন্ট্রিকলে আসতে দেয়, কিন্তু ডান ভেন্ট্রিকল থেকে ডান অ্যাট্রিয়ামে রক্ত ফিরে যেতে দেয় না অর্থাৎ কপাটিকাটি একমুখী।

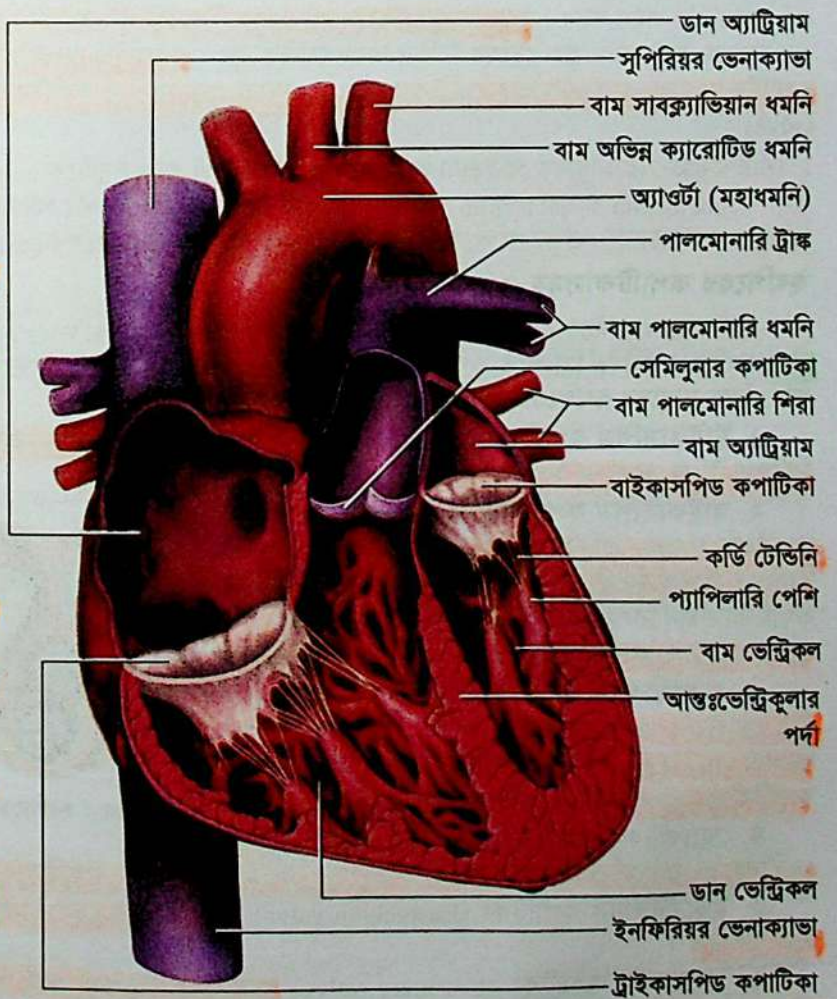

চিত্র ৪.১৪ : মানব হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদ

www.Educationblog24.Com

❐ **বাম অ্যাট্রিয়াম :** এ প্রকোষ্ঠ বাম দিকে অবস্থিত, তুলনামূলকভাবে ছোট এবং অপেক্ষাকৃত পুরু প্রাচীরবিশিষ্ট। প্রকোষ্ঠটি পালমোনারি বা ফুসফুসীয় শিরার মাধ্যমে ফুসফুস থেকে ফিরে আসা O_2-সমৃদ্ধ রক্ত গ্রহণ করে। বাম অ্যাট্রিয়াম বাম অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার ছিদ্রের মাধ্যমে বাম ভেন্ট্রিকলে রক্ত প্রেরণ করে। এ ছিদ্রমুখে বাইকাসপিড কপাটিকা (bicuspid valves) বা মাইট্রাল কপাটিকা (mitral valves) নামক দুটি ঝিল্লিময় টুপির মতো কপাটিকা থাকে। এটি একমুখী কপাটিকা। এ কপাটিকা বাম অ্যাট্রিয়াম থেকে বাম ভেন্ট্রিকলে রক্ত যেতে দেয়, কিন্তু বাম ভেন্ট্রিকল থেকে বাম অ্যাট্রিয়ামে রক্ত ফিরে যেতে দেয় না। বাইকাসপিড ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকাগুলোর এক প্রান্ত অ্যাট্রিয়াম-ভেন্ট্রিকল ছিদ্রের মুখে এবং অপর প্রান্ত ভেন্ট্রিকলের অন্তঃপ্রাচীরের গাত্রে কর্ডি টেন্ডিনি (chordae tendinae) নামক তন্তুর সাহায্যে যুক্ত থাকে।

❐ **ডান ভেন্ট্রিকল :** ডান ভেন্ট্রিকল বাম ভেন্ট্রিকল অপেক্ষা কিছুটা বড় এবং ডানে অবস্থিত। এটি ডান অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার ছিদ্রের মাধ্যমে ডান অ্যাট্রিয়াম থেকে CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত সংগ্রহ করে। ডান ভেন্ট্রিকলের সম্মুখ ভাগ থেকে ফুসফুসীয় ধমনি (pulmonary artery) সৃষ্টি হয় যার মাধ্যমে CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত ডান ভেন্ট্রিকল থেকে ফুসফুসে সঞ্চালিত হয়। এ ধমনির মুখে একটি একমুখী অর্ধচন্দ্রাকার বা সেমিলুনার কপাটিকা (semiluner valve) থাকে। এ কপাটিকা ডান ভেন্ট্রিকলে রক্ত ফেরত আসতে দেয় না।

❐ **বাম ভেন্ট্রিকল :** হৃৎপিন্ডের বাম দিকে অবস্থিত বাম ভেন্ট্রিকলের প্রাচীর তুলনামূলকভাবে অধিক পুরু কারণ এ প্রকোষ্ঠ থেকেই সমগ্র দেহে রক্ত প্রেরিত হয় (অন্যদিকে ডান ভেন্ট্রিকল থেকে রক্ত কেবল ফুসফুসে প্রেরিত হয়) যাতে অনেক বেশি শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। বাম ভেন্ট্রিকল বাম অ্যাট্রিয়াম থেকে বাম অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার ছিদ্রের মাধ্যমে O_2-সমৃদ্ধ রক্ত গ্রহণ করে। বাম ভেন্ট্রিকলের সম্মুখ থেকে সিস্টেমিক মহাধমনি বা অ্যাওর্টা (aorta) উৎপন্ন হয় এবং এর মাধ্যমে O_2-সমৃদ্ধ রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গে প্রেরিত হয়। এ ধমনির উৎপত্তি স্থলেও একটি একমুখী অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা থাকে যা রক্তকে বাম ভেন্ট্রিকলে ফিরে আসতে দেয় না। এ কপাটিকার নাম অ্যাওর্টিক কপাটিকা (aortic valve)।

[শারীরবিজ্ঞানের আধুনিক পরিভাষা অনুযায়ী হৃৎপিন্ডের উর্ধ্ব প্রকোষ্ঠদুটিকে auricle নামের পরিবর্তে **atrium** বলে, যথা– right atrium ও left atrium। এ বইয়েও তাই auricle বা অলিন্দের পরিবর্তে ডান অ্যাট্রিয়াম ও বাম অ্যাট্রিয়াম ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, অরিকল বলতে মেরুদন্ডী প্রাণীর বহিঃকর্ণ (external ear) কে বোঝায়।]

হৃৎপিণ্ডের কপাটিকাসমূহ (Valves of Heart)

হৃৎপিণ্ডের মধ্যদিয়ে রক্ত প্রবাহ একমুখী করার জন্য এবং O_2-সমৃদ্ধ ও CO_2-সমৃদ্ধ রক্তের মিশ্রণ প্রতিহত করার জন্য হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন ছিদ্রপথে কপাটিকা থাকে। হৃৎপিণ্ডের অন্তঃপ্রাচীর বা এন্ডোকার্ডিয়াম ভাঁজ হয়ে কপাটিকা গঠিত হয়। নিচে মানুষের হৃৎপিণ্ডের কপাটিকাগুলো উল্লেখ করা হলো।

১. ট্রাইকাসপিড কপাটিকা (Tricuspid valve) : ডান অ্যাট্রিয়াম ও ডান ভেন্ট্রিকলের সংযোগ স্থলের ছিদ্রে তিনটি ঝিল্লিময় টুপির মতো এ কপাটিকা থাকে।

২. বাইকাসপিড কপাটিকা (Bicuspid valve) : বাম অ্যাট্রিয়াম ও বাম ভেন্ট্রিকলের সংযোগ স্থলের ছিদ্রে দুইটি ঝিল্লিময় টুপির মতো এ কপাটিকা থাকে। বাইকাসপিড কপাটিকা খৃষ্টান বিশপদের সুউচ্চ টুপির মতো দেখতে। তাই এদের মাইট্রাল কপাটিকা (mitral valve)ও বলে।

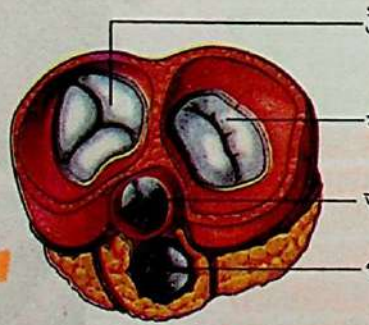

চিত্র ৪.১৫ : হৃৎপিণ্ডের কপাটিকাসমূহ (প্রস্থচ্ছেদে)

৩. পালমোনারি কপাটিকা (Pulmonary valve) : ডান ভেন্ট্রিকল ও পালমোনারি ধমনির ছিদ্রপথে অবস্থিত ত্রি-পর্দা (tri-flap) বিশিষ্ট সেমিলুনার বা অর্ধচন্দ্রাকার কপাটিকাকে পালমোনারি কপাটিকা বলে।

৪. অ্যাওর্টিক কপাটিকা (Aortic valve) : বাম ভেন্ট্রিকল ও মহাধমনির ছিদ্রপথে অবস্থিত ত্রি-পর্দা বিশিষ্ট অর্ধচন্দ্রাকার কপাটিকার নাম অ্যাওর্টিক কপাটিকা।

৫. ইউস্টেশিয়ান কপাটিকা (Eustachian valve) : ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা ও ডান অ্যাট্রিয়ামের সংযোগস্থলে এটি অবস্থিত।

৬. করোনারি কপাটিকা (Coronary valve) করোনারি সাইনাস এবং ডান অ্যাট্রিয়ামের সংযোগস্থলে এর অবস্থান।

www.Educationblog24.Com

হৃৎপিন্ডের প্রধান গাঠনিক উপাদানসমূহ এবং এদের কাজ	
হৃৎপিন্ডের গাঠনিক উপাদান	**প্রধান কাজ**
অ্যাওর্টা	অ্যাওর্টা দেহের বৃহত্তম ধমনি। ফুসফুস ছাড়া অন্য সকল অঙ্গে অক্সিজেন-সমৃদ্ধ (oxygenated) রক্ত পরিবহন করে। পালমোনারি ধমনি অক্সিজেন-রিক্ত রক্ত (de-oxygenated) ফুসফুসে বহন করে।
পালমোনারি শিরা	ফুসফুস থেকে অক্সিজেন-সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিন্ডের বাম অ্যাট্রিয়ামে পরিবহন করে।
বাম অ্যাট্রিয়াম	পালমোনারি শিরার মাধ্যমে ফুসফুস থেকে অক্সিজেন-সমৃদ্ধ রক্ত গ্রহণ করে।
বাম ভেন্ট্রিকল	হৃৎপিন্ডের সর্বাধিক পেশিবহুল অংশ। অ্যাওর্টার মাধ্যমে ফুসফুস ছাড়া দেহের অন্যান্য অংশে রক্ত পাম্প করে।
বাইকাসপিড কপাটিকা	বাম ভেন্ট্রিকলের সংকোচনকালে বাম অ্যাট্রিয়ামে রক্তের পশ্চাৎ প্রবাহ প্রতিরোধ করে।
কর্ডি টেন্ডিনি	ভেন্ট্রিকলের সংকোচনকালে কপাটিকার অভ্যন্তর ভাগ বাইরের দিকে ঘুরে যাওয়া প্রতিরোধ করে।
ডান ভেন্ট্রিকল	পালমোনারি ধমনির মাধ্যমে অক্সিজেন-রিক্ত রক্তকে ফুসফুসে পাম্প করে।
ট্রাইকাসপিড কপাটিকা	ডান ভেন্ট্রিকলের সংকোচনকালে ডান অ্যাট্রিয়ামে রক্তের পশ্চাৎ প্রবাহ প্রতিরোধ করে।
সেমিলুনার কপাটিকা	ডান ভেন্ট্রিকলের শিথিল অবস্থায় পালমোনারি ধমনি থেকে রক্তের পশ্চাৎ প্রবাহ প্রতিরোধ করে।
ডান অ্যাট্রিয়াম	ভেনা ক্যাভার মাধ্যমে ফুসফুস ছাড়া দেহের অন্য সকল অঙ্গ থেকে অক্সিজেনরিক্ত রক্ত গ্রহণ করে।
ভেনা ক্যাভা	দেহের এই প্রধান শিরার মাধ্যমে অক্সিজেন-রিক্ত রক্ত ডান অ্যাট্রিয়ামে ফেরত আসে।

মাছ এবং মানুষের হৃৎপিন্ডের মধ্যে পার্থক্য	
মাছের হৃৎপিন্ড	**মানুষের হৃৎপিন্ড**
১. দুই প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট।	১. চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট।
২. ১টি অ্যাট্রিয়াম ও ১টি ভেন্ট্রিকল।	২. দুটি অ্যাট্রিয়া ও দুটি ভেন্ট্রিকল।
৩. সাইনাস ভেনোসাস নামক উপপ্রকোষ্ঠ আছে।	৩. সাইনাস ভেনোসাস নেই।
৪. কেবল CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে।	৪. O_2- সমৃদ্ধ ও CO_2-সমৃদ্ধ উভয় ধরনের রক্ত পরিবহন করে।
৫. একচক্রী রক্ত সংবহন ঘটে।	৫. দ্বিচক্রী সংবহন ঘটে।

হার্টবিট–কার্ডিয়াক চক্র (Cardiac Cycle)

হৃৎপিণ্ডের অ্যাট্রিয়া ও ভেন্ট্রিকলদুটির পর্যায়ক্রমিক সংকোচন ও প্রসারণের ফলে রক্ত দেহের ভিতরে গতিশীল থাকে। হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠগুলোর সংকোচনকে **সিস্টোল** (systole) ও প্রসারণকে **ডায়াস্টোল** (diastole) বলে। হৃৎপিণ্ডের একবার সংকোচন (সিস্টোল) ও একবার প্রসারণ (ডায়াস্টোল)-কে একত্রে **হার্টবিট বা হৃৎস্পন্দন** (heart beat) বলা হয়। প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ ব্যক্তির হৃৎস্পন্দনের হার প্রতি মিনিটে প্রায় ৭০-৮০ বার। প্রতি হৃৎস্পন্দন সম্পন্ন করতে সিস্টোল ও ডায়াস্টোলের যে চক্রাকার ঘটনাবলি অনুসৃত হয় তাকে **কার্ডিয়াক চক্র বা হৃৎচক্র** বলে। যদি প্রতি মিনিটে গড়ে ৭৫ বার হার্টবিট হয় তবে কার্ডিয়াক চক্রের সময়কাল $\frac{৬০}{৭৫}$ = ০.৮ সেকেন্ড। স্বাভাবিকভাবেই অ্যাট্রিয়াল চক্র এবং ভেন্ট্রিকুলার চক্র উভয়েরই স্থিতিকাল ০.৮ সেকেন্ড।

কার্ডিয়াক চক্র চলাকালীন হৃৎপিন্ডের মধ্যে রক্তসংবহন

কার্ডিয়াক চক্র চলাকালীন কীভাবে হৃৎপিন্ডে রক্ত সংবহন হয় তা নিচের চারটি ঘটনাবলির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়।

১. **অ্যাট্রিয়ামের ডায়াস্টোল** (Atrial diastole) : এ সময় অ্যাট্রিয়ামদুটি প্রসারিত বা শিথিল অবস্থায় থাকে। ট্রাইকাসপিড এবং বাইকাসপিড কপাটিকা বন্ধ হয়। অ্যাট্রিয়াম-মধ্যবর্তী চাপ হ্রাস পায়, ফলে দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত সুপিরিয়র ভেনাক্যাভা এবং ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা দিয়ে ডান অ্যাট্রিয়ামে এবং পালমোনারি শিরা দিয়ে ফুসফুস থেকে O_2-সমৃদ্ধ রক্ত বাম অ্যাট্রিয়ামে প্রবেশ করে। এ সময় হৃৎপিণ্ডের পেশি থেকেও CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত করোনারি সাইনাসের মাধ্যমে ডান অ্যাট্রিয়ামে আসে। অ্যাট্রিয়ামদুটি রক্তপূর্ণ হলে অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোল ঘটে। এ দশার সময়কাল ০.৭ সেকেন্ড।

www.Educationblog24.Com

২. অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোল (Atrial systole) : অ্যাট্রিয়ামের ডায়াস্টোল শেষ হলে প্রায় একই সাথে উভয় অ্যাট্রিয়াম সংকুচিত হয়। যদিও সংকোচনের ঢেউ প্রথমে ডান অ্যাট্রিয়াম থেকে শুরু হয়ে বাম অ্যাট্রিয়ামে ছড়িয়ে পড়ে। **ডান অ্যাট্রিয়ামের সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড** (sino-atrial node) থেকে সংকোচনের সূত্রপাত ঘটে। অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোল ০.১ সেকেন্ড স্থায়ী হয়। প্রথমার্ধে অর্থাৎ প্রথম ০.০৫ সেকেন্ড সংকোচন সর্বোচ্চ মাত্রায় থাকে, একে **ডায়নামিক** (dynamic) পর্যায় বলে। আর দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ পরবর্তী ০.০৫ সেকেন্ড ক্ষীণতর হতে হতে প্রশমিত হয়। একে বলে **অ্যাডায়নামিক** (adynamic) পর্যায়।

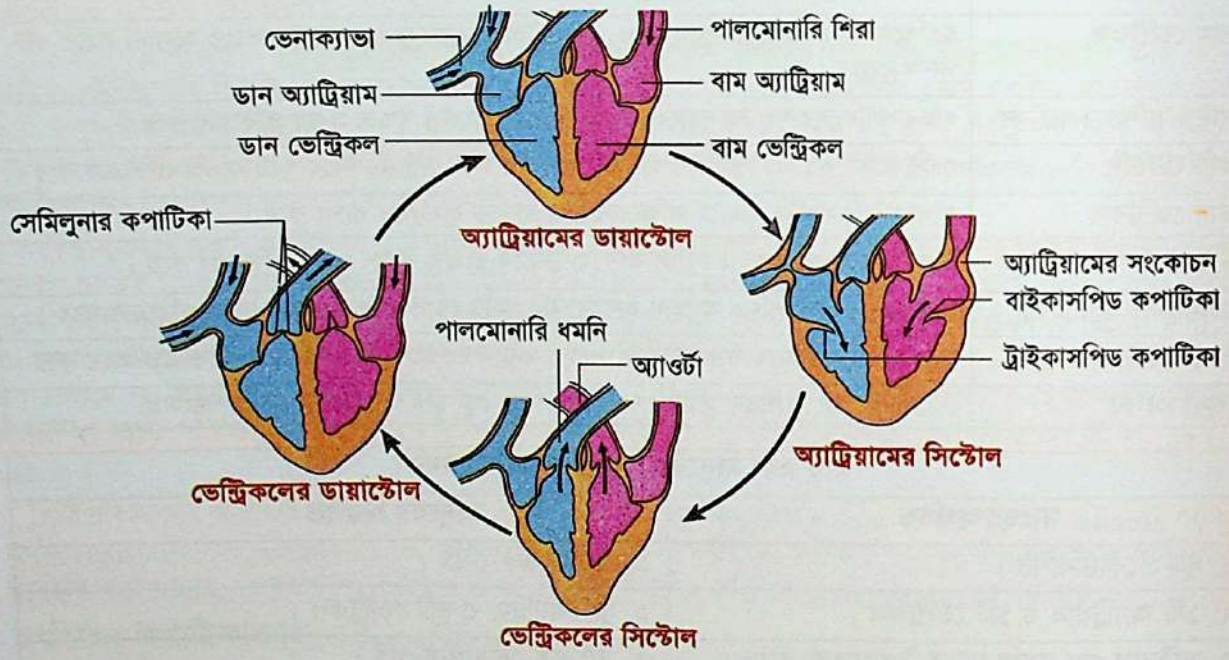

চিত্র ৪.১৬ : কার্ডিয়াক চক্র

৩. ভেন্ট্রিকলের সিস্টোল (Ventricular systole) : অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোলের পরপরই (প্রায় ০.১–০.২ সেকেন্ড পর) ভেন্ট্রিকলদুটি রক্তপূর্ণ অবস্থায় সংকুচিত হয়। ট্রাইকাসপিড ও বাইকাসপিড কপাটিকা সজোরে বন্ধ হয় এবং সেমিলুনার কপাটিকা খুলে যায়। এতে **লাব** (lub) সদৃশ প্রথম শব্দের সৃষ্টি হয়। ভেন্ট্রিকল-মধ্যবর্তী চাপ বৃদ্ধি পায় এবং ভেন্ট্রিকল থেকে রক্ত ভেন্ট্রিকলের বাইরে নির্গত হয়। ডান ভেন্ট্রিকল থেকে CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত পালমোনারি ধমনিতে এবং বাম ভেন্ট্রিকল থেকে O_2-সমৃদ্ধ রক্ত অ্যাওর্টায় প্রবেশ করে। এ দশার সময়কাল ০.৩ সেকেন্ড।

৪. ভেন্ট্রিকলের ডায়াস্টোল (Ventricular diastole) : ভেন্ট্রিকলের সিস্টোলের পরপরই এর ডায়াস্টোল শুরু হয়। এ দশার সময়কাল ০.৫ সেকেন্ড। যখনই ভেন্ট্রিকল প্রসারিত হতে থাকে তখন ভেন্ট্রিকল মধ্যস্থ চাপ কমতে থাকে। ফলে অ্যাওর্টা ও পালমোনারি ধমনির রক্ত ভেন্ট্রিকলে ফিরে আসতে চায়। কিন্তু অতি দ্রুত সেমিলুনার কপাটিকা বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় **ডাব** (dub) সদৃশ দ্বিতীয় শব্দ উৎপন্ন হয়। সুতরাং, হৃৎপিন্ডের শব্দগুলো হচ্ছে–

ভেন্ট্রিকলের সিস্টোল= লাব (lub); ভেন্ট্রিকলের ডায়াস্টোল = ডাব (dub)।

অ্যাট্রিয়াম		ভেন্ট্রিকল	
ডায়াস্টোল	সিস্টোল	ডায়াস্টোল	সিস্টোল
০.৭ সে.	০.১ সে.	০.৫ সে.	০.৩ সে.

ভেন্ট্রিকলের প্রসারণ অব্যাহত থাকায় এর অভ্যন্তরের চাপ ক্রমশ কমতে থাকে এবং তা যখন অ্যাট্রিয়ামের চাপের নিচে নেমে যায় তখন অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার কপাটিকা খুলে যায়। ভেন্ট্রিকল তখন অ্যাট্রিয়াম থেকে আগত রক্তে পূর্ণ হতে থাকে। সামান্য বিশ্রামের পর আবার আগের মতো ভেন্ট্রিকলের সিস্টোল শুরু হয়।

www.Educationblog24.Com

হার্টবিট-এর মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ এবং উদ্দীপনা পরিবহন
(Myogenic Regulation of Heart Beat and Transmission of Impulse)

মানুষসহ বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীর হৃৎপিণ্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংকুচিত-প্রসারিত হয়ে সমগ্র দেহে রক্ত সঞ্চালন ঘটায়। এতে প্রচণ্ড গতিতে দেহে রক্ত প্রবাহিত হয়। বাইরের কোন উদ্দীপনা ছাড়াই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় এ ধরনের নিয়ন্ত্রণকে মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ (**myogenic** = muscle origin; myo = muscle + genic = giving rise to) বলে অর্থাৎ স্নায়ুতন্ত্র বা হরমোন, কিংবা অন্য কোন উদ্দীপনা ছাড়াই নিজ থেকে হৃৎস্পন্দন তৈরি হয়। কোন স্তন্যপায়ী প্রাণীর হৃৎপিণ্ড তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে O_2-সমৃদ্ধ লবণ দ্রবণে ৩৭° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রেখে দিলে তাতে বাইরের কোন উদ্দীপনা ছাড়াই বেশ কিছু সময় পর্যন্ত হার্টবিট চলতে থাকবে। প্রকৃতপক্ষে হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরের কিছু রূপান্তরিত হৃৎপেশি মায়োজেনিক প্রকৃতির জন্য দায়ী। হৃৎপিণ্ডের এ বিশেষ ধরনের পেশিগুলোকে সম্মিলিতভাবে **সংযোগী টিস্যু বা জাংশনাল টিস্যু** (junctional tissue) বলে। হৃৎপিণ্ডের সংযোগী টিস্যুগুলো নিচে বর্ণিত চার ধরনের।

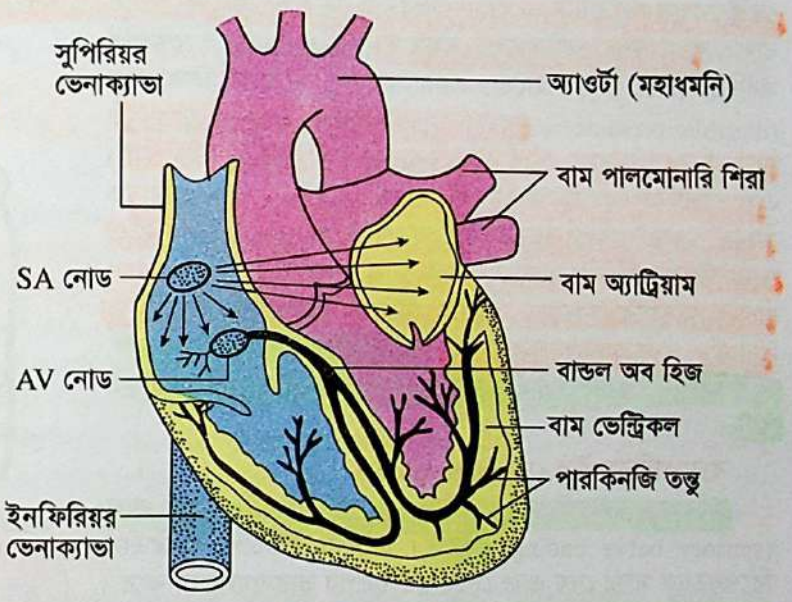

চিত্র ৪.১৭ : মানুষের হৃৎপিণ্ডের বিশেষ সংযোগী টিস্যু

১. **সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড** (Sino-Atrial Node, সংক্ষেপে SAN) : এটি ডান অ্যাট্রিয়ামের প্রাচীরে, ডান অ্যাট্রিয়াম ও সুপিরিয়র ভেনাক্যাভার ছিদ্রের সংযোগস্থলে অবস্থিত এবং স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে কিছু স্নায়ুপ্রান্তসহ অল্প সংখ্যক হৃৎপেশিতন্তু নিয়ে গঠিত। এগুলো ১০–১৫ mm লম্বা, ৩ mm চওড়া এবং ১ mm পুরু। SAN থেকে সৃষ্ট একটি **অ্যাকশন পটেনসিয়াল** (action potential) ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালের মাধ্যমে হার্টবিট শুরু হয়। এ অ্যাকশন পটেনসিয়াল ছড়িয়ে সাথে সাথে স্নায়ু উদ্দীপনার অনুরূপ উত্তেজনার একটি ছোট তরঙ্গ হৃৎপেশির দিকে অতিক্রান্ত হয়। এটি অ্যাট্রিয়ামের প্রাচীরে ছড়িয়ে অ্যাট্রিয়ামের সংকোচন ঘটায়। SAN-কে **পেসমেকার** (pacemaker) বলে, কারণ প্রতিটি উত্তেজনার তরঙ্গ এখানেই সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তী উত্তেজনার তরঙ্গ সৃষ্টির উদ্দীপক হিসেবেও এটি কাজ করে।

২. **অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার নোড** (Atrio-Ventricular Node, সংক্ষেপে AVN) : ডান অ্যাট্রিয়াম-ভেন্ট্রিকলের প্রাচীরে অবস্থিত SAN-এর অনুরূপ গঠন বৈশিষ্ট্যের AVN টিস্যু **AV বান্ডেল** নামক বিশেষ পেশিতন্তু গুচ্ছের সাথে যুক্ত থাকে। AV বাণ্ডেল-এর মাধ্যমে হৃৎউদ্দীপনার ঢেউ অ্যাট্রিয়াম থেকে ভেন্ট্রিকলে প্রবাহিত হয়। SAN থেকে AVN-এ উদ্দীপনার ঢেউ পরিবহনে ০.১৫ সেকেন্ড দেরি হয়। অর্থাৎ ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল শুরুর আগে অ্যাট্রিয়াল সিস্টোল সম্পূর্ণ হয়।

৩. **বান্ডল অব হিজ** (Bundle of His) : হৃৎপিণ্ডের এ বিশেষ টিস্যুটি AV নোড থেকে উৎপন্ন হয়ে আন্তঃভেন্ট্রিকুলার (আন্তঃনিলয়) প্রাচীরের পশ্চাৎভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ডান ও বাম শাখায় বিভক্ত হয়ে ভেন্ট্রিকলের পারকিঞ্জি তন্তুতে মিলিত হয়। এটি AV নোড থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে ভেন্ট্রিকলের প্রাচীরে সঞ্চারিত করে।

৪. **পারকিঞ্জি তন্তু** (Purkinje fibre) : এ তন্তুগুলো বাণ্ডল অব হিজ থেকে উৎপন্ন হয়ে ভেন্ট্রিকলের প্রাচীরে জালক সৃষ্টি করে। বান্ডল অব হিজ থেকে প্রাপ্ত উদ্দীপনা পারকিঞ্জি তন্তুর মাধ্যমে ভেন্ট্রিকলের প্রাচীরে ছড়িয়ে পড়ে ভেন্ট্রিকল দুটির সংকোচন ঘটায়। হৃৎপিণ্ডের বিশেষ সংযোগী টিস্যুগুলোর মাধ্যমে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহের অনুক্রমটি নিম্নরূপ :

SA নোড → AV নোড → বান্ডল অব হিজ → পারকিঞ্জি তন্তু

www.Educationblog24.Com

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যারোরিসেপ্টরের ভূমিকা
(Role of Baroreceptor in controlling Blood Pressure)

রক্তচাপ বা ব্লাড প্রেসার (Blood pressure)

রক্তনালির ভিতর দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রাচীর গাত্রে যে পার্শ্বচাপ প্রয়োগ করে তাকে **রক্তচাপ** বলে। হৃৎপিণ্ডের বিশেষত ভেন্ট্রিকল (নিলয়)-এর সংকোচনের ফলেই রক্ত ধমনির মধ্যদিয়ে অব্যাহতভাবে বহমান থাকে। **ভেন্ট্রিকলের সংকোচন** (systole) অবস্থায় রক্তচাপ বেশি থাকে এবং এ চাপকে **সিস্টোলিক চাপ** (systolic pressure) বলে। অপরদিকে **ভেন্ট্রিকলের প্রসারণ** (diastole) কালে রক্তচাপ সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে। একে বলা হয় **ডায়াস্টোলিক চাপ** (diastolic pressure)। একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের স্বাভাবিক সিস্টোলিক চাপ হচ্ছে ১১০-১২০ mmHg (মিলিমিটার পারদ স্তম্ভ) এবং স্বাভাবিক ডায়াস্টোলিক চাপ ৭০–৮০ mmHg. রক্ত স্বাভাবিক সীমার উপরে থাকলে তাকে **উচ্চ রক্তচাপ** (hypertension) এবং স্বাভাবিক সীমার নিচে থাকলে তাকে **নিম্ন রক্তচাপ** (hypotension) বলে। মানুষের রক্তচাপ মাপার যন্ত্রকে স্ফিগমোম্যানোমিটার (sphygmomanometer) বলা হয়। বয়স, লিঙ্গ, পেশা, খাদ্যাভ্যাস, জীবনযাপন পদ্ধতি ইত্যাদি কারণে মানুষের রক্তচাপের তারতম্য ঘটে।

চিত্র ৪.১৮ : অ্যাওর্টিক এবং ক্যারোটিক ব্যারোরিসেপ্টর

ব্যারোরিসেপ্টর (Baroreceptors)

মানুষের রক্তবাহিকার প্রাচীরে বিশেষ সংবেদী স্নায়ু প্রান্ত (sensory nerve ending) থাকে। এগুলো রক্তচাপ পরিবর্তনে বিশেষভাবে সাড়া দেয় এবং দেহে রক্ত চাপের ভারসাম্য রক্ষা করে। এ সংবেদী স্নায়ু প্রান্তকে **ব্যারোরিসেপ্টর** বলে। এসব স্নায়ু প্রান্ত অস্বাভাবিক রক্তচাপ শনাক্ত করে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে যে বার্তা পাঠায় তার প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র হৃৎস্পন্দন মাত্রা ও শক্তি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রক্তচাপ স্বাভাবিককরণে ভূমিকা পালন করে। সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি **ব্যারোরিফ্লেক্স** (baroreflex) নামে পরিচিত।

ব্যারোরিসেপ্টর দু'রকম–উচ্চচাপ ব্যারোরিসেপ্টর এবং নিম্নচাপ ব্যারোরিসেপ্টর।

১. উচ্চচাপ ব্যারোরিসেপ্টর (High-Pressure Baroreceptors) : অনুপ্রস্থ অ্যাওর্টিক আর্চ এবং ডান ও বাম অন্তঃস্থ ক্যারোটিড ধমনির **ক্যারোটিড সাইনাস**-এ এসব ব্যারোরিসেপ্টর অবস্থান করে। রক্তের চাপ বেড়ে গেলে অর্থাৎ রক্তনালির প্রসারণ ঘটলে সেখানকার ব্যারোরিসেপ্টরগুলো উদ্দীপ্ত হয় এবং এ উদ্দীপনা মস্তিষ্কের মেডুলায় সঞ্চালিত হয় এবং এখানে **ভ্যাসোমোটর** (vasomotor) কেন্দ্রটি দমিত হয়। ফলে সিমপ্যাথেটিক স্নায়ু বরাবর হৃৎপিন্ড ও রক্তনালিতে চেষ্টীয় (motor) বা আজ্ঞাবহ উদ্দীপনা পরিবহনের হার হ্রাস পায়। আজ্ঞাবহ উদ্দীপনার কমতিতে হৃৎপিন্ডের পাম্পিং ক্রিয়া এবং রক্তনালির মধ্য দিয়ে রক্ত সংবহনের মাত্রা কমে যায়। এভাবে রক্তচাপ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

রক্তচাপ পড়ে গেলে (যেমন–মানসিক আঘাতে) ক্যারোটিড ও অ্যাওর্টিক ব্যারোরিসেপ্টর থেকে সংকেত যথাক্রমে গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল ও ভ্যাগাস স্নায়ুর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মেডুলা অবলংগাটায় জড়ো হয়। মেডুলা অবলংগাটা তথ্যগুলো হৃৎপেশি, কার্ডিয়াক পেসমেকার, দেহের ধমনিকা বা আর্টারিওল (ধমনির সূক্ষ্ম শাখা) ও শিরায় প্রেরণ করে। ফলে হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয় ও সজোরে সংকুচিত হয় এবং ধমনির রক্তচাপ স্বাভাবিক হয়ে আসে।

২. নিম্নচাপ ব্যারোরিসেপ্টর বা আয়তন রিসেপ্টর (Low-Pressure Baroreceptors or Volume Receptors): বড় বড় সিস্টেমিক শিরা, পালমোনারি রক্তবাহিকা এবং ডান অ্যাট্রিয়াম ও ভেন্ট্রিকলের প্রাচীরের ব্যারোরিসেপ্টরগুলো এ ধরনের। এসব রিসেপ্টর রক্তের আয়তন (blood volume) নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখে। রক্তের আয়তন কমে গেলে রক্তচাপও কমে যায়। তখন আয়তন রিসেপ্টর মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস-এ বার্তা প্রেরণ করে। ফলে পিটুইটারি গ্রন্থির নিউরোহাইপোফাইসিস কর্তৃক অ্যান্টিডাইউরেটিক বা ভ্যাসোপ্রেসিন হরমোন ক্ষরণ বেড়ে যায়। উক্ত হরমোন বৃক্কনালিকায় পানি পুনঃশোষণ বাড়িয়ে রক্তের আয়তন বৃদ্ধির মাধ্যমে রক্তচাপ বাড়ায়। ভ্যাসোপ্রেসিন

www.Educationblog24.Com

হরমোন সরাসরি রক্তনালিকার সংকোচন ঘটিয়েও রক্তচাপ বৃদ্ধি করে। রক্তের আয়তন তথা চাপ কমে গেলে স্বয়ংক্রিয় বা সিমপ্যাথেটিক স্নায়ু উদ্দীপ্ত হওয়ায় বৃক্কের অন্তর্বাহী ধমনির **জাক্সটা-গোমেরুলার কোষ** (juxtaglomerular cell) থেকে **রেনিন** এনজাইম ক্ষরণ বেড়ে যায়। রেনিন এনজাইমের কার্যকারিতায় কয়েকটি জটিল বিক্রিয়ার মাধ্যমে রক্তের আয়তন বাড়িয়ে রক্তচাপ বৃদ্ধি করে। অর্থাৎ আয়তন রিসেপ্টরের প্রভাব রয়েছে রক্ত সংবহন ও রেচন উভয় তন্ত্রে।

মানবদেহে রক্ত সংবহন (Blood Circulation of Human Body)

মানুষের রক্ত সংবহনতন্ত্র **বদ্ধ ধরনের** (closed type)। অর্থাৎ রক্ত হৃৎপিণ্ড, ধমনি, শিরা ও কৈশিক নালির মাধ্যমে সঞ্চালিত হয়ে অভ্যন্তরীণ পরিবহন সম্পন্ন করে। তাছাড়া মানুষের রক্ত সংবহনতন্ত্রে **দ্বি-চক্রীয় সংবহন** (double circulation) অর্থাৎ **সিস্টেমিক** (systemic) ও **পালমোনারি** (pulmonary) চক্র দেখা যায়। মানবদেহে চার প্রক্রিয়ায় রক্তসংবহন সংঘটিত হয়, যথা– ১. সিস্টেমিক, ২. পালমোনারি, ৩. পোর্টাল এবং ৪. করোনারি। নিচে এসব প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

১. সিস্টেমিক সংবহন (Systemic circulation)

যে সংবহনে রক্ত বাম ভেন্ট্রিকল থেকে বিভিন্ন রক্ত বাহিকার মাধ্যমে অঙ্গগুলোতে পৌঁছায় এবং অঙ্গ থেকে ডান অ্যাট্রিয়ামে ফিরে আসে, তাকে **সিস্টেমিক সংবহন** বলে। সব সিস্টেমিক ধমনির উদ্ভব হয় **অ্যাওর্টা** (aorta) বা **মহাধমনি** থেকে, আর অ্যাওর্টার উদ্ভব ঘটে বাম ভেন্ট্রিকল থেকে। হৃৎপিণ্ডের সংকোচনের ফলে বাম ভেন্ট্রিকল থেকে রক্ত প্রথমে অ্যাওর্টার ভিতর দিয়ে ধমনিতে প্রবেশ করে। পরে দেহের বিভিন্ন টিস্যু ও অঙ্গের **ধমনিকা** (arteriole) ও কৈশিক নালির (capillaries) রক্ত জালিকার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়। জালিকা থেকে রক্ত পুনরায় সংগৃহীত হয়ে উপশিরার মাধ্যমে শিরায় প্রবেশ করে। সব শিরার রক্ত পরে **সুপিরিয়র ভেনাক্যাভা** (উর্ধ্ব মহাশিরা) ও **ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা** (নিম্ন মহাশিরা) দিয়ে হৃৎপিণ্ডের ডান অ্যাট্রিয়ামে প্রবেশ করে। ডান অ্যাট্রিয়াম থেকে রক্ত ডান ভেন্ট্রিকলে গমন করে। এভাবে সিস্টেমিক সংবহন সমাপ্ত হয়। হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়ে পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফেরত আসতে সিস্টেমিক সংবহনের সময় লাগে ২৫–৩০ সেকেন্ড।

কাজ : সিস্টেমিক সংবহনে রক্ত দেহকোষের চারপাশে অবস্থিত কৈশিক জালিকা অতিক্রমকালে কোষে O_2, খাদ্যসারসহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করে এবং একই সাথে কোষে সৃষ্ট CO_2, রেচন পদার্থ ইত্যাদি কোষ থেকে অপসারিত হয়।

বাম ভেন্ট্রিকল→ অ্যাওর্টা→টিস্যু ও অঙ্গ→ মহাশিরা (ভেনাক্যাভা)→ ডান অ্যাট্রিয়াম→ডান ভেন্ট্রিকল।

২. পালমোনারি সংবহন (Pulmonary circulation)

যে সংবহনে রক্ত হৃৎপিণ্ডের ডান ভেন্ট্রিকল থেকে ফুসফুসে পৌঁছায় এবং ফুসফুস থেকে বাম অ্যাট্রিয়ামে ফিরে আসে, তাকে **পালমোনারি বা ফুসফুসীয় সংবহন** বলে। পালমোনারি সংবহনের শুরু হয় **পালমোনারি ধমনি** থেকে, আর পালমোনারি ধমনির উদ্ভব ঘটে ডান ভেন্ট্রিকল থেকে। ডান ভেন্ট্রিকলের সংকোচনের ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড-সমৃদ্ধ রক্ত পালমোনারি ধমনিতে প্রবেশ করে। এরপর রক্ত ধমনিকা (arteriole) হয়ে ফুসফুসের অ্যালভিওলাসের চারপাশে অবস্থিত কৈশিক নালিতে উপস্থিত হয়। কৈশিক নালি থেকে অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত পুনরায় ক্ষুদ্রতর শিরা বা **ভেনিউল** (venule) এবং অবশেষে ৪টি (প্রতি ফুসফুস থেকে ২টি) পালমোনারি শিরার মাধ্যমে বাম অ্যাট্রিয়ামে ফেরত আসে।

ডান ভেন্ট্রিকল → পালমোনারি ধমনি→ ফুসফুস→ পালমোনারি শিরা→ বাম অ্যাট্রিয়াম→বাম ভেন্ট্রিকল।

কাজ : এ সংবহনের মাধ্যমে CO_2–সমৃদ্ধ রক্ত ফুসফুসে প্রবেশ করে। সেখানে অ্যালভিওলাসে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় গ্যাসের বিনিময় ঘটে ফলে O_2–সমৃদ্ধ রক্ত শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে ফেরত আসে।

৩. পোর্টাল সংবহন (Portal circulation)

সিস্টেমিক ও পালমোনারি এ দুটি সম্পূর্ণ সংবহন চক্র ছাড়াও অনেক মেরুদণ্ডী প্রাণীতে রক্ত চলার পথে কিছুটা পার্শ্বপথ অনুসরণ করে। এসব ক্ষেত্রে কোনো অঙ্গের কৈশিক জালিকা থেকে উৎপন্ন শিরা হৃৎপিণ্ডের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে অন্য একটি মাধ্যমিক অঙ্গে প্রবেশ করে এবং সেখানে পুনরায় জালিকায় বিভক্ত হয়। এ ধরনের রক্ত সংবহনকে **পোর্টাল সংবহন** বলে।

মেরুদণ্ডী প্রাণীতে সাধারণত **যকৃত বা হেপাটিক** (hepatic) এবং **বৃক্কীয় বা রেনাল** (renal)–এ দুধরনের পোর্টাল সংবহন দেখা যায়। তবে রেনাল পোর্টাল সংবহন মানুষসহ বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীতে অনুপস্থিত।

www.Educationblog24.Com

হেপাটিক (যকৃত) পোর্টাল সংবহন: পাকস্থলি, ক্ষুদ্রান্ত্র, অগ্ন্যাশয়, অন্ত্র ও প্লীহা থেকে কৈশিক জালিকার মাধ্যমে সংগৃহীত রক্ত **হেপাটিক পোর্টাল শিরা** (hepatic portal vein)-র ভিতর দিয়ে যকৃতের দিকে প্রবাহিত হওয়াকে **হেপাটিক পোর্টাল সংবহন** বলে। যকৃতে পৌঁছে হেপাটিক পোর্টাল শিরা পুনরায় কৈশিক জালিকায় বিভক্ত হয়। এসব কৈশিক জালিকা পরে একত্রীভূত হয়ে **হেপাটিক শিরা** (hepatic vein) গঠন করে এবং এর মাধ্যমে রক্ত ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভায় বাহিত হয়। সেখান থেকে রক্ত হৃৎপিণ্ডে পৌঁছায়।

পৌষ্টিক অঙ্গসমূহ→হেপাটিক পোর্টাল শিরা→যকৃত→হেপাটিক শিরা→ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা→ হৃৎপিণ্ড।

হেপাটিক পোর্টাল সংবহনের প্রয়োজনীয়তা : (i) পৌষ্টিকনালি থেকে শোষিত সরল খাদ্য (গ্লুকোজ, অ্যামিনো এসিড, ফ্যাটি এসিড ইত্যাদি) পোর্টাল সংবহনের মাধ্যমে যকৃতে আসে। সেখানে অতিরিক্ত গ্লুকোজ গ্লাইকোজেন-এ পরিণত হয়ে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত হয়। দেহকোষে গ্লুকোজের অভাব ঘটলে গ্লাইকোজেন পুনরায় গ্লুকোজে পরিণত হয়ে রক্তে প্রবাহিত হয়। (ii) দূষিত নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ অ্যামোনিয়া যকৃতে ইউরিয়ায় পরিণত হয়ে বৃক্কের মাধ্যমে দেহের বাইরে নির্গত হয়। ফলে রক্ত পরিশুদ্ধ হয়। (iii) যকৃত রক্তে প্রোটিন উৎপন্ন করে রক্তে সরবরাহ করে।

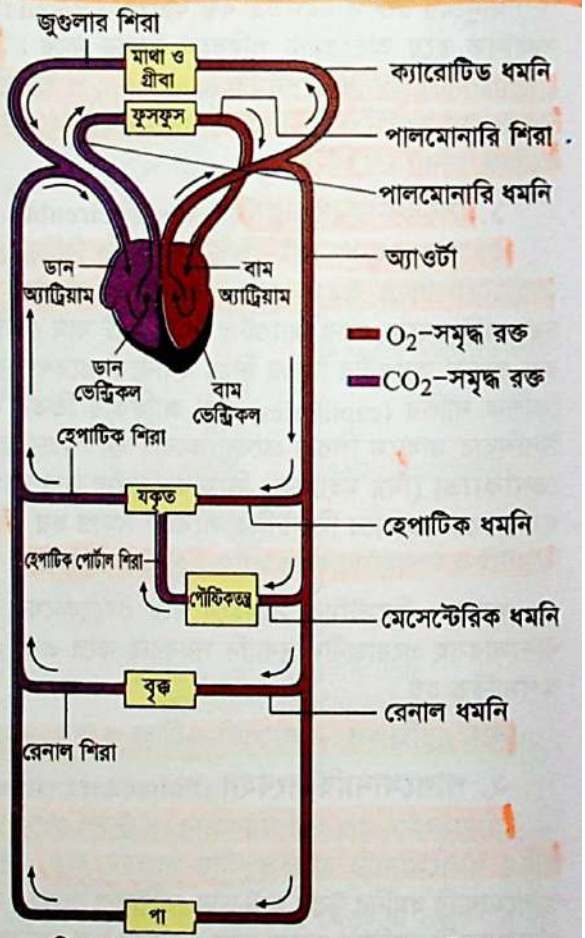

চিত্র ৪.১৯ : মানবদেহের রক্ত সংবহনের চিত্ররূপ

৪. করোনারি সংবহন (Coronary circulation)

দেহে রক্ত সংবহনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে আমৃত্যু যে অঙ্গটি রক্তের মাধ্যমে সমগ্র দেহের প্রতিটি কোষে অক্সিজেন ও পুষ্টি সরবরাহ করে, সেটি **হৃৎপিণ্ড**। হৃৎপিণ্ডের নিজের জন্যও পুষ্টি এবং অক্সিজেন প্রয়োজন। এ চাহিদা পূরণ হয় করোনারি সংবহনের মাধ্যমে। **হৃৎপিণ্ডের হৃৎপেশিতে রক্ত সঞ্চালনকারি সংবহনকে করোনারি রক্ত সংবহন বলে।**

হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে সরাসরি হৃৎগহ্বর থেকে রক্ত সঞ্চালিত হয় না। **সিস্টেমিক ধমনির গোড়া থেকে সৃষ্ট করোনরি ধমনির মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে O_2–সমৃদ্ধ রক্ত সংবাহিত হয়। হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর CO_2–সমৃদ্ধ রক্ত করোনারি শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের ডান অ্যাট্রিয়ামে প্রবেশ করে।**

সিস্টেমিক ধমনি → করোনারি ধমনি → হৃৎপ্রাচীর → করোনরি শিরা → ডান অ্যাট্রিয়াম।

হৃদরোগের বিভিন্ন অবস্থায় করণীয়
(Measures to be taken in different conditions of Heart Disease)

বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক অবস্থার প্রেক্ষিতে মানুষের হৃৎপিণ্ডে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। এসব সমস্যার মধ্যে বুকে ব্যথা, হার্ট অ্যাটাক ও হার্ট ফেইলিউর নিয়ে আলোচনা করা হলো।

বুকে ব্যথা (Chest pain) বা অ্যানজাইনা (Angina)

নানা কারণে বুকে ব্যথা হলেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে হৃৎপিন্ডজনিত বুক ব্যথা। **হৃৎপেশি যখন O_2-সমৃদ্ধ পর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহ পায় না তখন বুক নিষ্পেষিত হচ্ছে বা দম বন্ধ হয়ে আসছে এমন মারাত্মক অস্বস্তি অনুভূত হলে সে ধরনের বুক ব্যথাকে অ্যানজাইনা বা অ্যানজাইনা পেকটোরিস** (angina / angina pectoris) বলে। অ্যানজাইনাকে সাধারণত হার্ট অ্যাটাকের পূর্বাবস্থা মনে করা হয়।

www.Educationblog24.Com

অ্যানজাইনার লক্ষণ (Symptoms of Angina)

১. উরঃফলক বা স্টার্নামের (sternum) পিছনে বুকে ব্যথা হওয়া।
২. ব্যায়াম বা অন্য শারীরিক কাজে, মানসিক চাপ, অতি ভোজন, শৈত্য বা আতংকে বুকে ব্যথা হতে পারে। ব্যথা ৫–৩০ মিনিট স্থায়ী হয়।
৩. অ্যানজাইনা গলা, কাঁধ, চোয়াল, বাহু, পিঠ এমনকি দাঁতেও ছড়াতে পারে।
৪. অনেক সময় ব্যথা কোথেকে আসছে তাও বোঝা যায় না।
৫. বুকে জ্বালাপোড়া, চাপ, নিষ্পেষণ বা আড়ষ্ট ভাব সৃষ্টি হয়ে অস্বস্তির প্রকাশ ঘটায়।
৬. বুকে ব্যথা ছাড়াও হজমে গন্ডগোল ও বমি ভাব হতে পারে।
৭. ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া কিংবা দম ফুরিয়ে হাঁপানো দেখা দিতে পারে।

অনেক রোগী অ্যানজাইনা টের পায় না, তবে কাঁধ ও বাহু ভারী হয়ে আসে। বুকে ব্যথার সাথে সাথে ঘাম হয়, মাথা ঝিমঝিম করে বা শরীর ফ্যাকাশে হয়ে যায়। রোগী চিন্তান্বিত থাকে, মাথা ঝুলে থাকে। সারাদিন দুর্বল ও পরিশ্রান্ত থাকে এবং তখন সহজ কাজও কঠিন মনে হয়।

করণীয় / প্রতিকার (Control)

সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া এবং তা ধরে রাখাই হচ্ছে অ্যানজাইনা প্রতিরোধের প্রধান উপায়। এজন্যে কিছু বিষয় বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পালন করা উচিত। কিছু বিষয় আছে যার নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতে নেই, যেমন-বয়স, লিঙ্গভেদ, হৃদরোগ ও অ্যানজাইনার পারিবারিক ইতিহাস। যে সব বিষয় আমাদের নাগালে তার মধ্যে রয়েছে: হাঁটা-চলা বা ব্যায়াম করা, স্থূলতা প্রতিরোধ করা, সুষম ও হৃৎবান্ধব খাবার খাওয়া, রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখা, ডায়াবেটিস প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণে রাখা, ধূমপান ত্যাগ করা; মদপানের ধারে কাছে না যাওয়া, বছরে একবার (সম্ভব হলে দুবার) সম্পূর্ণ শরীরের চেকআপ করিয়ে নেওয়া।

হার্ট অ্যাটাক (Heart Attack or Myocardial Infarction)

হৃৎপেশির সুস্থতার জন্য ক্রমাগতভাবে অক্সিজেন-সমৃদ্ধ রক্ত সরবরাহ জরুরি। করোনারি ধমনির মাধ্যমে অক্সিজেন–সমৃদ্ধ রক্ত পেশিতে পৌঁছায়। চর্বি জাতীয় পদার্থ, ক্যালসিয়াম, প্রোটিন প্রভৃতি করোনারি ধমনির অন্তর্গাত্রে জমা হয়ে বিভিন্ন আকৃতির প্লাক (plaques) গঠন করে। একে করোনারি অ্যাথেরোমা (coronary atheroma) বলে। প্লাকের বহির্ভাগ ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠে। এভাবে প্লাক শক্ত হতে হতে যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছায় তখন এগুলো বিদীর্ণ হয়। অণুচক্রিকা জমা হয়ে প্লাকের চতুর্দিকে তখন রক্ত জমাট বাঁধাতে শুরু করে। রক্ত জমাট বাঁধার কারণে করোনারি ধমনির লুমেন (গহ্বর) সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেলে হৃৎপেশিতে পুষ্টি ও অক্সিজেন-সমৃদ্ধ রক্তের সরবরাহও বন্ধ হয়ে যায়, ফলে হৃৎপেশি ধ্বংস হয় বা মরে যায় এবং মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এর নাম হার্ট অ্যাটাক বা মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন (myocardial infraction; মায়োকার্ডিয়াল অর্থ হৃৎপেশি, আর ইনফার্কশন অর্থ অপর্যাপ্ত রক্ত প্রবাহের কারণে টিস্যুর মৃত্যু)।

হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ

করোনারি ধমনিতে কোলেস্টেরল জাতীয় পদার্থ জমা হওয়া থেকে হার্ট অ্যাটাকে পরিসমাপ্তি হওয়া পর্যন্ত অনেক দিন অতিবাহিত হয়। এ সময়ের ভিতর বিভিন্ন লক্ষণের মধ্যে নিম্নোক্ত লক্ষণগুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়।

১. **বুকে অস্বস্তি** (Chest-discomfort) : বুকের ঠিক মাঝখানে অস্বস্তি হওয়া যা কয়েক মিনিট থাকে, চলে যায় আবার ফিরে আসে। বুকে অসহ্য চাপ, মোচড়ান, আছড়ান বা ব্যথা অনুভূত হয়।
২. **উর্ধ্বাঙ্গের অন্যান্য অংশে অস্বস্তি** (Discomfort in other areas of the upper body) : এক বা উভয় বাহু, পিঠ, গলা, চোয়াল বা পাকস্থলির উপরের অংশে অস্বস্তি বা ব্যথা অনুভব।
৩. **ঘন ঘন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস** (Shortness of breath) : বুকে অস্বস্তির সময় ঘন ঘন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ঘটে। অনেক সময় বুকে অস্বস্তি হওয়ার আগেও এমন অবস্থা দেখা দিতে পারে।
৪. **বমি-বমি ভাব** (Nausea) : পাকস্থলিতে অস্বস্তির সঙ্গে বমি-বমি ভাব, বমি হওয়া, হঠাৎ মাথা ঝিমঝিম করা অথবা ঠান্ডা ঘাম বেরিয়ে যাওয়া।
৫. **ঘুমে ব্যাঘাত** (Sleep disturbance) : ঘুমে ব্যাঘাত ঘটা, নিজেকে শক্তিহীন বা শ্রান্ত বোধ করা।

www.Educationblog24.Com

প্রতিরোধ

১. ঋতুকালীন টাটকা ফল ও সবজি খেতে হবে।
২. চর্বি ও কোলেস্টেরলযুক্ত খাবার বাদ দিতে হবে।
৩. **বডি-মাস ইন্ডেক্স** (Body Mass Index, BMI) মেনে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে।
৪. সঠিক ওজন, রক্তে কোলেস্টেরল মাত্রা ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়মিত ব্যায়াম (যেমন- প্রতিদিন ৩০ মিনিট হাঁটা ইত্যাদি) করতে হবে।
৫. ধূমপায়ী হলে অবশ্যই ধূমপান ত্যাগ করতে হবে, অধূমপায়ী হলে ধূমপান না করার প্রতিজ্ঞা করতে হবে।
৬. জীবনাভ্যাসে অ্যালকোহল নিষিদ্ধ রাখতে হবে।
৭. কোলেস্টেরল, রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।
৮. চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী নিয়মিত ওষুধ চালিয়ে যেতে হবে বা বন্ধ করতে হবে।
৯. বছরে অন্তত একবার (সম্ভব হলে দুবার) সমগ্র দেহ চেকআপের ব্যবস্থা করতে হবে।

হার্ট ফেইলিউর (Heart Failure)

হৃৎপিন্ড যখন দেহের চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত রক্তের যোগান দিতে পারে না তখন এ অবস্থাকে **হার্ট ফেইলিউর** বলে। অনেক সময় হৃৎপিন্ড রক্তে পরিপূর্ণ হতে না পারায়, কখনওবা হৃৎপ্রাচীরে যথেষ্ট শক্তি না থাকায় এমনটি হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে উভয় সমস্যাই একসঙ্গে দেখা যায়। অতএব হার্ট ফেইলিউর মানে হৃৎপিন্ড বন্ধ হয়ে গেছে, বা থেমে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে তা নয়। তবে হার্ট ফেইলিউরকে হৃৎপিন্ডের একটি মারাত্মক অবস্থা বিবেচনা করে সুচিকিৎসার কথা বলা হয়েছে।

হার্ট ফেইলিউরের কারণ

করোনারি ধমনির অন্তঃস্থ গাত্রে কোলেস্টেরল জমে ধমনির গহ্বর সংকীর্ণ করে দিলে হৃৎপ্রাচীর পর্যাপ্ত O_2-সমৃদ্ধ রক্ত সরবরাহ থেকে বঞ্চিত হয়। কালান্তরে হার্ট ফেইলিউর ঘটে। উচ্চ রক্তচাপ বেশি দিন স্থায়ী হলে ধমনির অন্তঃস্থ প্রাচীরে কোলেস্টেরল জমার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। ফলে রক্ত চলাচল বাধাগ্রস্ত হয় এবং হৃৎপিন্ড দুর্বল হয়ে পড়ে। ডায়াবেটিস হলে দেহ পর্যাপ্ত ইনসুলিন উৎপাদন বা সঠিকভাবে ব্যবহারও করতে পারে না। এ কারণে ধীরে ধীরে হৃৎপেশি ও হৃৎপিন্ডের বাহিকাগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে, ফলে হার্ট ফেইলিউর ঘটে। হৃৎপিন্ডে জন্মগত বা সংক্রমণজনিত কারণেও হার্ট ফেইলিউর ঘটতে পারে।

হার্ট ফেইলিউরের লক্ষণ

১. সক্রিয়, নিষ্ক্রিয় এমনকি ঘুমের মধ্যেও শ্বাসকষ্টে ভোগা এবং ঘুমের সময় মাথার নিচে দুটি বালিশ না দিলে শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়।
২. সাদা বা গোলাপি রঙের রক্তমাখানো মিউকাসসহ স্থায়ী কাশি বা ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস-প্রশ্বাস।
৩. শরীরের বিভিন্ন জায়গার টিস্যুতে তরল জমে ফুলে উঠে।
৪. পা, গোড়ালি, পায়ের পাতা, উদর ও যকৃত স্ফীত হয়ে যায়। জুতা পরতে গেলে হঠাৎ আঁটসাট মনে হয়।
৫. প্রতিদিন সব কাজে, সবসময় ক্লান্তিভাব। বাজার-সদাই করা, সিঁড়ি দিয়ে উঠা, কিছু বহন করা বা হাঁটা সবকিছুতেই শ্রান্তিভাব।
৬. পাকস্থলি সব সময় ভরা মনে হয় কিংবা বমি ভাব থাকে।
৭. হৃৎস্পন্দন এত দ্রুত হয় মনে হবে যেন হৃৎপিন্ড এক প্রতিযোগিতায় নেমেছে।
৮. কাজ-কর্ম, চলনে অসামঞ্জস্যতা এবং স্মৃতিহীনতা প্রকাশ পায়।

হার্ট ফেইলিউরের প্রতিকার

অসুখের শুরুতেই হার্ট ফেইলিউরের বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিশ্চিত হলে এবং প্রতিকার সম্বন্ধে সতর্ক হলে রোগীর তেমন সমস্যা থাকে না, সক্রিয় জীবন যাপনেও কোনো কিছু বাধা হয় না। হার্ট ফেইলিউরে আক্রান্ত রোগীদের সাধারণত ৩ ধরনের চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ রাখার চেষ্টা করা হয়।

১. **জীবনযাপন পদ্ধতির পরিবর্তন :** স্বাস্থ্যসম্মত আহার হচ্ছে রোগীদের প্রধান অবলম্বন। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী খাদ্য তালিকা দেখে নিয়মিত সুষম পানাহার করা উচিত।
২. **ওষুধ গ্রহণ :** হার্ট ফেইলিউরের ধরন দেখে চিকিৎসক যে সব ওষুধ নির্বাচিত করবেন নিয়মিত তা সেবন করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অব্যাহত রাখতে হবে।

www.Educationblog24.Com

৩. **অন্যান্য চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া :** হার্ট ফেইলিউর যেন খারাপের দিকে মোড় না নেয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে বিভিন্ন শারীরিক অব্যবস্থাপনা সারিয়ে তুলতে হবে বা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। যেমন- শরীরের ওজন বেড়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে টিস্যুতে পানি জমে থাকা। চিকিৎসককে বলতে হবে কখন ওজন পরীক্ষা করাতে হবে এবং ওজন পরিবর্তন সম্বন্ধে কখন তাঁকে রিপোর্ট করতে হবে।

উল্লিখিত ৩টি প্রতিকার পদ্ধতিতে কাজ না হলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী শল্যচিকিৎসা বা অন্য কোনো ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

হৃদরোগের চিকিৎসার ধারণা (The Concept of the Treatment of Heart Diseases)

হৃদরোগ নির্ণয়

নিচে বর্ণিত উপায়ে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হৃদরোগ নির্ণয় করতে পারেন।

১. চিকিৎসকগণ হার্ট বিটের হার বৃদ্ধি, হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক শব্দ, পা ফুলে যাওয়া, ঘাড়ের শিরা ফুলে যাওয়া, যকৃত বড় হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখে হৃদরোগ সহজেই নির্ণয় করতে পারেন।
২. **বুকের** X-ray করানোর মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের অবস্থা জানা যায়।
৩. **ইসিজি** (Electrocardiogram)– হৃৎপিণ্ডের প্রাথমিক রোগ নির্ণয়ে ইসিজি সাহায্য করে।
৪. **ইটিটি** (Exercise Tolerance Test)-এর সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের অবস্থা বা কার্যক্ষমতা ভালোভাবে জানা যায়।
৫. **রক্তের** BNP (Brain Natriuretic Peptide) পরীক্ষার মাধ্যমে হার্ট ফেইলিউর সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।
৬. **করোনারি এনজিওগ্রাম**-এর সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের রক্তনালিতে কোনো ব্লক আছে কিনা তা দেখা হয়।
৭. হৃৎপিণ্ডের পেশির অবস্থা জানা যায় MRI (Magnetic Resonance Imaging) পরীক্ষার মাধ্যমে।
৮. উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে শর্করা ও চর্বির পরিমাণ নির্ণয়ের পরীক্ষা করে হৃদরোগ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

আধুনিক বিশ্বে হৃদরোগের গবেষণার ফসল হিসেবে বেশ কিছু চিকিৎসা ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। নিচে এমন কয়েকটি চিকিৎসা ব্যবস্থার ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

পেসমেকার (Pacemaker)

হৃৎপিন্ডের ডান অ্যাট্রিয়াম-প্রাচীরের উপর দিকে অবস্থিত, বিশেষায়িত কার্ডিয়াক পেশিগুচ্ছে গঠিত ও স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রে নিয়ন্ত্রিত একটি ছোট অংশ যা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহ ছড়িয়ে দিয়ে হৃৎস্পন্দন সৃষ্টি করে এবং স্পন্দনের ছন্দময়তা বজায় রাখে তাকে **পেসমেকার** বলে। মানুষের হৃৎপিন্ডে **সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড** (sino-atrial node) হচ্ছে **পেসমেকার**। এটি অকেজো বা অসুস্থ হলে হৃৎস্পন্দন সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণের জন্য যে **কম্পিউটারাইজড বৈদ্যুতিক যন্ত্র** দেহে স্থাপন করা হয় তাকেও পেসমেকার বলে। অতএব, পেসমেকার দুধরনের– একটি হচ্ছে হৃৎপিন্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপী সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড (SA নোড) যা **প্রাকৃতিক পেসমেকার** নামে পরিচিত; অন্যটি হচ্ছে **যান্ত্রিক পেসমেকার**, এটি অসুস্থ প্রাকৃতিক পেসমেকারকে নজরদারির মধ্যে রাখে। প্রাকৃতিক পেসমেকারের কার্যক্রম কার্ডিয়াক চক্রের অধীনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে হৃদরোগের চিকিৎসার ধারণা ব্যাখ্যায় যান্ত্রিক পেসমেকার কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো।

যান্ত্রিক পেসমেকার কার্যক্রম (Artificial Pacemaker Activities)

অসুস্থ ও দুর্বল হৃৎপিন্ডে বিদ্যুৎ তরঙ্গ সৃষ্টি করে স্বাভাবিক স্পন্দন হার ফিরিয়ে আনার ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশে বুকে বা উদরে চামড়ার নিচে স্থাপিত ছোট এক বিশেষ যন্ত্রকে **পেসমেকার** বলে। দেহকে সুস্থ, সবল ও সক্রিয় রাখতে হলে হৃৎপিন্ডের সুস্থতা বজায় ও নিয়ন্ত্রণে রাখা একান্ত জরুরী। হৃৎপিন্ডের সুস্থতা পরিমাপের প্রাথমিক ধাপ হচ্ছে হৃৎস্পন্দনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিকের চেয়ে ধীর লয় বা দ্রুত গতিসম্পন্ন কিংবা অনিয়ত হলে অর্থাৎ অস্বাভাবিক স্পন্দন হলে তাকে **অ্যারিথমিয়া** (arrhythmia) বলে। এমন অবস্থায় মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়ে, ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস নেয় বা ফ্যাকাশে হয়ে যেতে পারে। প্রচন্ড অ্যারিথমিয়ায় দেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের ক্ষতি হতে পারে, মানুষ অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে বা মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। পেসমেকার ব্যবহারে সব ধরনের অ্যারিথমিয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, বাকি জীবন সক্রিয় থাকা যায়। দুজন আমেরিকান বিজ্ঞানী William Chardack এবং Wilson Greatbatch, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে দেহে স্থাপনযোগ্য পেসমেকার আবিষ্কার করেন।

www.Educationblog24.Com

যান্ত্রিক পেসমেকারের গঠন

একটি লিথিয়াম ব্যাটারি, কম্পিউটারাইজড জেনারেটর ও শীর্ষে সেন্সরযুক্ত কতকগুলো তার নিয়ে একটি পেসমেকার গঠিত। সেন্সরগুলোকে **ইলেকট্রোড** (electrode) বলে। ব্যাটারি জেনারেটরকে শক্তি সরবরাহ করে। ব্যাটারি ও জেনারেটর একটি পাতলা ধাতব বাক্সে আবৃত থাকে। তারগুলোর সাহায্যে জেনারেটরকে হৃৎপিন্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ইলেকট্রোডগুলো হৃৎপিন্ডের বৈদ্যুতিক কর্মকান্ড শনাক্ত করে তারের মাধ্যমে জেনারেটরে প্রেরণ করে।

পেসমেকারে অপরিরাহী আবরণযুক্ত (insulated) ১-৩টি তার থাকে। পেসমেকারের তারকে লিড (lead) বলে। হৃৎপিন্ডের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে তার প্রবেশের ধরন অনুযায়ী পেসমেকার নিচে বর্ণিত ৩ রকম।

১. **এক-প্রকোষ্ঠ পেসমেকার** (Single-chamber pacemaker) : এ ধরনের পেসমেকারে একটি তার বা লিড থাকে যা জেনারেটর থেকে হৃৎপিন্ডের শুধু ডান অ্যাট্রিয়াম (অলিন্দ) বা ডান ভেন্ট্রিকল (নিলয়)-এ বিদ্যুৎ তরঙ্গ বহন করে।

২. **দ্বি-প্রকোষ্ঠ পেসমেকার** (Dual-chamber pacemaker) : এ ধরনের পেসমেকারে দুটি তার (লিড) থাকে যা জেনারেটর থেকে হৃৎপিন্ডের দুটি প্রকোষ্ঠে অর্থাৎ ডান অ্যাট্রিয়াম ও ডান ভেন্ট্রিকলে বিদ্যুৎ তরঙ্গ বহন করে।

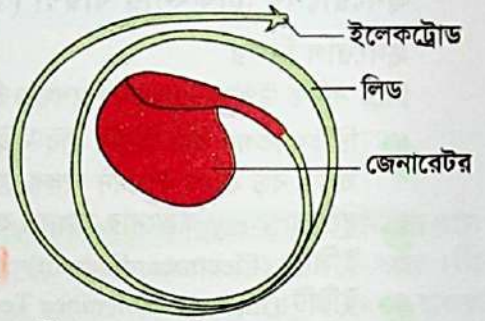

চিত্র ৪.২০ : যান্ত্রিক পেসমেকার

৩. **ত্রি-প্রকোষ্ঠ পেসমেকার** (Triple-chamber pacemaker) : এ ধরনের পেসমেকারে তিনটি তার (লিড) থাকে যার একটি জেনারেটর থেকে ডান অ্যাট্রিয়ামে, আরেকটি ডান ভেন্ট্রিকলে এবং অন্যটি বাম ভেন্ট্রিকলে বিদ্যুৎ তরঙ্গ বহন করে। এটি অত্যন্ত দুর্বল হৃৎপেশির হৃৎপিন্ডে স্থাপন করা হয় (না হলে হার্ট ফেইলিউরের আশঙ্কা থাকে)। পেসমেকার এক্ষেত্রে ভেন্ট্রিকলদুটিকে সংকোচন ক্ষমতার উন্নতি ঘটিয়ে রক্তপ্রবাহে উন্নতি ঘটায়।

পেসমেকার যেভাবে কাজ করে

জেনারেটরের কম্পিউটার-চিপ এবং হৃৎপিন্ডে যুক্ত সেন্সরবাহী তার ব্যক্তির চলন, রক্তের তাপমাত্রা, শ্বসন ও বিভিন্ন শারীরিক কর্মকান্ড মনিটর করে। প্রয়োজনে কর্মকান্ডের ধারা অনুযায়ী হৃৎপিন্ডকে তাল মিলিয়ে চলতে সাহায্য করে। এসব তথ্য কাজে লাগিয়ে পেসমেকার ঠিক করে দেয় কোন ধরনের বিদ্যুৎ তরঙ্গ লাগবে এবং কখন লাগবে। যেমন-পেসমেকার ব্যক্তির ব্যায়াম করার বিষয়টি বুঝতে পেরে হৃৎস্পন্দন বাড়িয়ে দেয়। এসব উপাত্ত পেসমেকারে রক্ষিত থাকে যা দেখে চিকিৎসকেরা পেসমেকারে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে পারেন। কম্পিউটারের সাহায্যেই যেহেতু পেসমেকারের প্রোগ্রামে পরিবর্তন আনা যায় তাই পেসমেকারে ছুরি-কাঁচি চালানোর প্রয়োজন পড়ে না। পেসমেকারের ব্যাটারি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর মেয়াদ থাকে ৫-১০ বছরের মতো।

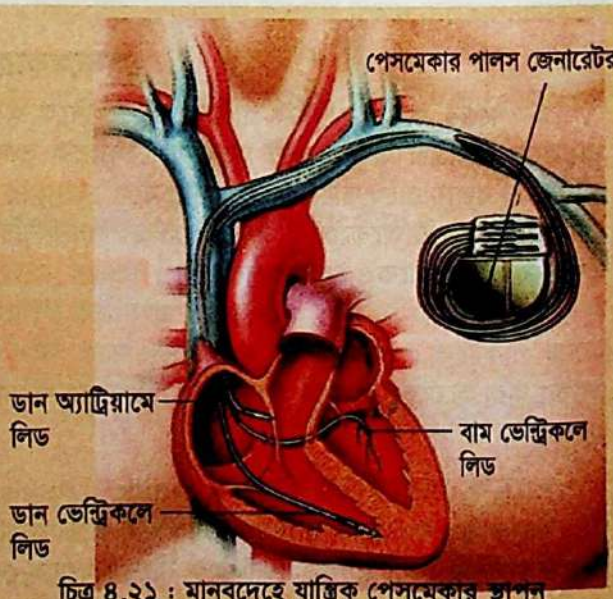

চিত্র ৪.২১ : মানবদেহে যান্ত্রিক পেসমেকার স্থাপন (ত্রি-প্রকোষ্ঠ পেসমেকার)

ওপেন হার্ট সার্জারি (Open Heart Surgery)

শল্যচিকিৎসক যখন রোগীর বুক কেটে উন্মুক্ত করে হৃৎপিন্ডে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেন তখন সে প্রক্রিয়াকে **ওপেন হার্ট সার্জারি** বলে। এটি একটি বড় শল্যচিকিৎসামূলক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে হৃৎপিন্ড সংক্রান্ত অনেক জটিল সমস্যা ও রোগ মুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। অন্য সব চিকিৎসার পরও যদি হৃৎপিন্ডে বড় ধরনের সমস্যা থাকে তাহলে ওপেন হার্ট সার্জারি ছাড়া উপায় থাকে না।

www.Educationblog24.Com

ওপেন হার্ট সার্জারির প্রকারভেদ

ওপেন হার্ট সার্জারি প্রধানত নিচে বর্ণিত তিন উপায়ে করা হয়।

১. **অন-পাম্প সার্জারি** (On-pump surgery) : এ ধরনের সার্জারিতে একটি হৃদ-ফুসফুস মেশিনে যা কার্ডিওপালমোনারি বাইপাস (cardiopulmonary bypass) নামে পরিচিত সেটি ব্যবহার করা হয়। এ যন্ত্রটি সাময়িকভাবে হৃৎপিন্ডের কাজের দায়িত্ব নিয়ে অক্সিজেন-সমৃদ্ধ রক্ত পাম্প করে বিভিন্ন অঙ্গ ও টিস্যুতে প্রেরণ করে। এটি হচ্ছে প্রচলিত পদ্ধতি। এ প্রক্রিয়ায় শল্যচিকিৎসক যখন অস্ত্রোপচার করেন তখন হৃৎপিন্ডে রক্তও থাকে না, হৃৎস্পন্দনও হয় না।

২. **অফ-পাম্প সার্জারি বা বিটিং হার্ট** (Off-pump surgery or beating heart) : এ ধরনের সার্জারিতে হৃদ-ফুসফুস মেশিন ব্যবহৃত হয় না, বরং চিকিৎসক সক্রিয় হৃৎস্পন্দনরত হৃৎপিন্ডেই অস্ত্রোপচার করেন। তবে হৃৎস্পন্দনের হার ওষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোনো উপায়ে সামান্য মন্থর করে রাখা হয়।

৩. **রোবট-সহযোগী সার্জারি** (Robot-assisted surgery) : এ ধরনের সার্জারিতে শল্যচিকিৎসক বিশেষ কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত রোবটিক হাত (যান্ত্রিক হাত)-এর সাহায্যে অস্ত্রোপচার করেন। চিকিৎসক কম্পিউটার সার্জারির ত্রিমাত্রিক দৃশ্য দেখতে পান এবং কাজ সম্পন্ন করেন। এ ধরনের সার্জারি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সঠিক হয়ে থাকে।

ওপেন হার্ট সার্জারি পদ্ধতি

একজন কার্ডিওভাস্কুলার শল্যচিকিৎসকের অধীনে একটি শল্যচিকিৎসক দল ওপেন হার্ট সার্জারির মতো জটিল অস্ত্রোপচার পরিচালনা করেন। সার্জারির শুরুতে চিকিৎসকের নির্দেশে সাধারণ অ্যানেসথেসিয়া (general anesthesia) কিংবা স্নায়ুবন্ধক অ্যানেসথেসিয়া (nerve block anesthesia) প্রয়োগ করা হয়। সার্জারি শুরু হয় বুক ও স্টার্নাম কেটে বড়-সড় গর্ত সৃষ্টির মাধ্যমে। তা না হলে রোগীর ভিতরটা ভালোমতো দেখা যায় না। অন-পাম্প সার্জারি হলে ওষুধ প্রয়োগে হৃৎস্পন্দন বন্ধ করে দিয়ে **হৃদ-ফুসফুস মেশিন** (heart-lung machine)-এর সাহায্যে পাম্প করে সারা দেহে রক্তের সরবরাহ অব্যাহত রাখা হয়। সার্জারি শেষে মেশিন খুলে নেয়া হয়।

অন্যদিকে, করোনারি আর্টারি বাইপাস সার্জারি বা হৃৎকপাটিকা মেরামত বা পুনঃস্থাপন করার সময় সার্জন আর প্রচলিত বড় ধরনের কাটা-ছেঁড়া না করে বুকের মাঝামাঝি ছোট ফুটা করে তার ভিতরে ক্যামেরাযুক্ত যন্ত্র ঢুকিয়ে রোগীর অভ্যন্তরভাগ দেখেন মনিটরে। এ প্রক্রিয়ায় সার্জারি হলে সময় ও ব্যথা উভয়ই কম লাগে, সংক্রমণজনিত জটিলতাও কম হয়। রোগীর ব্যক্তিগত পছন্দ, শনাক্তকরণ, বয়স, অসুখের ইতিহাস, স্বাস্থ্য ঝুঁকি প্রভৃতির উপর এ ধরনের সার্জারি নির্ভর করে।

সাবধানতা

জটিল কার্ডিওভাস্কুলার অসুখে ওপেন হার্ট সার্জারির স্মরণাপন্ন হতে হয়। অন্ততঃ বাংলাদেশে এ সার্জারির খরচ মোটেও কম নয়। সার্জারির পর ভুক্তভোগীকে সবসময় সতর্ক থাকতে হয়। যেমন-হৃৎপিন্ড সুস্থ রাখে এমন আহার গ্রহণ; নিয়মিত ব্যায়াম করা; বয়স-উচ্চতার সঙ্গে মিল রেখে ওজন ঠিক রাখা; চাপ থেকে মুক্ত থাকা; ধূমপানের অভ্যাস থাকলে তা ছেড়ে দেয়া এবং উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টেরল ও ডায়াবেটিস সংক্রান্ত জটিলতা থেকে মুক্ত থাকা।

কাজ : তোমার বাবার বয়স ষাটের উপরে। তাঁর যেন কোন ধরনের হৃদরোগ না হয় সেজন্য তাঁকে কী কী পরামর্শ দেবে?

করোনারি বাইপাস সার্জারি (Coronary Bypass Surgery)

এক বা একাধিক করোনারি ধমনির লুমেন (গহ্বর) রুদ্ধ হয়ে গেলে হৃৎপিণ্ডে রক্ত সরবরাহ অব্যাহত রাখতে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে দেহের অন্য অংশ থেকে (যেমন-পা থেকে) একটি সুস্থ রক্তবাহিকা (ধমনি বা শিরা) কেটে এনে রুদ্ধ ধমনির পাশে স্থাপন করে রক্ত সরবরাহের যে বিকল্প পথ সৃষ্টি করা হয় তাকে **করোনারি বাইপাস** বলে। করোনারি বাইপাস সৃষ্টির সামগ্রিক অস্ত্রোপচার প্রক্রিয়াটিকে **করোনারি বাইপাস সার্জারি** বলা হয়।

করোনারি হৃদরোগ সৃষ্টির প্রধানতম কারণ হচ্ছে করোনারি ধমনির রুদ্ধতা। এর মূল কারণ ধমনির অন্তঃস্থ প্রাচীর ঘিরে ক্রমশ সঞ্চিত হওয়া উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরল জাতীয় হলদে চর্বি পদার্থ। ধমনি প্রাচীরের এন্ডোথেলিয়ামে এগুলো জমা হয়। পরে এসব পদার্থে তন্তু পুঞ্জিভূত হয়ে শক্ত হতে শুরু করে এবং চুনময় পদার্থে পরিণত হয়। এ প্রক্রিয়াকে **আর্টারিওস্ক্লেরোসিস** (arteriosclerosis) বলে। আর পুঞ্জিভূত পদার্থগুলোকে বলে **অ্যাথেরোমেটাস প্লাকস** (atheromatous plaques)। প্লাকসের আধিক্যের কারণে ধমনিপথ সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, রক্তপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় এবং এক সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তখন হৃৎপেশি O_2-সমৃদ্ধ রক্ত না পেলে হার্ট ফেইলিউর, হার্ট অ্যাটাক প্রভৃতি মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি হয়। জীবনের প্রতি হুমকিস্বরূপ এসব জটিলতা এড়াতে O_2-সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপেশিতে সরবরাহ করার বিকল্প পথের সৃষ্টি করতে হয়। বাইপাস সড়কের মতো হৃৎপিন্ডে বাইপাস ধমনি নির্মাণের জটিল প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হতে হয়।

www.Educationblog24.Com

ধূমপান, উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি ও ডায়াবেটিস প্রভৃতি ধমনি গাত্রে প্লাক জমার কাজ ত্বরান্বিত করে। তা ছাড়া, ৪৫ বছরের বেশি বয়সি পুরুষ ও ৫৫ বছরের বেশি বয়সি নারীর ক্ষেত্রে কিংবা পরিবারের ইতিহাসে যদি করোনারি ধমনি সংক্রান্ত ব্যাধির নজির থেকে থাকে তাহলে আরও কম বয়সে করোনারি বাইপাস করার ঝুঁকি দেখা দিতে পারে।

যখন করোনারি ধমনির লুমেন ৫০–৭০% সংকীর্ণ হয় তখন থেকেই O_2–সমৃদ্ধ রক্তের প্রবাহ হৃৎপেশিতে কমে যায়। বুকে ব্যথা অনুভূত হয়। প্লাকের চূড়ায় যদি রক্ত জমাট বাঁধে তাহলে পরিস্থিতি হার্ট অ্যাটাকের দিকে চলে যায়।

ধমনির লুমেন যদি ৯০–৯৯% সংকীর্ণ হয়ে যায় তখন **অস্থির অ্যানজাইনা** (unstable angina) ত্বরান্বিত হয়। এমন অবস্থায় করোনারি বাইপাস কার্যক্রম গ্রহণ করা ছাড়া উপায় থাকে না।

করোনারি বাইপাস একটি জটিল প্রক্রিয়া। রোগ শনাক্তকরণ প্রক্রিয়ায় হৃদচিকিৎসক প্রথমে করোনারি ধমনির রোগের সঠিক অবস্থান, ধরন ও ব্যাপকতা নির্ণয় করেন। পরবর্তী ধাপে রোগীর হৃৎপিন্ড, বয়স, লক্ষণের ব্যাপকতা, অন্যান্য অসুখ-বিসুখের অবস্থা ও জীবনযাত্রা পদ্ধতি বিবেচনা করে হৃদ ও শল্যচিকিৎসক চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবেন। রুদ্ধ করোনারি ধমনিকে এড়িয়ে ভিন্নপথ নির্মাণ করতে বুক, হাত, পা ও তলপেট থেকে ধমনি সংগ্রহ করা হয়। কয়টি করোনারি ধমনি বাইপাস করতে হবে তার উপর নির্ভর করে অস্ত্রোপচারের সময়কাল।

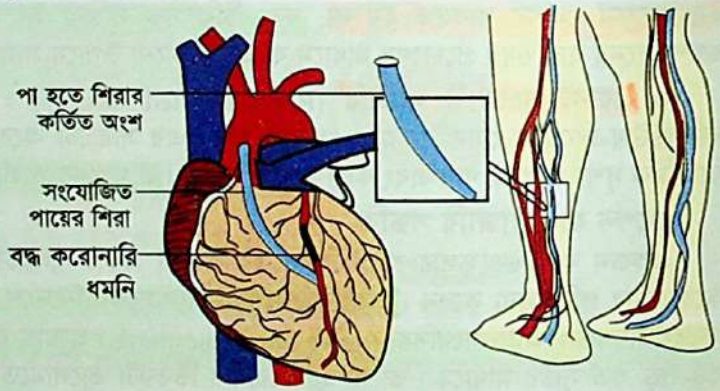

চিত্র ৪.২২ : করোনারি বাইপাস সার্জারি
(বাম পা থেকে শিরা এনে করোনারি ধমনিতে সংযোজন)

সাধারণত ৩-৫ ঘন্টা সময়ের মধ্যে বাইপাস কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে রোগী হাসপাতাল ত্যাগ করতে পারেন। কোন জটিলতা না থাকলে ২ মাসের মধ্যে রোগী সুস্থ হয়ে যান। এরপর থেকে রোগীকে নিয়মিত চেকআপের মধ্যে থাকতে হয়।

বিধিনিষেধ

বাইপাস সার্জারির পর রোগীকে বেশকিছু বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। যেমন– ধূমপান ত্যাগ, কোলেস্টেরলের চিকিৎসা, উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ, নিয়মিত নির্ধারিত ব্যায়াম, স্বাস্থ্যসম্মত ওজন বজায় রাখা, হৃদ-বান্ধব ভোজনে অভ্যস্ত হওয়া, চাপ ও রাগ নিয়ন্ত্রণে আনা, নির্ধারিত ওষুধ সেবন এবং চিকিৎসকের সঙ্গে নিয়মিত দেখা করা।

এনজিওপ্লাস্টি (Angioplasty)

বড় ধরনের অস্ত্রোপচার না করে হৃৎপিন্ডের সংকীর্ণ লুমেন (গহ্বর)-যুক্ত বা রুদ্ধ হয়ে যাওয়া করোনারি ধমনি পুনরায় প্রশস্ত লুমেনযুক্ত বা উন্মুক্ত করার পদ্ধতিকে **এনজিওপ্লাস্টি** (angio = রক্তবাহিকা + plasty = পুনর্নির্মাণ) বলে। এনজিওপ্লাস্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে সরু বা বন্ধ হয়ে যাওয়া লুমেনের ভিতর দিয়ে হৃৎপিন্ডে পর্যাপ্ত O_2 সরবরাহ নিশ্চিত করে হৃৎপিন্ড ও দেহকে সচল রাখা। বুকে ব্যথা (অ্যানজাইনা), হার্ট ফেইলিউর, হার্ট অ্যাটাক প্রভৃতি মারাত্মক রোগ থেকে মুক্তির সহজ উপায় এনজিওপ্লাস্টি। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে জার্মান কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ অ্যানড্রেস গ্রয়েনজিগ (Dr. Andreas Gruentzig) সর্বপ্রথম এ পদ্ধতি প্রয়োগ করেন।

এনজিওপ্লাস্টির প্রকারভেদ

এনজিওপ্লাস্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে প্লাক জমা বা রক্ত জমাটের কারণে সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া বা রুদ্ধ হয়ে যাওয়া করোনারি ধমনির লুমেন (গহ্বর) চওড়া করে O_2-সমৃদ্ধ রক্তের প্রবাহ অক্ষুন্ন রাখা। প্লাকের ধরন ও অবস্থান অনুযায়ী এনজিওপ্লাস্টির ধরনও বিভিন্ন হয়ে থাকে। **এনজিওপ্লাস্টি ৪ ধরনের : বেলুন** এনজিওপ্লাস্টি (Ballon angioplasty), লেজার এনজিওপ্লাস্টি (Laser angioplasty), অ্যাথেরেকটমি (Atherectomy) ও করোনারি স্টেন্টিং (Coronary stenting)।

উল্লিখিত ধরনগুলোর মধ্যে করোনারি স্টেন্টিং এনজিওপ্লাস্টি বর্তমানে বেশি প্রচলিত। নিচে এর বর্ণনা দেয়া হলো।

www.Educationblog24.Com

এনজিওপ্লাস্টি প্রক্রিয়া

এনজিওগ্রাম (angiogram) করে নিশ্চিত হওয়ার পর এ ধরনের সার্জারি করা হয়। এ ধরনের কার্যক্রমে উর্ধ্ববাহু বা পা-এর একটি অংশ কেটে ধমনির ভিতর দিয়ে পাতলা নল বা **ক্যাথেটার** (catheter) প্রবেশ করিয়ে কৌশলে রুদ্ধ বা আংশিক বুজে যাওয়া ধমনিতে পৌছানো হয়। ক্যাথেটারে একটি সরু তার, তারের অগ্রভাগে একটি চুপসানো বেলুন ও বেলুনটির চারদিকে একটি ধাতব তারের জালের চোঙ বসানো থাকে। **জালিকাটিকে স্টেন্ট** (stent) বলে। স্টেন্টটি সাধারণত বিশেষ প্রক্রিয়ায় নির্মিত। এখন অবশ্য অন্যান্য ধাতব বা বিশেষ ধরনের সুতার তৈরি স্টেন্টও ব্যবহৃত হয়।

চিত্র ৪.২৩ : বিভিন্ন ধরনের এনজিওপ্লাস্টি

স্টেন্টসহ বেলুন কাঙ্ক্ষিত জায়গায় পৌছালে বেলুনটি বাইরে থেকে ফোলানো হয়। বেলুনের সাথে সাথে স্টেন্টও স্ফীত হয় এবং প্রতিবন্ধক স্থানে চাপ দিতে থাকে। চাপের ফলে ধমনির গহ্বরের প্রতিবন্ধক স্থানে চর্বিযুক্ত পদার্থও নিষ্পেশিত হয় এবং সংকীর্ণ ধমনিগহ্বর প্রশস্ত হয়। ধমনির ভিতরে তখন রক্ত স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হতে শুরু করে। এর পর স্টেন্টটি ধমনি গহ্বরে রেখে দিয়েই বেলুন সংকুচিত করে বাইরে বের করে আনা হয়। **স্টেন্ট সবসময় ধমনির অন্তঃপ্রাচীরকে বাইরের দিকে চেপে রাখে বলে ধমনির ভিতরে সহজে চর্বিপদার্থ (অ্যাথেরোমা/ব্লক) জমতে পারেনা। স্টেন্টের গায়ে এক ধরনের প্রলেপ লাগানো থাকে যা চর্বি গলিয়ে ধমনিকে পুনরায় সংকীর্ণ হওয়া থেকে রক্ষা করে। সমগ্র প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে ৩০ মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে।**

এনজিওপ্লাস্টির উপকারিতা

করোনারি হৃদরোগের অন্যতম প্রধান রোগ সৃষ্টি হয় করোনারি ধমনিতে। ধমনির ভিতর ব্লক সৃষ্টি হলে পর্যাপ্ত O_2-সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপেশিতে সংবহিত হতে পারে না। ফলে হার্ট ফেইলিউর ও হার্ট অ্যাটাকের মতো মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। এমন মারাত্মক অবস্থা মোকাবিলায় এনজিওপাস্টি কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

এনজিওপ্লাস্টি ধমনির লুমেন থেকে ব্লক অপসারণ বা হ্রাস করতে পারে এবং শ্বাসকষ্ট ও বুকে ব্যথা উপশম হয়। হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা কমিয়ে জীবন রক্ষায় অবদান রাখে। যেহেতু বুক উন্মুক্ত করতে হয় না সেহেতু কষ্ট, সংক্রমণ ও দীর্ঘকালীন সতর্কতার প্রয়োজন পড়ে না। মাত্র এক থেকে কয়েক ঘন্টায় জীবন রক্ষাকারী এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে এবং কয়েক দিন পর থেকেই হালকা কাজকর্ম করা সম্ভব। সুস্থ হতে ৪ সপ্তাহের বেশি লাগে না।

যাঁরা বুকের অসুখে ভুগছেন, কিংবা এনজিওগ্রামের সময় রঞ্জকের প্রতি অ্যালার্জি দেখা দেয় এবং যাঁদের বয়স ৭৫ বছরের বেশি তাঁদের ক্ষেত্রে এনজিওপ্লাস্টি কিছুটা অসুবিধাজনক হতে পারে।

www.Educationblog24.Com

১৭. উদ্দীপকে উল্লিখিত কপাটিকা দুটি বন্ধ থাকে যে ধাপে–
i) অলিন্দের সিস্টোল ii) অলিন্দের ডায়াস্টোল
iii) নিলয়ের সিস্টোল
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ফারিনের হাত আপেল কাটতে গিয়ে কেটে গেল। এর ফলে সেখান থেকে লাল তরল পদার্থ বের হল। এতে এক ধরনের Y আকৃতির জৈব রাসায়নিক পদার্থ আছে যা তার দেহের রোগ প্রতিরোধ করে। [সকল বোর্ড ১৮]
ক. ইন্টারফেরন কী ?
খ. Rh ফ্যাক্টর বলতে কী বোঝ ?
গ. উদ্দীপকের ফারিনের লাল তরল পদার্থ বন্ধ হওয়ার কৌশল ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রোগ প্রতিরোধী উপাদানের কার্যপদ্ধতি বিশেষণ কর।

২. আমাদের হৃৎযন্ত্রটি কিছু কপাটিকা ও নোড এর সাহায্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। [রা.বো. ১৭]
ক. কলামনি কর্ণি কী ?
খ. রক্তচাপ বলতে কী বোঝ ?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কপাটিকাসমূহের বিবরণ দাও।
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণকারী নোডসমূহের কার্যাবলি ব্যাখ্য কর।

৩. মি. মমতাজ স্ফিগমোম্যানোমিটার দ্বারা নিয়মিত রক্তচাপ পরিমাপ করেন। আজ দুপুরে তার রক্তচাপ ছিল ১৭৫/১১০। [ঢা.বো.১৫]
ক. সিস্টোল কী ?
খ. রক্ত তঞ্চন বলতে কী বোঝ ?
গ. মি. মমতাজের দেহে কী ধরনের রক্তচাপ বিদ্যমান ? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. মি. মমতাজের দেহে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি থাকলেও রক্তশূন্যতা সৃষ্টির সম্ভাবনা নেই– বিশ্লেষণ কর।

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

জ্ঞানমূলক

১. রক্ত কী ? [য.বো. ১৬]
২. সিরাম কী ?
৩. হেপারিন কী ? [চ.বো. ১৭]
৪. কাইল কী ?
৫. মিট্রাল ভাল্ব কী ?
৬. রক্ত তঞ্চন কী ?
৭. সিস্টোল কী ?
৮. SAN কী ?
৯. হার্ট বিট কী ? [ঢা.বো. ১৬]
১০. কলামনি কর্ণি কী ? [রা.বো. ১৭]
১১. অ্যানজাইনা কী ?
১২. ইনফ্যার্কশন কী ?
১৩. অ্যারিথমিয়া কী ?
১৪. অ্যানজিওপ্লাস্টি কী ? [কু.বো. ১৭]
১৫. পেসমেকার কী ?
১৬. হিমোস্টেটিক প্লাক কী ?
১৭. হার্টবিট কী ?
১৮. স্ট্রোক কী ?
১৯. থ্রম্বোসাইটের কাজ কী ?
২০. কৈশিকজালিকা কী ?

অনুধাবনমূলক

১. Lub-Dub বলতে কী বোঝায় ?
২. লসিকা ও রক্তের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর।
৩. রক্ত তঞ্চন বলতে কী বোঝায় ?
৪. মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বোঝায় ? [দি.বো. ১৭]
৫. করোনরি রক্ত সংবহন বলতে কী বোঝায় ? [দি.বো. ১৬; চ.বো. ১৭]
৬. সিস্টেমিক ও পালমোনারি সংবহনের পার্থক্য উল্লেখ কর।
৭. রক্তচাপ বলতে কী বোঝায় ? [রা.বো. ১৭]
৮. অ্যানজাইনা বলতে কী বোঝায় ? [ঢা.বো. ১৫]
৯. অ্যানজিওপ্লাস্টি বলতে কী বোঝায় ? [ঢা.বো. ১৭]
১০. প্রাকৃতিক পেসমেকার বলতে কী বোঝায় ?
১১. কীভাবে রক্ত জমাট বাঁধে ?
১২. আগ্র্যানিউলোসাইট বলতে কী বুঝ ?
১৩. হার্ট অ্যাটাক কেন হয় ?
১৪. হার্ট ফেইলিউর ঘটে কেন ?
১৫. তিন ধরনের রক্তকণিকার মধ্যে পার্থক্যগুলো ব্যাখ্যা কর।
১৬. হৃৎপিণ্ডের কোন কপাটিকা কীভাবে কাজ করে তা বুঝিয়ে বল।
১৭. পারকিঞ্জি তন্তু বলতে কী বুঝ ?
১৮. রক্ত ও লসিকার মধ্যে পার্থক্যগুলো বুঝিয়ে লেখ।
১৯. মানুষের সংবহনতন্ত্রকে দ্বিচক্রী সংবহন বলে কেন ?
২০. রুই মাছের হৃৎপিণ্ডের সাথে মানুষের হৃৎপিণ্ডের তুলনা কর।

www.Educationblog24.Com

লাল-সবুজে দাগানো

TEXT BOOK

প্রাণিবিজ্ঞান

উন্মেষ

মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল এডমিশন কেয়ার

www.Educationblog24.Com

৫ মানব শারীরতত্ত্ব : শ্বসন ও শ্বাসক্রিয়া
Human Physiology : Respiration & Breathing

প্রধান শব্দাবলি (Key words)

- অ্যালভিওলাই
- প্লিউরা
- শ্বাসরন্ধ্রক
- ওটিটিস মিডিয়া
- সাইনুসাইটিস
- কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস

অক্সিজেন ছাড়া কোনো প্রাণীই বাঁচতে পারে না। আমাদের দেহেও বায়ুর সাথে অক্সিজেন শ্বসন অঙ্গে প্রবেশ করে এবং তা রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে দেহের সব অঙ্গের টিস্যুকোষে পৌঁছায়। এ অক্সিজেন টিস্যুকোষে সঞ্চিত খাদ্য উপাদানের সাথে বিক্রিয়া করে তাপ ও শক্তি উৎপাদনের মাধ্যমে জীবনকে সচল রাখে। উপজাত হিসেবে তৈরি করে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি। CO_2 রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে শ্বসন অঙ্গের মাধ্যমে দেহের বাইরে বেরিয়ে যায়।

যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জীব পরিবেশ থেকে গৃহীত অক্সিজেন দিয়ে কোষমধ্যস্থ খাদ্যবস্তুকে জারিত করে খাদ্যের স্থিতিশক্তিকে তাপ ও গতিশক্তিরূপে মুক্ত করে এবং উপজাত পদার্থ হিসেবে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি উৎপন্ন করে তাকে **শ্বসন** বলে। এ অধ্যায়ে শ্বসন প্রক্রিয়া এবং এ সংক্রান্ত কয়েকটি সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পিরিয়ড সংখ্যা-১০ : এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে (শিখনফল)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. মানুষের শ্বসনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের গঠনের সাথে কাজের সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে।	● শ্বসনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ ও কাজ
২. ব্যবহারিক : ফুসফুসের অনুচ্ছেদ শনাক্ত ও চিত্র অংকন করতে পারবে।	● ব্যবহারিক ○ ফুসফুসের অনুচ্ছেদের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ
৩. মানুষের প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস কার্যক্রম (ventilation mechanism) ও নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে।	● প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস কার্যক্রম ও নিয়ন্ত্রণ
৪. রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহন (transport) ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● গ্যাসীয় পরিবহন ○ অক্সিজেন ○ কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহন
৫. শ্বসনে রঞ্জকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● শ্বাসরন্ধ্রক ● মানবদেহে রক্ত সংবহনতন্ত্র
৬. শ্বাসনালির রোগ সংক্রমণের কারণ, লক্ষণ এবং প্রতিকার ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● শ্বসননালির সমস্যা, লক্ষণ ও প্রতিকার ○ সাইনুসাইটিস ○ ওটিটিস মিডিয়া
৭. একজন ধুমপায়ী ও একজন অধুমপায়ী মানুষের ফুসফুসের এক্স-রে চিত্রের তুলনা করতে পারবে।	● ফুসফুসের এক্স-রে চিত্রের তুলনা ○ ধুমপায়ী মানুষের ○ অধুমপায়ী মানুষের
৮. প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা হিসেবে মুখ হতে মুখের সাহায্যে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবে।	● কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের উদ্দেশ্য ○ মুখ হতে মুখের সাহায্যে

মানুষের শ্বসনতন্ত্র (Human Respiratory System)

মানুষের শ্বসন অঙ্গ হচ্ছে একজোড়া ফুসফুস (lungs)। যে পথ দিয়ে ফুসফুসে বায়ু প্রবেশ করে এবং ফুসফুস থেকে তা বহির্গত হয় তাকে **শ্বসন পথ** (respiratory passage) বলে। সম্মুখ নাসারন্ধ্র থেকে শ্বসন পথের শুরু। মানুষের শ্বসনতন্ত্রের পর্যায়ক্রমিক বিভিন্ন অংশকে নিচে বর্ণিত তিনটি অঞ্চলে ভাগ করে বর্ণনা করা যায়।

ক. বায়ুগ্রহণ ও ত্যাগ অঞ্চল

১. সম্মুখ নাসারন্ধ্র (Anterior nostrils): নাকের সামনে অবস্থিত পাশাপাশি দুটি ছিদ্রকে সম্মুখ নাসারন্ধ্র বলে। নাক একটি হলেও **ন্যাসাল সেপ্টাম** (nasal septum) বা **নাসা ব্যবধায়ক**-এর মাধ্যমে দুটি নাসারন্ধ্রের বিকাশ ঘটেছে। সম্মুখ নাসারন্ধ্র সবসময় উন্মুক্ত থাকে এবং এ পথেই বায়ু দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

www.Educationblog24.Com

২. **ভেস্টিবিউল** (Vestibule) : নাসারন্ধ্রের পরে নাকের ভিতরের অংশের নাম ভেস্টিবিউল। এর প্রাচীরে অনেক লোম থাকে। লোমগুলো ছাঁকনির মতো গৃহীত বাতাস পরিষ্কারে সহায়তা করে।

৩. **নাসাগহ্বর** (Nasal cavity) : ভেস্টিবিউলের পরের অংশটি নাসাগহ্বর। নাসাগহ্বরের প্রাচীরে সিলিয়াযুক্ত মিউকাস ক্ষরণকারী ও অলফ্যাক্টরী কোষ থাকে। এটি আগত প্রশ্বাস বায়ুকে কিছুটা সিক্ত করে। সিলিয়াযুক্ত ও মিউকাস কোষগুলো ধুলাবালি এবং রোগজীবাণু আটকে দেয়। অলফ্যাক্টরি কোষ ঘ্রাণ উদ্দীপনা গ্রহণে সাহায্য করে।

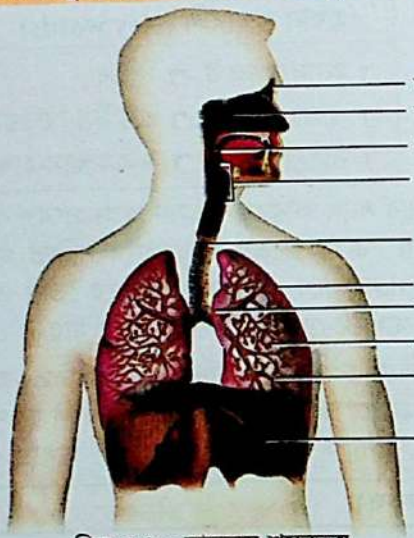

চিত্র ৫.১ : মানুষের শ্বসনতন্ত্র

৪. **পশ্চাৎ নাসারন্ধ্র** (Posterior nostrils) : নাসা গহ্বরদ্বয় যে দুটি ছিদ্রের মাধ্যমে নাসাগলবিলে উন্মুক্ত হয় তাকে **কোয়ানা** (choana) বা পশ্চাৎ নাসারন্ধ্র বলে। এসব ছিদ্রপথে বাতাস নাসাগলবিলে প্রবেশ করে।

৫. **নাসাগলবিল** (Nasopharyx) : পশ্চাৎ নাসারন্ধ্রের পরে নাসাগলবিল অবস্থিত। এর পরেই **মুখ-গলবিল** (oropharynx), যা স্বরযন্ত্র পর্যন্ত বিস্তৃত।

৬. **স্বরযন্ত্র** (Larynx) : এটি নাসাগলবিলের নিচের অংশের ঠিক সামনের দিকের অংশ এবং কয়েকটি তরুণাস্থি টুকরায় গঠিত। এগুলোর মধ্যে থাইরয়েড তরুণাস্থি সবচেয়ে বড় এবং এটি গলার সামনে উঁচু হয়ে ওঠে (পুরুষে)। হাত দিলে এর অবস্থান বোঝা যায় এবং বাইরে থেকে দেখা যায়। একে Adam's Apple বলে। স্বরযন্ত্রের উপরে থাকে একটি ছোট **এপিগ্লটিস** (epiglottis)। স্বরযন্ত্রে অনেক পেশি যুক্ত থাকে। এর অভ্যন্তরভাগে থাকে মিউকাস আবরণী ও **স্বররজ্জু** (vocal cord)। পেশির সংকোচন–প্রসারণই স্বররজ্জুর টান (tension) বা শ্লথন (relaxation) নিয়ন্ত্রণ করে। টানটান অবস্থায় বাতাসের সাহায্যে স্বররজ্জু কম্পিত হয়ে শব্দ সৃষ্টি করে। এপিগ্লটিস খাদ্য গলাধঃকরণের সময় স্বরযন্ত্রের মুখটি বন্ধ করে দেয়। ফলে খাদ্য স্বরযন্ত্রে প্রবেশ করতে পারে না, অন্য সময় এটি শ্বসনের উদ্দেশে উন্মুক্ত থাকে। স্বরযন্ত্রে স্বর সৃষ্টি হয়।

খ. বায়ু পরিবহন অঞ্চল

৭. **শ্বাসনালি বা ট্রাকিয়া** (Trachea) : স্বরযন্ত্রের পর থেকে পঞ্চম বক্ষদেশীয় কশেরুকা পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় ১২ সেমি. দীর্ঘ ও ২ সেমি. ব্যাসবিশিষ্ট ফাঁপা নলাকার অংশকে ট্রাকিয়া বলে। এটি ১৬–২০টি তরুণাস্থি নির্মিত অর্ধবলয়ে (C–আকৃতির) গঠিত। তন্তুময় টিস্যু দিয়ে অর্ধবলয়গুলো আটকানো থাকে। ট্রাকিয়ার অন্তঃপ্রাচীরে সিলিয়াযুক্ত মিউকাস আবরণী রয়েছে। ট্রাকিয়া চুপসে যায় না বলে সহজে এর মধ্য দিয়ে বায়ু চলাচল করতে পারে। এর অন্তঃপ্রাচীরের সিলিয়া অবাঞ্ছিত বস্তুর প্রবেশ রোধ করে।

৮. **ব্রঙ্কাস** (Bronchus) : বক্ষগহ্বরে ট্রাকিয়ার শেষ প্রান্ত দুটি (ডান ও বাম) শাখায় বিভক্ত হয়; এদের নাম **ব্রঙ্কাই** (bronchi –বহুবচন)। এগুলো ফুসফুসের **হাইলাম** (hilum) দিয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে। ডান ব্রঙ্কাসটি অপেক্ষাকৃত ছোট কিন্তু প্রশস্ত এবং তিনভাগে ভাগ হয়ে ডান ফুসফুসের তিনটি খণ্ডে প্রবেশ করে। বাম ব্রঙ্কাসটি দুভাগে ভাগ হয়ে বাম ফুসফুসের দুটি খন্ডে প্রবেশ করে। ফুসফুসের অভ্যন্তরে প্রতিটি **ব্রঙ্কাস** পুনঃপুনঃ বিভক্ত হয়ে অসংখ্য ক্ষুদ্রাকায় **ব্রঙ্কিওল** (bronchiole) গঠন করে। ব্রঙ্কিওল দুধরনের– **প্রান্তীয় ব্রঙ্কিওল** ও **শ্বসন ব্রঙ্কিওল**। ব্রঙ্কাসে তরুণাস্থি থাকলেও ব্রঙ্কিওলগুলো তরুণাস্থিবিহীন।

গ. শ্বসন অঞ্চল

৯. **ফুসফুস** (Lungs) : ফুসফুস সংখ্যায় দুটি এবং হালকা গোলাপী রঙের স্পঞ্জের মতো নরম অঙ্গ। বাম ফুসফুসটি আকারে ছোট, ওজনে ৫৬৫ গ্রাম, দুই লোব বিশিষ্ট এবং ডান ফুসফুস আকারে বড়, ওজনে ৬২৫ গ্রাম, তিন লোব বিশিষ্ট। ফুসফুস **দ্বিস্তরী প্লিউরাল পর্দা** (pleural membrane) দিয়ে আবৃত থাকে। ভিতরের পর্দাকে **ভিসেরাল প্লিউরা** এবং বাইরের পর্দাকে **প্যারাইটাল প্লিউরা** বলে। দুই স্তরের মাঝে প্লিউরাল গহ্বরে **প্লিউরালরস** নামক এক ধরনের রস থাকে। ব্রঙ্কাস যে অংশে ফুসফুসে প্রবেশ করে তাকে **হাইলাম** (hilum) বলে। হাইলামের মাধ্যমে ধমনি ফুসফুসে প্রবেশ

www.Educationblog24.Com

এবং শিরা ও লসিকা নালি বেরিয়ে আসে। ব্রঙ্কাস, ধমনি, শিরা, লসিকা নালি, ঘন যোজক টিস্যুতে পরিবেষ্টিত হয়ে **পালমোনারি মূল** (pulmonary root) গঠন করে এবং এর সাহায্যেই ফুসফুস ঝুলে থাকে। ফুসফুসের প্রতিটি লোব কয়েকটি **সেগমেন্ট** (bronchopulmonary segments)-এ বিভক্ত। ডান ফুসফুসে ১০টি এবং বাম ফুসফুসে ৮টি সেগমেন্ট থাকে। প্রত্যেকটি সেগমেন্ট আবার অসংখ্য **লোবিওল** (lobule)-এ বিভক্ত। লোবিওলগুলো ফুসফুসের কার্যকরী একক। ফুসফুসে রক্ত সংবহনতন্ত্র এবং পরিবেশের মধ্যে O_2 ও CO_2 এর বিনিময় ঘটে।

১০. ব্রঙ্কিয়াল বা শ্বসন বৃক্ষ (Bronchial or Respiratory tree) : ট্রাকিয়ার দ্বিবিভাজনে সৃষ্ট যে ব্রঙ্কাস ডান ও বাম ফুসফুসে প্রবেশ করে তাকে **প্রাইমারি ব্রঙ্কাস** বলে। প্রাইমারি ব্রঙ্কাস বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক লোবের জন্য একটি করে **সেকেন্ডারি ব্রঙ্কাস বা লোবার ব্রঙ্কাস** (lobar bronchus) গঠন করে (ডান ফুসফুসে ৩টি এবং বাম ফুসফুসে ২টি)। সেকেন্ডারি ব্রঙ্কাস থেকে টার্সিয়ারী ব্রঙ্কাস বা **সেগমেন্টাল ব্রঙ্কাস** সৃষ্টি হয়ে একটি করে পালমোনারি সেগমেন্টে প্রবেশ করে। সেগমেন্টাল ব্রঙ্কাস বার বার বিভক্ত হয়ে যে সূক্ষ্ম নালির সৃষ্টি হয় সেগুলোকে **ব্রঙ্কিওল** (bronchiole) বলে যা এক একটি লোবিওলে প্রবেশ করে। সমগ্র বায়ুনালি সিস্টেমকে দেখতে একটি উল্টানো বৃক্ষের মতো দেখায় বলে একে সাধারণভাবে **শ্বসন বৃক্ষও** বলে।

চিত্র ৫.২ : ব্রঙ্কিওলের প্রান্তীয় অংশ যাতে রক্ত সরবরাহসহ অ্যালভিওলাই দৃশ্যমান

ব্রঙ্কাস প্রাচীরে তরুণাস্থি (cartilage) থাকে, ব্রঙ্কিওলে থাকেনা। ব্রঙ্কিওল ব্রঙ্কাসের চেয়ে বেশি মসৃণ পেশি ধারণ করে, তবে ব্রঙ্কাস এবং ব্রঙ্কিওল উভয়ে সিলিয়াসম্পন্ন স্তম্বাকার এপিথেলিয়াম (columner epithelium)-এ আবৃত। প্রতিটি লোবিওলে ব্রঙ্কিওল বিভক্ত হয়ে প্রান্তীয় ব্রঙ্কিওল, শ্বসন ব্রঙ্কিওল, অ্যালভিওলার নালি, অ্যাট্রিয়াম, অ্যালভিওলার থলি এবং সর্বশেষে **অ্যালভিওলাস** (alveolus, pl.-alveoli) সৃষ্টি করে। অ্যালভিওলার নালি এবং অ্যালভিওলাই সরল আঁইশাকার এপিথেলিয়াম (squamous epithelium) দিয়ে আবৃত।

অ্যালভিওলাস-এর গঠন

অ্যালভিওলাস ফুসফুসের কার্যকরী একক। এগুলো আঙ্গুরের থোকার মতো গুচ্ছাবদ্ধ, অতি ক্ষুদ্রাকায়, বুদবুদ সদৃশ বায়ুথলি এবং গ্যাস বিনিময়ের তল (gas cxchange surface) গঠন করে। ফুসফুসে অ্যালভিওলাসের সংখ্যা বয়সের সাথে সম্পর্কিত। নবজাতক শিশুর ফুসফুসে মাত্র ২০ মিলিয়ন অ্যালভিওলাই থাকে, ৮ বছরে এ সংখ্যা ৩০০ মিলিয়ন; অন্যদিকে একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষের দুটি ফুসফুসে থাকে প্রায় ৭০০ মিলিয়ন অ্যালভিওলাই এবং এগুলো প্রায় ১১,৮০০ বর্গ সেন্টিমিটার শ্বসনতল সৃষ্টি করে। অ্যালভিওলাসের ব্যাস ২০০–৩০০ মাইক্রোমিটার এবং প্রাচীর মাত্র ০৪ মাইক্রোমিটার পুরু। এগুলোর বাইরের দিকে প্রচুর কৈশিকজালিকা নিবিড়ভাবে অবস্থান করে। পালমোনারি ধমনি থেকে এগুলোর উৎপত্তি হয় এবং পুনরায় মিলে পালমোনারি শিরা গঠন করে। প্রত্যেক অ্যালভিওলাসের প্রাচীর অত্যন্ত পাতলা, চাপা স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াল কোষে গঠিত হওয়ায় সহজেই গ্যাসের ব্যাপন ঘটতে পারে। অ্যালভিওলাস প্রাচীর ফ্যাগোসাইটিক অ্যালভিওলার ম্যাক্রোফেজ ধারণ করে। ম্যাক্রোফেজ অণুজীব এবং অন্যান্য বহিরাগত

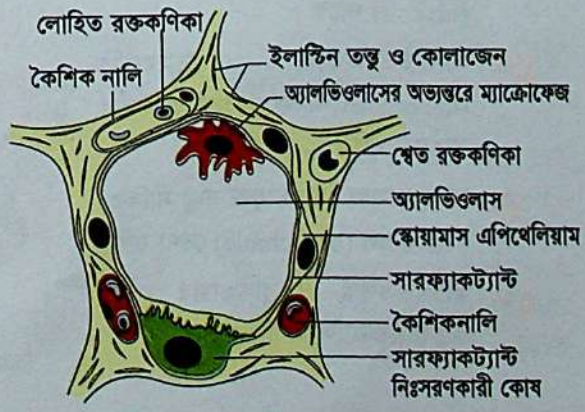

চিত্র ৫.৩ : অ্যালভিওলাসের গঠন

www.Educationblog24.Com

কণা ধ্বংস করে। তাছাড়া প্রাচীরে কোলাজেন ও স্থিতিস্থাপক তন্তু থাকে। এ স্থিতিস্থাপক সূত্রের কারণে প্রশ্বাস-নিঃশ্বাসের সময় অ্যালভিওলাস সহজেই প্রসারিত হতে পারে,আবার পূর্বাবস্থায় ফিরেও আসতে পারে।

অ্যালভিওলাস প্রাচীরে **সেপ্টাল কোষ** নামক কিছু বিশেষ কোষ থাকে যা প্রাচীরের ভিতরের দিকে **সারফ্যাকট্যান্ট** (surfactant; dipalmitoyl lecithin) নামক **ডিটারজেন্ট** (detergent)-এর অনুরূপ ফসফোলিপিড রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে। সারফ্যাকট্যান্ট সারফেস টেনসন হ্রাস করে অ্যালভিওলাসকে চুপসে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। সারফ্যাকট্যান্টবিহীন অ্যালভিওলাস তথা ফুসফুস যথাযথ কাজ করতে পারে না। ২৩ সপ্তাহ বয়স্ক মানবভ্রূণে সর্বপ্রথম সারফ্যাকট্যান্ট ক্ষরণ শুরু হয়। এ কারণে ২৪ সপ্তাহের আগে মানবভ্রূণকে স্বাধীন অস্তিত্বের অধিকারী গণ্য করা হয় না। অনেক দেশে তাই এ সময়কাল পর্যন্ত গর্ভপাতের অনুমতি দেয়া হয়।

শ্বসনতন্ত্রের কাজ

১. **শ্বসন গ্যাসের বিনিময়** : শ্বসনের সময় পরিবেশের O_2 রক্তে মিশে এবং রক্ত থেকে CO_2 পরিবেশে পরিত্যক্ত হয়।

২. **শক্তি উৎপাদন** : শ্বসনতন্ত্রের মাধ্যমে গৃহিত O_2 কোষীয় শ্বসনে ব্যবহৃত হয়ে শক্তি উৎপন্ন করে।

৩. **পানি সাম্য** : নিঃশ্বাসের মাধ্যমে প্রতিদিন প্রায় ৪০০–৬০০ মিলিলিটার পানি দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। এতে দেহের পানি সাম্য বজায় রাখতে সুবিধা হয়।

৪. **তাপ নিয়ন্ত্রণ** : নিঃশ্বাসের সময় CO_2 এর সাথে দেহের কিছু তাপ নির্গত হয়ে দেহের তাপমাত্রা বজায় থাকে।

৫. **এসিড ও ক্ষারের সাম্যতা** : নিঃশ্বাস বায়ুর মাধ্যমে CO_2 দেহের বাইরে পরিত্যক্ত হওয়ায় pH নিয়ন্ত্রণে সহায়তা হয়।

৬. **শব্দ উৎপন্ন** : ল্যারিংক্সের মাধ্যমে শব্দ উৎপন্ন হয়।

৭. **হোমিওস্টিসিস** : দেহাভ্যন্তরের স্থিতাবস্থা বা হোমিওস্টেটিস (homeostasis; কোন জীব কর্তৃক অবিরত তার অন্তঃস্থ পডরবেশ রক্ষা করা বা জীবন ক্রিয়ায় অভ্যন্তরীণ স্থিতাবস্থা বজায় রাখা। এর ফলে পরিবর্তিত পরিবেশেও জীবকোষগুলো দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে।

৮. **উদ্বায়ী গ্যাস** : দেহ থেকে কিছু উদ্বায়ী গ্যাস, যেমন-ক্লোরোফর্ম, ইথার, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি নিষ্কাশন করে।

৯. **দূষিত পদার্থের প্রবেশ রোধ** : শ্বসনতন্ত্র বাতাসে বিদ্যমান জীবাণু ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ প্রবেশ রোধ করে।

ব্যবহারিক

ফুসফুসের অনুচ্ছেদ (Section through Lung)

শনাক্তকরণ

১. অনুচ্ছেদের অভ্যন্তরভাগে বুদবুদ-এর মতো অসংখ্য **অ্যালভিওলাই** (alveoli) থাকে।

২. অ্যালভিওলাইগুলো **ট্র্যাবেকুলি** (trabeculae) নামক ব্যবধায়ক পর্দার মাধ্যমে পৃথক।

৩. অসংখ্য সূক্ষ্ম সিলিয়াযুক্ত বায়ু নালিকা বা **ব্রঙ্কিওল** (bronchiole) দেখা যায়।

৪. অ্যালভিওলাই ও ব্রঙ্কিওলের ফাঁকে ফাঁকে রক্তনালি অবস্থিত।

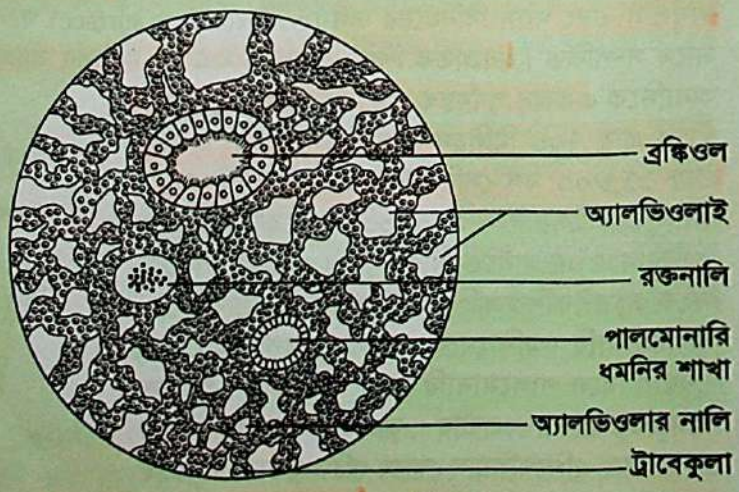

চিত্র ৫.৪ : ফুসফুসের অনুচ্ছেদ (অংশ বিশেষ)

www.Educationblog24.Com

শ্বসনের শারীরবৃত্ত (Physiology of Respiration)

পরিবেশ থেকে গৃহীত O_2 দিয়ে কোষমধ্যস্থ খাদ্য (গ্লুকোজ) জারিত করে শক্তি উৎপাদন শেষে CO_2 পরিবেশে ফিরিয়ে দেয়ার জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার নাম **শ্বসন**। এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া ও মানবদেহে নিরন্তর চলমান প্রক্রিয়া। নিচে বর্ণিত দুটি পর্যায়ের মাধ্যমে সমগ্র প্রক্রিয়াটি সম্পাদিত হয়।

১. বহিঃশ্বসন (External respiration) : এটি ভৌত রাসায়নিক প্রক্রিয়া যা ফুসফুসে সংঘটিত হয়। এ প্রক্রিয়ায় এনজাইমের কোন ভূমিকা নেই এবং কোন শক্তিও উৎপন্ন হয় না। ফুসফুসের অ্যালভিওলাইয়ে প্রশ্বাসের মাধ্যমে গৃহীত O_2 এবং দেহকোষ থেকে উৎপন্ন এবং রক্তবাহিত CO_2 গ্যাসের বিনিময় ঘটে।

২. অন্তঃশ্বসন (Internal respiration) : এটি জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়া যা দেহকোষ ও রক্তে সংঘটিত হয়। এখানে এনজাইমের ভূমিকা ব্যাপক এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়। ফুসফুস কর্তৃক বায়ুমণ্ডল থেকে গৃহীত O_2 রক্ত দ্বারা বাহিত হয়ে দেহকোষে পৌঁছায় যেখানে গ্লুকোজ জারিত হয়ে শক্তি উৎপন্ন করে। উপজাত বস্তু হিসেবে নির্গত CO_2 রক্ত দ্বারা পরিবাহিত হয়ে ফুসফুসে পৌঁছায়।

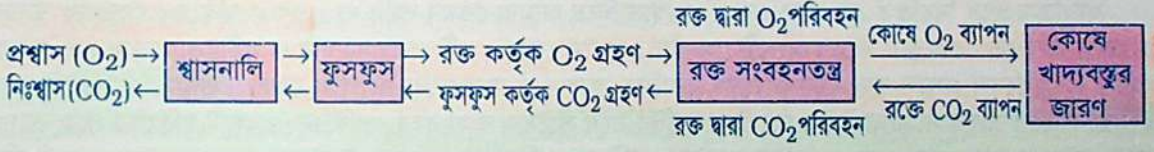

নিচে প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস কার্যক্রম এবং গ্যাসীয় পরিবহন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়া হলো।

প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস কার্যক্রম (Ventilation Mechanism)

যে প্রক্রিয়ায় ফুসফুসে অক্সিজেন-সমৃদ্ধ বায়ু প্রবেশ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড-সমৃদ্ধ বায়ু ফুসফুস থেকে বের হয়ে যায় তাকে **শ্বাসক্রিয়া** (breathing) বলে। প্রকৃতপক্ষে এটি বহিঃশ্বসন প্রক্রিয়া। বক্ষগহ্বরের আয়তন হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে ফুসফুসের আয়তন সঙ্কোচন-প্রসারণের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। দুধরনের পেশির ক্রিয়ায় বক্ষগহ্বরের আয়তনের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে : (১) বক্ষ ও উদর গহ্বরের মাঝে অবস্থিত **মধ্যচ্ছদা বা ডায়াফ্রাম** (diaphragm) এবং (২) পর্শুকাসমূহের (ribs) ফাঁকে অবস্থিত **ইন্টারকোস্টাল পেশি** (intercostal muscle)। শ্বাসক্রিয়া দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়, যথা: (ক) **প্রশ্বাস** বা শ্বাসগ্রহণ এবং (খ) **নিঃশ্বাস** বা শ্বাসত্যাগ।

ক. প্রশ্বাস বা শ্বাসগ্রহণ (Inspiration) : ডায়াফ্রাম-পেশি সংকুচিত হলে এর কেন্দ্রীয় **টেনডন** (tendon) নিম্নমুখে সঞ্চালিত হয়। ফলে বক্ষগহ্বরের অনুদৈর্ঘ্য ব্যাস বেড়ে যায়। একই সময় নিম্নভাগের **পর্শুকাগুলো** (ribs) কিছুটা উপরে উঠে আসায় বক্ষগহ্বরের পার্শ্বীয় এবং অগ্র-পশ্চাৎ ব্যাসও বেড়ে যায়। **ইন্টারকোস্টাল** (intercostal) পেশির সংকোচনের ফলে পর্শুকার দেহ (shaft) উত্তোলিত হয়। এতে স্টার্নাম উপরে উঠে সামনে সঞ্চালিত হয়। ফলে বক্ষের অগ্র-পশ্চাৎ ব্যাসসহ অনুপ্রস্থ ব্যাস বৃদ্ধি পায়।

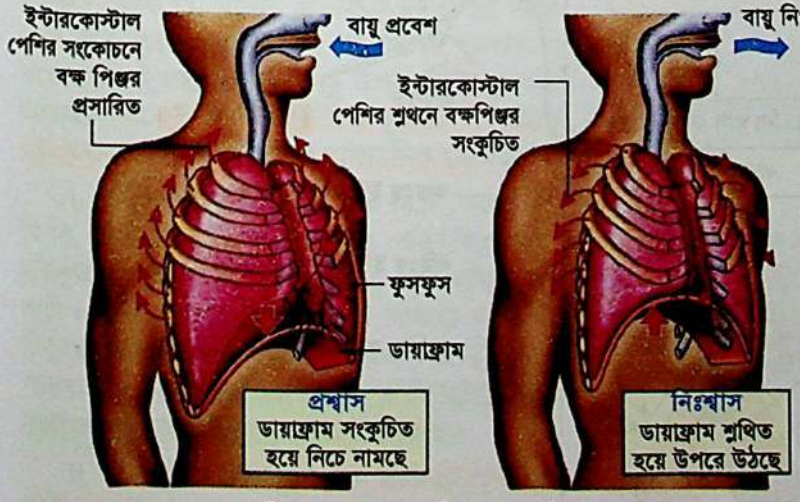

চিত্র ৫.৫ : প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস কার্যক্রম

এভাবে ডায়াফ্রাম ও পর্শুকা পেশির সংকোচনের ফলে বক্ষীয় গহ্বর সবদিকে বেড়ে যায়। এ কারণে ফুসফুস প্রসারিত হয়ে এর ভিতরের আয়তনও বাড়িয়ে দেয়। প্রসারিত ফুসফুসের অভ্যন্তরীণ চাপ বাতাসের সাধারণ চাপ অপেক্ষা কম হওয়ায় নাসিকা পথের ভিতর দিয়ে আসা বাতাস ফুসফুসে প্রবেশ করে।

পরিবেশ থেকে O_2-সমৃদ্ধ বায়ু নাসারন্ধ্র পথে ট্রাকিয়া→ব্রঙ্কাস→ব্রঙ্কিওল→অ্যালভিওলাই তথা ফুসফুসে প্রবেশ।

www.Educationblog24.Com

খ. নিঃশ্বাস বা শ্বাসত্যাগ (Expiration) : এটি প্রশ্বাসের পর পরই সংঘটিত একটি নিষ্ক্রিয় প্রক্রিয়া। প্রশ্বাসে অংশগ্রহণকারী পেশিগুলোর প্রসারণ বা শিথিলতার জন্য নিঃশ্বাস ঘটে।

নিঃশ্বাসের সময় প্রশ্বাসকালে অংশগ্রহণকারী পেশিগুলো স্থিতিস্থাপকতার জন্য পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। তখন পর্শুকাগুলো নিজস্ব ওজনের জন্য নিম্নগামী হয়; উদরীয় পেশিগুলোর চাপে ডায়াফ্রাম ধনুকের মতো বেঁকে বক্ষগহ্বরের আয়তন কমিয়ে দেয়; ফুসফুসীয় পেশি পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়; এবং প্লিউরার অন্তঃস্থ চাপ ও ফুসফুসের বায়ুর চাপ বেড়ে যায়। বাতাস তখন ফুসফুস থেকে নাসিকা পথে বেরিয়ে গেলে ফুসফুসের আয়তনও কমে যায়।

ফুসফুসে CO_2-সমৃদ্ধ বায়ু→অ্যালভিওলাই→ব্রঙ্কিওল→ব্রঙ্কাস→নাসাপথ→নাসারন্ধ্র পথে বাইরে নিষ্কাশন।

শ্বসন একটি ছন্দময় প্রক্রিয়া। পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষে বিশ্রামকালে এ প্রক্রিয়া প্রতিমিনিটে ১৪–১৮ বার এবং নবজাত শিশুতে ৪০ বার সংঘটিত হয়। তবে ব্যায়াম বা অন্য কারণে শ্বসনের হার দ্রুত হয় বলে উদরীয় পেশিও তখন শ্বসন কাজে যোগ দেয়।

প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস নিয়ন্ত্রণ (Regulation of Respiration)

স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় বলে প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস নিয়ে আমরা তেমন ভাবি না। পশ্চাৎ মস্তিষ্কের মেডুলায় শ্বসনের এ কেন্দ্র অবস্থিত। কেন্দ্রের নিচের অংশটি (অংকীয়) **প্রশ্বাস কেন্দ্র**। এটি প্রশ্বাসের হার ও গভীরতা বাড়ায়। এ কেন্দ্রের পৃষ্ঠীয় ও পার্শ্বদেশ প্রশ্বাস বন্ধ করে নিঃশ্বাস ত্বরান্বিত করে। এ অংশগুলো **নিঃশ্বাস কেন্দ্র**। প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস কেন্দ্র ইন্টারকোস্টাল স্নায়ুর সাহায্যে ইন্টারকোস্টাল পেশির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে। ব্রঙ্কিওল ও ব্রঙ্কাই মস্তিষ্কের সঙ্গে ভ্যাগাস স্নায়ুর মাধ্যমে যুক্ত। ডায়াফ্রাম ও ইন্টারকোস্টাল পেশিতে প্রেরিত ছন্দময় স্নায়ু-উদ্দীপনার ফলে এসব অংশে শ্বসনিক আন্দোলন সংঘটিত হয়।

প্রশ্বাসের কারণে ফুসফুস ফুলে উঠে, ব্রঙ্কিওলে অবস্থিত রিসেপ্টরগুলো সটান হয়, ফলে তা উদ্দীপ্ত হয়ে ভ্যাগাস স্নায়ুর মাধ্যমে আরও বেশি স্নায়ু উদ্দীপনা নিঃশ্বাস কেন্দ্রে প্রেরণ করে। তখন প্রশ্বাস কেন্দ্র ও প্রশ্বাস সাময়িক বন্ধ থাকে। বহিঃস্থ ইন্টারকোস্টাল পেশি তখন শিথিল হয়, ফুসফুসের টিস্যু চুপসে যায়, ফলে নিঃশ্বাস ঘটে। এরপর ব্রঙ্কিওলগুলো

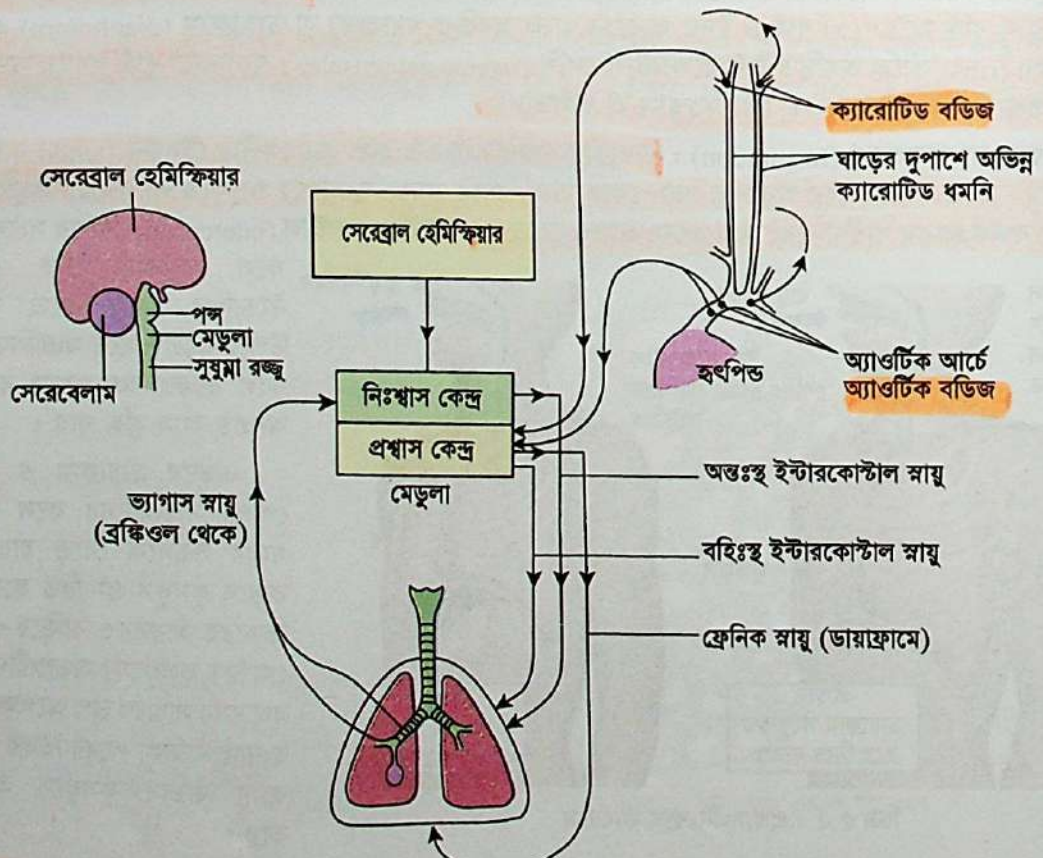

চিত্র ৫.৬ : প্রশ্বাস-নিঃশ্বাসের স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণ

www.Educationblog24.Com

সটান থাকে না, রিসেপ্টরগুলো উদ্দীপ্ত থাকে না। প্রশ্বাস কেন্দ্র তখন সক্রিয় হয়ে যায় এবং আবার প্রশ্বাস শুরু হয়। এভাবে সম্পূর্ণ চক্রটি আজীবন ছন্দায়িত পুনরাবৃত্ত হয়।

শ্বসনের মৌলিক ছন্দ নিয়ন্ত্রণ করে মেডুলা। এখানে সরবরাহকৃত সমস্ত স্নায়ু কেটে ফেললেও ছন্দ অব্যাহত থাকে। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় বিভিন্ন উদ্দীপনা এ মৌলিক ছন্দের হেরফের ঘটাতে পারে। প্রধান যে উদ্দীপনা প্রশ্বাস-নিঃশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করে তা হচ্ছে রক্তে O_2 এর চেয়ে CO_2 এর ঘনত্ব। CO_2-এর লেভেল বেড়ে গেলে (যেমন–ব্যায়ামের সময়) রক্ত সংবহনতন্ত্রের ক্যারোটিড ও অ্যাওর্টিক বডিজ (carotid and aortic bodies)-এ অবস্থিত কেমোরিসেপ্টর উদ্দীপ্ত হয়ে প্রশ্বাস কেন্দ্রে স্নায়ু-উদ্দীপনা প্রেরণ করে। প্রশ্বাস কেন্দ্র তখন ইন্টারকোস্টাল ও ফ্রেনিক স্নায়ুর মাধ্যমে বহিঃইন্টারকোস্টাল পেশি ও ডায়াফ্রামে স্নায়ু-উদ্দীপনা প্রেরণ করে এদের সংকোচনের গতি বাড়িয়ে দেয়। এতে প্রশ্বাসের হার বেড়ে যায়। সুযোগ পেলে CO_2 দেহে দ্রুত ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। দেহে দ্রবীভূত হয়ে যে এসিড উৎপন্ন করে তা এনজাইম ও বিভিন্ন প্রোটিন বিনাশ শুরু করে। বাতাসে CO_2 ঘনত্ব ০.২৫% বাড়লে শ্বসনের হার দ্বিগুণ হয়ে যায়।

অন্যদিকে, বাতাসে যদি O_2 ঘনত্ব ২০% থেকে ৫% এ নেমে আসে তাহলেও শ্বসনের হার দ্বিগুণ হয়ে যায়। O_2-এর ঘনত্বও শ্বসন হারে প্রভাব ফেলে। তবে স্বাভাবিক পরিবেশে প্রচুর O_2 থাকে বলে প্রভাবও পড়ে কম। O_2 ঘনত্বের প্রতি সংবেদী কেমোরিসেপ্টরগুলো মেডুলা এবং অ্যাওর্টিক ও ক্যারোটিড বডিজে অবস্থান করে (এসব বডি CO_2 রিসেপ্টর হিসেবেও কাজ করে)।

সীমিত মাত্রায় শ্বসনের (প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস) হার ও গভীরতাকে ঐচ্ছিক নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। যেমন- বাতাস বুকের ভিতর টেনে নিয়ে ধরে রাখা যায়। ঐচ্ছিক নিয়ন্ত্রণ সজোর শ্বসন, বক্তৃতা করা, গান গাওয়া, হাঁচি ও কাশি দেওয়ার জন্যেও হতে পারে। নিয়ন্ত্রণ একবার প্রয়োগ হয়ে গেলে মস্তিষ্কের সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ারে যে স্নায়ু উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় তা শ্বসন কেন্দ্রে পৌঁছে নির্দেশ কার্যকর করে।

সটান (stretch) রিসেপ্টর ও কেমোরিসেপ্টরের মাধ্যমে প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ একটি নেতিবাচক প্রতিফল (negative feedback)। কিন্তু নেতিবাচক প্রতিফল সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ারের ঐচ্ছিক ক্রিয়ায় বাতিল হয়ে যেতে পারে।

গ্যাসীয় (O_2 ও CO_2) পরিবহন (Transport of Gases)

ফুসফুস গহ্বরের ভিতরে অ্যালভিওলাই-এর বাতাস এবং এগুলোর প্রাচীরে অবস্থিত কৈশিকনালির রক্তের মধ্যে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিনিময় ঘটে।

ক. অক্সিজেন পরিবহন

প্রশ্বাসের মাধ্যমে আগত বাতাস ফুসফুসে পৌঁছালে ফুসফুসের অ্যালভিওলাইয়ে O_2-এর চাপ থাকে ১০৭ mmHg। অন্যদিকে, ফুসফুসের কৈশিকজালিকায় দেহ থেকে আগত রক্তে O_2-চাপ থাকে ৪০ mmHg। সুতরাং ফুসফুস থেকে O_2 ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ফুসফুসীয় ঝিল্লি ভেদ করে রক্তে প্রবেশ করে। এই ব্যাপন যতক্ষণ না রক্তে O_2-এর চাপ 100 mmHg উপনীত হয় ততক্ষণ অব্যাহত থাকে। রক্তে অক্সিজেন দুভাবে পরিবাহিত হয়: যথা- ভৌত দ্রবণরূপে ও রাসায়নিক যৌগরূপে।

i. ভৌত দ্রবণরূপে : প্রতি ১০০ মি.লি. রক্তে ০.২ মি.লি. অক্সিজেন ভৌত দ্রবণরূপে পরিবাহিত হয়। দ্রবীভূত অংশই রক্তে ১০০ mmHg চাপ সৃষ্টির জন্য দায়ী। তবে অংশের পরিমাণ খুব সামান্য বলে তা টিস্যুকোষে অক্সিজেন সরবরাহ কাজে বিশেষ ভূমিকা পালন করে না। তবে অক্সিজেন ও হিমোগ্লোবিনের সংযোজন কাজে এর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

ii. রাসায়নিক যৌগরূপে : O_2 রক্তে প্রবেশের পর লোহিত কণিকায় অবস্থিত হিমোগ্লোবিনের সাথে যুক্ত হয়ে অক্সি-হিমোগ্লোবিন গঠন করে। এটি একধরনের

চিত্র ৫.৭ : অ্যালভিওলাসের মাধ্যমে গ্যাসীয় বিনিময়

www.Educationblog24.Com

শিথিল রাসায়নিক যৌগ, যা অক্সিজেনের চাপ কমে গেলে পুনরায় বিযুক্ত হয়। এ সংযোজন রক্তে অক্সিজেনের দ্রবীভূত অংশের চাপের উপর নির্ভরশীল। এ চাপ যত বাড়ে হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনের সাথে তত বেশি সংযুক্ত হয়।

$Hb_4 + 4O_2 \rightleftharpoons 4HbO_2$ [Hb = হিমোগ্লোবিন]

খ. কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহন

শর্করা জারণের সময় কোষে CO_2 সৃষ্টি হয়। এই CO_2 দেহের জন্য ক্ষতিকর। কোষ থেকে CO_2 রক্তে পরিবাহিত হয়ে ফুসফুসে পৌঁছায় এবং ফুসফুস থেকে বায়ুতে মুক্ত হয়। নিচে বর্ণিত তিনটি ভিন্ন পদ্ধতিতে CO_2 রক্তে পরিবাহিত হয়।

i. **ভৌত দ্রবণরূপে :** কিছু পরিমাণ (৫%) CO_2 রক্তরসের পানির সাথে বিক্রিয়া করে কার্বনিক এসিড গঠন করে।

$H_2O + CO_2 \rightarrow H_2CO_3$ (কার্বনিক এসিড)

এ বিক্রিয়ায় **কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ** এনজাইম প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

প্রতি হাজার CO_2 অণুর মধ্যে মাত্র এক অণু H_2CO_3 রূপে দ্রবণে উপস্থিত থাকে। সুতরাং CO_2-এর খুব সামান্য অংশই H_2CO_3 রূপে পরিবাহিত হয়।

ii. **কার্বামিনো যৌগরূপে :** টিস্যুকোষ থেকে রক্তের প্লাজমায় আগত CO_2 -এর কিছু অংশ লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে। লোহিত কণিকার মধ্যে যে হিমোগ্লোবিন থাকে তার **গ্লোবিন** (প্রোটিন) অংশের অ্যামিনো গ্রুপের-(NH_2) সাথে CO_2 যুক্ত হয়ে **কার্বামিনোহিমোগ্লোবিন** যৌগ গঠন করে।

$$CO_2 + HbNH_2 \rightarrow HbN\begin{matrix} H \\ COOH \end{matrix} = HbNHCOOH \text{ (কার্বামিনোহিমোগ্লোবিন)}$$

CO_2-এর একাংশ প্লাজমা প্রোটিনের সাথে সরাসরি যুক্ত হয়ে কার্বামিনোপ্রোটিন গঠন করে।

$PrNH_2 + CO_2 \rightarrow PrNHCOOH$ (কার্বামিনোপ্রোটিন)

এ রাসায়নিক ক্রিয়া এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ে অতি দ্রুত সম্পন্ন হয়।

মোট CO_2-এর শতকরা ২৭ ভাগ কার্বামিনো যৌগরূপে পরিবাহিত হয়। প্রতি ১০০ মি.লি. রক্তে এর পরিমাণ ৩ মি.লি. যার ২ মি.লি কার্বামিনো-হিমোগ্লোবিনরূপে এবং ১ মি.লি কার্বামিনো-প্রোটিনরূপে পরিবাহিত হয়।

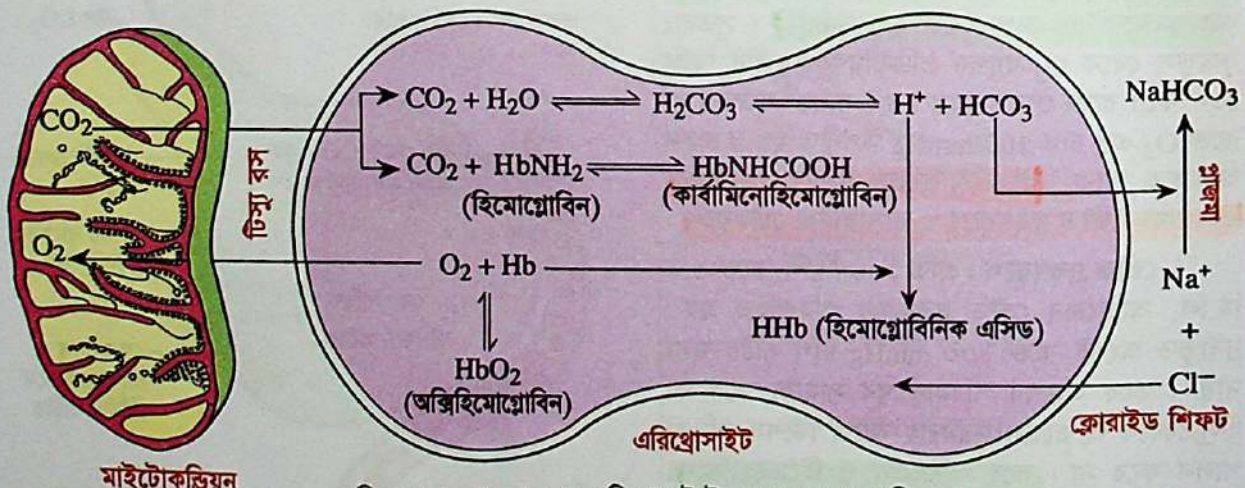

চিত্র ৫.৮ : প্লাজমা এবং এরিথ্রোসাইটের মাধ্যমে **CO_2** পরিবহন

iii. **বাইকার্বোনেট যৌগরূপে :** CO_2-এর বেশির ভাগই (৬৫%) রক্তে বাইকার্বোনেটরূপে পরিবাহিত হয়। এটি– (১) $NaHCO_3$– রূপে প্লাজমার মাধ্যমে এবং (২) $KHCO_3$ –রূপে লোহিত কণিকার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।

www.Educationblog24.Com

টিস্যুরস থেকে CO_2 প্রথমে প্লাজমায় ও পরে লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে। কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ এনজাইমের উপস্থিতিতে লোহিত কণিকার মধ্যে CO_2 পানির সাথে বিক্রিয়া করে কার্বনিক এসিড (H_2CO_3) উৎপন্ন করে। রক্তরসে কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ অনুপস্থিত থাকায় রক্তরসে খুব কম মাত্রায় কার্বনিক এসিড উৎপন্ন হয়।

$$CO_2 + H_2O \xrightarrow{\text{কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ}} \underset{\text{কার্বনিক এসিড}}{H_2CO_3} \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$$

লোহিত কণিকায় উৎপন্ন H_2CO_3 বিশ্লিষ্ট হয়ে H^+ ও HCO_3^- আয়নে পরিণত হয়। লোহিত কণিকায় বেশি মাত্রায় HCO_3^- সঞ্চিত হওয়ায় এর ঘনত্ব প্লাজমার তুলনায় বেশি হয়।

আয়ন লোহিত কণিকা থেকে প্লাজমায় পরিব্যাপ্ত (diffuse) হয় এবং প্লাজমার Na^+ আয়নের সাথে মিলে $NaHCO_3$ উৎপন্ন করে। লোহিত কণিকার মধ্যে K^+ আয়নের সাথে HCO_3^- বিক্রিয়া করে $KHCO_3$ এ পরিণত হয়।

লোহিত কণিকা থেকে প্লাজমায় HCO_3^- আয়ন আগমনের সাথে সমতা রেখে প্লাজমা থেকে Cl^- লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে এবং লোহিত কণিকায় K^+ আয়নের সাথে যুক্ত হয়ে KCl গঠন করে। লোহিত কণিকা থেকে HCO_3 আয়ন বেরিয়ে আসায় ঋণাত্মক আয়নের যে ঘাটতি হয় প্লাজমার ক্লোরাইড (Cl^-) আয়ন লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে সে ঘাটতি পূরণ করে। একে **ক্লোরাইড শিফট** (chloride shift) বলে। এর প্রথম বর্ণনাকারী জার্মান শারীরবৃত্তবিদ **হার্টগ জ্যাকব হ্যামবার্গার** (Hartog Jacob Hamburger)-এর নাম অনুসারে ক্লোরাইড শিফটকে **হ্যামবার্গার শিফট**ও বলা হয়।

বহিঃশ্বসন ও অন্তঃশ্বসনের পার্থক্য

বৈশিষ্ট্য	বহিঃশ্বসন	অন্তঃশ্বসন
১. প্রকৃতি	একটি ভৌত রাসায়নিক প্রক্রিয়া।	একটি জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া।
২. ক্রিয়াস্থল	ফুসফুসে সংঘটিত হয়।	কোষ ও রক্তে সংঘটিত হয়।
৩. এনজাইমের ভূমিকা	এনজাইমের কোনো ভূমিকা নেই।	এতে এনজাইমের ভূমিকা ব্যাপক।
৪. প্রধান উপ-পর্যায়	শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাস ত্যাগ।	গ্লাইকোলাইসিস, ক্রেবস চক্র ও গ্যাস পরিবহন।
৫. শক্তি	কোনো শক্তি উৎপন্ন হয় না।	নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়।

শ্বসনে শ্বাসরঞ্জকের ভূমিকা (Role of Respiratory Pigments during Respiration)

হিমোগ্লোবিন হচ্ছে মেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্তের লোহিত কণিকায় এবং অনেক অমেরুদণ্ডী প্রাণীর প্লাজমায় বিস্তৃত লাল বর্ণের প্রোটিনধর্মী অক্সিজেনবাহী শ্বাসরঞ্জক। লোহিত রক্তকণিকার প্রধান প্রোটিন হচ্ছে হিমোগ্লোবিন। এর বর্ণের জন্যই লোহিত কণিকা লাল দেখায় এবং লোহিত কণিকার সংখ্যাধিক্যের কারণে রক্ত লাল দেখায়। হিমোগ্লোবিন শ্বসন গ্যাস অক্সিজেন পরিবহনে প্রধান ভূমিকা পালন করে, কিছু পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইডও বহন করে। চারটি একক নিয়ে গঠিত হিমোগ্লোবিন একটি গোল অণু। এর প্রতিটি একক পলিপেপটাইড জাতীয় প্রোটিন **গ্লোবিন** (globin) এবং লৌহগঠিত **হিম** (heme) নিয়ে গঠিত। রক্তে হিম ও গ্লোবিন ১ঃ২৫ অনুপাতে উপস্থিত থাকে। হিমের ৩৩.৩৩% লৌহ (Fe)। পূর্ণবয়স্ক মানুষের সমগ্র রক্তে মাত্র ৪-৫ গ্রাম লৌহ থাকে।

i. **অক্সিজেন পরিবহন :** শ্বসনের সময় অক্সিজেন ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ফুসফুস থেকে রক্তে প্রবেশ করে। রক্তে প্রবিষ্ট সমস্ত অক্সিজেনই মুক্ত অবস্থায় থাকে না। এর এক বড় অংশ লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিনের সাথে যুক্ত হয়ে **অক্সিহিমোগ্লোবিন** (oxyhaemoglobin) নামে অস্থায়ী যৌগ গঠন করে। এ যৌগ গঠন রক্তরসে (প্লাজমায়) অক্সিজেনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। রক্তরসে যত বেশি অক্সিজেন দ্রবীভূত হবে তার সাথে সংগতি রেখে অক্সিহিমোগ্লোবিন যৌগ উৎপন্ন হবে। অন্যদিকে, অক্সিজেনের পরিমাণ যে হারে কমে যাবে যৌগ সে হারে ভেঙে যাবে এবং অক্সিজেন মুক্ত হয়ে রক্তরসে প্রবেশ করবে। প্রতিটি হিমোগ্লোবিন চারটি হিম অংশ থাকায় এর চারটি ফেরাস অণু চার অণু অক্সিজেন যুক্ত করতে পারে।

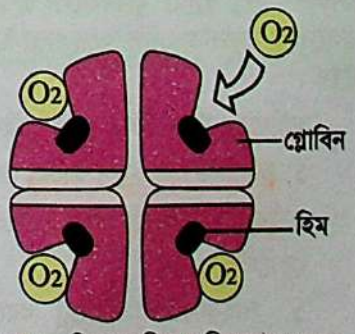

চিত্র ৫.৯ : হিমোগ্লোবিনে অক্সিজেন সংবন্ধন

www.Educationblog24.Com

ii. **কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহন :** CO_2 হিমোগ্লোবিনের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বামিনো হিমোগ্লোবিন নামক অস্থায়ী যৌগ গঠন করে। কার্বামিনো হিমোগ্লোবিন-সমৃদ্ধ রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে হৃৎপিন্ড হয়ে পরিশোধনের জন্য ফুসফুসে গমন করে।

দেহে রক্ত পরিবহনের সময় বেশ কিছু পরিমাণ অক্সিজেন ব্যাপন প্রক্রিয়ায় রক্তরস থেকে স্বল্প অক্সিজেনযুক্ত টিস্যুরসে চলে যায়। ফলে রক্তরসে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায়। হিমোগ্লোবিন তখন তার সাথে যুক্ত অক্সিজেন ছড়াতে শুরু করে। এভাবে অক্সিজেন প্রথমে রক্তরসে ও পরে টিস্যুরসে চলে যায়।

শ্বসননালির সমস্যা, লক্ষণ ও প্রতিকার
(Problems, Symptoms and Remedy of Respiratory Tract Disease)

সচল মানবদেহের জন্য সুস্থ অঙ্গতন্ত্র প্রয়োজন। বিভিন্ন অঙ্গতন্ত্রের মধ্যে শ্বসনতন্ত্রের শ্বসননালি অন্যতম প্রধান অঙ্গ। কিন্তু এটি প্রায়ই ভাইরাসে, মাঝে-মধ্যে ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে সচল দেহকে প্রায় আধা-অচল করে দেয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা শ্বসননালির সংক্রমণকে দুভাগে ভাগ করে থাকেন। (১) **উর্ধ্ব শ্বসননালিতে সংক্রমণ** (ফলে নাক, কান, গলা, সাইনাস আক্রান্ত হয়) এবং (২) **নিম্ন শ্বসননালিতে সংক্রমণ** (ফলে শ্বাসনালি ও ফুসফুস আক্রান্ত হয়)। উর্ধ্ব শ্বসননালিতে সংক্রমণের উদাহরণ হিসেবে সিলেবাসভুক্ত **সাইনুসাইটিস** ও **ওটাইটিস মিডিয়া** সৃষ্ট সমস্যা, লক্ষণ ও প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

সাইনুসাইটিস (Sinusitis)

মাথার খুলিতে মুখমন্ডলীয় অংশে নাসাগহ্বরের দুপাশে অবস্থিত বায়ুপূর্ণ চারজোড়া বিশেষ গহ্বরকে **সাইনাস বা প্যারান্যাসাল সাইনাস** (paranasal sinus) বলে। এগুলো হলো–

১. **ম্যাক্সিলারি সাইনাস** (Maxillary sinus) : ম্যাক্সিলারি অঞ্চলে গালে অবস্থিত।
২. **ফ্রন্টাল সাইনাস** (Frontal sinus) : চোখের উপরে অবস্থিত।
৩. **এথময়েড সাইনাস** (Ethmoid sinus) : দু'চোখের মাঝখানে অবস্থিত।
৪. **স্ফেনয়েড সাইনাস** (Sphenoid sinus) : এথময়েড সাইনাসের পেছনে অবস্থিত।

সাইনাস সাধারণত বায়ুপূর্ণ মিউকাস পর্দায় আবৃত এবং ক্ষুদ্র নালির মাধ্যমে নাসাগহ্বর তথা শ্বাসনালির সাথে যুক্ত থাকে। এসব সাইনাস যদি বাতাসের বদলে তরল পদার্থে পূর্ণ থাকে এবং এই তরল যদি ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাকে সংক্রমিত হয় তখন সাইনাসের মিউকাস পর্দায় প্রদাহের সৃষ্টি হয়। **ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাকের সংক্রমণে বা এলার্জিজনিত কারণে সাইনাসের মিউকাস পর্দায় যে প্রদাহের সৃষ্টি হয় তাকেই সাইনুসাইটিস বলে।** সাইনুসাইটিসের কারণে মাথা ব্যথা, মুখমন্ডলে ব্যথা, নাক দিয়ে ঘন হলদে বা সবুজাভ তরল ঝরে পড়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়।

চিত্র ৫.১০ : সাইনুসাইটিস

স্থায়িত্বের উপর ভিত্তি করে সাইনুসাইটিস দুরকম :

১. **অ্যাকিউট সাইনুসাইটিস** (Acute sinusitis) : এর স্থায়িত্ব ৪ – ৮ সপ্তাহ।
২. **ক্রনিক সাইনুসাইটিস** (Chronic sinusitis) : এর স্থায়িত্ব ২ মাসের বেশি সময়।

রোগের কারণ

১. সাইনাসগুলো বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস (Human respiratory syncytial virus, Parainflueza virus, Metapneumo virus), ব্যাকটেরিয়া (*Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae*) এবং কিছু ক্ষেত্রে ছত্রাকে আক্রান্ত হলে সাইনুসাইটিস হতে পারে।

www.Educationblog24.Com

২. ঠাণ্ডাজনিত কারণে; অ্যালার্জিজনিত কারণে; ব্যবধায়ক পর্দার অস্বাভাবিকতায় সাইনাস গহ্বর অবরুদ্ধ হয়ে; নাকে পলিপ (polyp) সৃষ্টি হলে; নাসাগহ্বরের মিউকোসা স্ফীতির ফলে নাসাপথ সরু হয়ে ক্রনিক সাইনুসাইটিস হতে পারে।
৩. দাঁতের ইনফেকশন থেকে বা দাঁত তুলতে গিয়েও সাইনাসে সংক্রমণ হতে পারে।
৪. যারা হাঁপানির সমস্যায় ভোগে তাদের দীর্ঘস্থায়ী সাইনুসাইটিস দেখা যায়।
৫. সাধারণত ঘরের পোকামাকড়, ধুলাবালি, পেস্ট, তেলাপোকা ইত্যাদি যেসব অ্যালার্জেন ধারণ করে তার প্রভাবে এ রোগের সংক্রমণ দেখা দিতে পারে।
৬. ইউস্টেশিয়ান নালির (eustachian tube) সামান্য অস্বাভাবিকতায় সাইনাস গহ্বর অবরুদ্ধ হয়ে এবং সংক্রমণের ফলে সাইনুসাইটিস হতে পারে।
৭. নাকের হাড় বাঁকা থাকলে অথবা মুখগহ্বরের টনসিল বড় হলে এ রোগ হতে পারে।
৮. সিস্টিক ফাইব্রোসিস এর কারণে এ রোগ হয়।
৯. অপুষ্টি, পরিবেশ দূষণ ও ঠান্ডা স্যাঁতসেঁতে পরিবেশের কারণেও এ রোগ হতে পারে।

রোগের লক্ষণ

১. নাক থেকে হলদে বা সবুজ বর্ণের ঘন তরল বের হয়। এতে পুঁজ বা রক্ত থাকতে পারে।
২. দীর্ঘ ও বিরক্তিকর তীব্র মাথা ব্যথা লেগেই থাকে যা সাইনাসের বিভিন্ন অঞ্চলে হতে পারে।
৩. মাথা নাড়াচাড়া করলে, হাঁটলে বা মাথা নিচু করলে ব্যথার তীব্রতা আরো বেড়ে যায়।
৪. জ্বর জ্বর ভাব থাকে, কোন কিছু ভালো লাগে না বরং অল্পতেই ক্লান্ত লাগে।
৫. নাক বন্ধ থাকে, নিঃশ্বাসের সময় নাক দিয়ে বাজে গন্ধ বের হয়।
৬. মুখমন্ডল অনুভূতিহীন মনে হয়।
৭. মাথাব্যথার সাথে দাঁত ব্যথাও হতে পারে।
৮. কাশি হয়, রাতে কাশির তীব্রতা বাড়ে, গলা ভেঙ্গে যায়।

জটিলতা

সাইনুসাইটিস সংক্রান্ত জটিলতা কেবল নাসিকাগহ্বর ঘিরেই অবস্থান করে না, বরং সাইনাসগুলোর অবস্থান চোখ ও মস্তিষ্কের মতো অত্যন্ত সংবেদনশীল অঙ্গের সংলগ্ন হওয়ায় জীবাণুর সংক্রমণ শুধু সাইনাসেই সীমাবদ্ধ না থেকে রক্তবাহিত হয়ে চোখ ও মস্তিষ্কে পৌছালে মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টি হয়। মস্তিষ্কে সংক্রমণের ফলে মাথাব্যথা, দৃষ্টিহীনতা থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। চোখে সংক্রমণের ফলে পেরিঅরবিটাল ও অরবিটাল সেলুলাইটিসসহ আরও অনেক জটিলতা দেখা দিতে পারে।

প্রতিকার

স্বেচ্ছাসতর্কতা : সাইনাসে জমাট বেঁধে থাকা তরলকে বিগলিত করে সাইনাসকে চাপমুক্ত ও স্বাভাবিক রাখতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে।

(১) গরম পানিতে ভিজিয়ে, চিপড়ে একখন্ড কাপড় প্রতিদিন বারবার মুখমন্ডলে চেপে ধরা; (২) মিউকাস তরল করতে প্রচুর পানি পান করা; (৩) প্রতিদিন ২-৪ বার নাক দিয়ে বাষ্প টেনে নেওয়া; (৪) দিনে কয়েকবার ন্যাসাল স্যালাইন স্প্রে করা; (৫) আর্দ্রতা প্রতিরোধক ব্যবহার করা; (৬) যন্ত্রের সাহায্যে নাকের ভিতর সবেগে পানি প্রবাহিত করে সাইনাস পরিষ্কার রাখা; (৭) বন্ধ নাক খোলার জন্য ন্যাসাল স্প্রে ব্যবহারে সতর্ক থাকা [প্রথম দিকে ন্যাসাল স্প্রে ভালো কাজ করলেও ৩-৫ দিন একনাগাড়ে ব্যবহার করলে অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে]; (৮) নাক বন্ধ অবস্থায় উড়োজাহাজে না চড়াই ভালো; এবং (৯) মাথা নিচু করে শরীর বাঁকানো অনুচিত।

ওষুধ প্রয়োগ : অ্যাকিউট সাইনুসাইটিসের চিকিৎসায় ওষুধের দরকার হয় না। তবে প্রয়োজনে দু'সপ্তাহের চিকিৎসা চলতে পারে। ক্রনিক সাইনুসাইটিসের চিকিৎসা চলে ৩-৪ সপ্তাহ। ছত্রাকজনিত সাইনুসাইটিসের চিকিৎসায় বিশেষ ধরনের ওষুধ ব্যবহৃত হয়। অ্যান্টিবায়োটিকসহ সমস্ত ঔষধ ব্যবহারে চিকিৎসকের পরামর্শ ও প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী হতে হবে।

কোনো শিশু যদি নাক দিয়ে তরল-নির্গমনসহ ২-৩ সপ্তাহ ধরে কাশিতে, ১০২.২° এ জ্বরে, মাথাব্যথা ও প্রচন্ড চোখফোলা অসুখে ভোগে তাহলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নির্দেশে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োগ শুরু করতে হবে।

www.Educationblog24.Com

ওটিটিস মিডিয়া (Otitis media) — মধ্যকর্ণের সংক্রমণ

কানের ভিতরে বা বাইরে যে কোন অংশে সংক্রমণজনিত প্রদাহকে **ওটিটিস** (otitis) বলে। কানের মধ্যকর্ণে সংক্রমণজনিত প্রদাহকে বলা হয় **ওটিটিস মিডিয়া** (otitis media / middle ear infection)। গলবিলের সাথে মধ্যকর্ণের সংযোগ স্থাপনকারী **ইউস্টেশিয়ান নালি** (eustachian tube) টি অধিকাংশ সময়ই বন্ধ থাকে, শুধু ঢোকগেলার সময় খোলা থাকে। কোনো কারণে কোনো জীবাণু এ নালি দিয়ে এসে মধ্যকর্ণে প্রদাহ সৃষ্টি করলে তাকে **ওটিটিস মিডিয়া** বলে। বয়স্কদের তুলনায় শিশুরা এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়।

শিশুদের ওটিটিস মিডিয়া তিন ধরনের হয়ে থাকে। যথা–

১. **স্বল্পস্থায়ী বা অ্যাকিউট ওটিটিস মিডিয়া :** এক্ষেত্রে ইউস্টেশিয়ান নালির প্রতিবন্ধকতার কারণে উর্ধ্ব শ্বাসনালি আক্রান্ত হয় এবং মধ্যকর্ণ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমিত হয়। দু থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে এ রোগ নিরাময় হয়।

২. **দীর্ঘস্থায়ী বা ক্রনিক ওটিটিস মিডিয়া :** এক্ষেত্রে দু থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে রোগ নিরাময় হয় না। রোগ দীর্ঘস্থায়ী হয়। এ রোগে কানের পর্দা ছিদ্র হয়ে পুঁজ বা তরল পদার্থ বেরিয়ে আসে। শ্রবণে ব্যাঘাত ঘটে।

৩. **অ্যাডহেসিভ ওটিটিস মিডিয়া :** এক্ষেত্রে কানের পর্দা মধ্যকর্ণের কোনো স্থানে বা অস্থির সাথে আটকে যায়। ফলে রোগী বধির হয়ে যায়।

রোগের কারণ

১. প্রধানত ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া কিংবা ছত্রাকের সংক্রমণে এ রোগ হয়। Respiratory syncytial virus (RSV), Influenza virus, Rhinovirus এবং *Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis* ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঘটলে।
২. মধ্যকর্ণের সাথে নাকের সংযোগস্থল (eustachian tube) ফুলে বন্ধ হয়ে গেলে।
৩. কোন কারণে অ্যাডিনয়েড (adenoids) ফুলে গেলে।
৪. মাতৃদুগ্ধ পান না করালে বা কম করালে।
৫. শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকার কারণে ঠান্ডা লাগলে এবং কানের সংক্রমণ হলে।

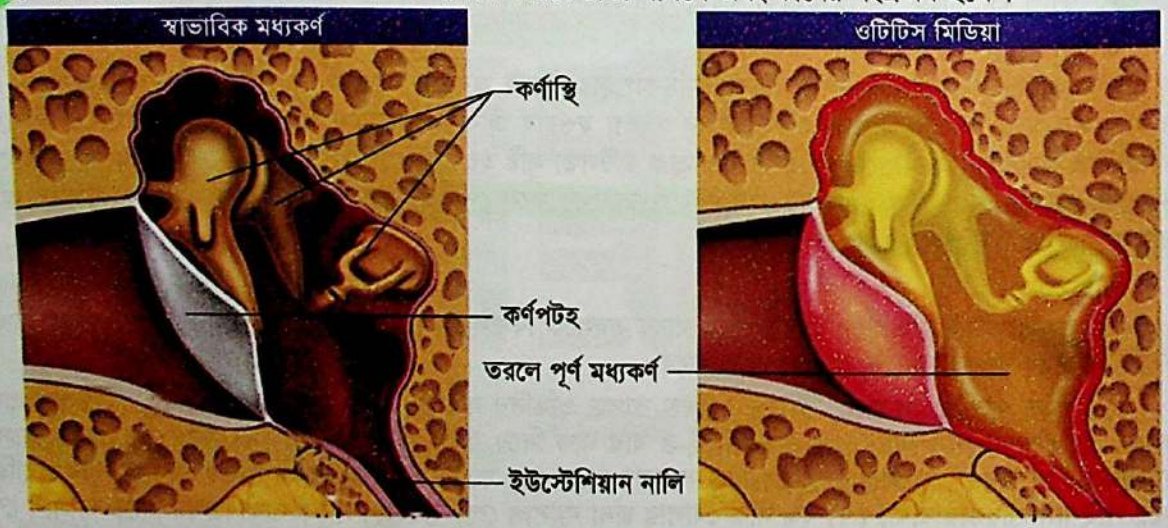

চিত্র ৫.১১ : ওটিটিস মিডিয়া

ওটিটিস মিডিয়া কাদের বেশি হয়

যাদের ওটিটিস মিডিয়া হওয়ার ঝুঁকি বেশি রয়েছে তারা হলো–

১. চার মাস থেকে চার বছর বয়সি শিশুদের।
২. ডে কেয়ার সেন্টারগুলোর মতো জায়গাতে যেখানে একসাথে অনেক শিশু বেড়ে উঠে সেসব শিশুদের।
৩. যেসব শিশুদের নিচু অবস্থানে শুইয়ে বোতলে দুধ খাওয়ানো হয়।
৪. যেসব শিশুরা ধুমপানযুক্ত ও বায়ু দূষণপূর্ণ এলাকায় বাস করে।
৫. পরিবারের অন্য কারো কানে সংক্রমণ হলে শিশুদেরও কানের সংক্রমণ হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

www.Educationblog24.Com

রোগের লক্ষণ

শিশুদের ক্ষেত্রে

১. কানে ব্যথা হয় এবং কান টানতে থাকে।
২. মাথা ব্যথা হয় ফলে অতিরিক্ত কান্নাকাটি করে।
৩. দেহে বেশি তাপসহ (104°F) জ্বর থাকে তাই ঘুমাতে পারে না।
৪. নাক দিয়ে পানি ঝরে, কান থেকে দুর্গন্ধযুক্ত তরল পদার্থ বের হয়।

বয়স্কদের ক্ষেত্রে

১. কানে ব্যথা হয়, কানে চাপ অনুভূত হয় এবং কান ভোঁ ভোঁ করে।
২. মাথা ঝিম ঝিম করে এবং প্রচন্ড মাথা ব্যথা হয়।
৩. কাশি হয় ও নাক দিয়ে পানি ঝরে।
৪. কানে কম শোনে, খাবারে রুচি থাকে না।

ওটিটিস মিডিয়ার জটিলতা

১. কানের পর্দা বা টিমপেনিক পর্দায় ছিদ্র হয়।
২. ছিদ্রপথে মধ্যকর্ণ থেকে গাঢ় তরল পদার্থ গড়িয়ে পড়ে।
৩. কানে কম শোনে।
৪. কানে কম শোনার কারণে শিশুরা সহজে কথা বলা শিখতে পারেনা।

উপদেশ

i. অপ্রয়োজনে কান চুলকানো এড়িয়ে চলা।
ii. গোসলের পূর্বে তুলা তেলে ভিজিয়ে কানে দিয়ে গোসল করা।
iii. ঠান্ডা না নাগানো।
iv. সাতার না কাটা।
v. কান পরিস্কার রাখা।
vi. কানে পানি ঢুকতে না দেয়া।

প্রতিরোধ (Prevention)

১. শিশুর আশেপাশে ধুমপান না করা। কারণ ধুমপায়ীদের শিশুরা ঠান্ডা ও কানের সংক্রমণে বেশি ভুগে থাকে।
২. কানের সংক্রমণ প্রতিরোধে জন্মের পর শিশুকে অন্তত প্রথম ছয়মাস বুকের দুধ খেতে দেয়া। বুকের দুধে রয়েছে রোগ প্রতিরোধক উপাদান। তা ছাড়া ধারণা করা হয় মায়ের দুধে এমন কোনো উপাদান রয়েছে যা পান করার সময় গলার উপর দিকের মিউকাস পর্দা বা ঝিল্লিতে আটকে থাকা ব্যাকটেরিয়াকে নিচের দিকে পাকস্থলিতে নিয়ে আসে। ফলে ব্যাকটেরিয়া উপর দিকে ইউস্টেশিয়ান নালিতে প্রবেশের সুযোগ পায় না।
৩. বুকের দুধ বা অন্য কোনো তরল খাওয়ানোর সময় শিশুর মাথাটি পিঠের সঙ্গে ৪৫ ডিগ্রি কোণে উঁচুতে রাখতে হবে। তা না হলে তরল খাবার ইউস্টেশিয়ান নালি হয়ে কানে ঢুকে সংক্রমণ সৃষ্টি করে।
৪. অ্যালার্জি সৃষ্টি করে এমন কিছু এড়িয়ে চলা। কারণ অ্যালার্জিজনিত প্রতিক্রিয়ার কারণে ইউস্টেশিয়ান নালি বন্ধ হয়ে সংক্রমণ ঘটতে পারে।
৫. গোসলের সময় কানে যাতে পানি প্রবেশ না করে সেদিকে খেয়াল রাখা ও বায়ু দূষণ থেকে দূরে থাকা।
৬. বার বার সর্দি হতে থাকলে এবং নাকের ছিদ্রপথ লালাভ রং এর হলে; শিশু মুখ দিয়ে শ্বাস নিলে এবং রাতে হাঁ করে ঘুমালে শীঘ্রই চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া।
৭. শিশুকালে নিউমোকক্কাল কনজুগেট ভ্যাক্সিন গ্রহণ করে (Pneumococcal conjugate vaccine) *Streptococcus pneumoniae* সৃষ্ট ওটিটিস মিডিয়া রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যেতে পারে।

প্রতিকার (Remedy)

১. চিকিৎসকের পরামর্শ মতো সম্পূর্ণ কোর্সের অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করা। প্রয়োজনে কানের ড্রপ এবং অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে।
২. অল্প সময়ের জন্য ব্যথানাশক কোন ওষুধ যেমন– প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে।
৩. সতর্কতার সঙ্গে ২/৩ ফোঁটা উষ্ণ মিনারেল অয়েল কানে দেয়া যেতে পারে।
৪. সহনীয় মাত্রায় গরম পানির বোতল চেপে ধরে কানে গরম সেঁক দেয়া। বেশি গরম হলে কাপড়ে বা তোয়ালে পেঁচিয়ে সেঁক দেয়া যেতে পারে।
৫. কান দিয়ে সবসময় পুঁজ পড়ার মতো অবস্থা বার বার ঘটলে নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ (ENT Specialist) চিকিৎসকের মাধ্যমে টিম্পেনোস্টোমি টিউব (Tympanostomy tube) নামে বিশেষ নলের সাহায্যে আধুনিক চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে।
৬. কানের পর্দা ছিদ্র হয়ে গেলে Myringoplasty করা যেতে পারে।

www.Educationblog24.Com

ধূমপায়ী ও অধূমপায়ী মানুষের ফুসফুসের এক্স-রের তুলনা
(Comparison Between the X-Ray Film of the Lungs of Smoker and Nonsmoker)

একটি সিগারেটের শলায় প্রায় ৪ হাজার বিভিন্ন রাসায়নিক থাকে। ধূমপানের ফলে এগুলো দেহের ভিতরে, বিশেষ করে ফুসফুসে প্রবেশ করে দেহকে অসুস্থ করতে শুরু করে। সিগারেটে যে রাসায়নিক থাকে তার মধ্যে নিকোটিন, আর্সেনিক, মিথেন, অ্যামোনিয়া, কার্বন মনোক্সাইড, হাইড্রোজেন সায়ানাইড ইত্যাদি প্রধান। একজন অধূমপায়ী যে কাজ চটজলদি করতে পারে, সে কাজ ধূমপায়ীর জন্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ প্রমাণিত হয়। নিচে ধূমপায়ী ও অধূমপায়ী মানুষের এক্স-রের তুলনামূলক আলোচনা করা হলো।

১. **এক্স-রে ফিল্ম :** ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে এটি কোথাও কোথাও সাদাটে বা সাদা, অধূমপায়ীর ক্ষেত্রে এটি কালো।

২. **ফুসফুস :** এক্স-রে দেখে চিকিৎসক ধূমপায়ী ব্যক্তির ফুসফুসে পানি জমা (pleural effusion) শনাক্ত করতে পারবেন। এ ধরনের কিছু অধুমপায়ীর এক্স-রে ফিল্মে থাকবে না।

৩. **অ্যালভিওলাই :** ধূমপায়ীদের ফুসফুসের এক্স-রে ফিল্মে অ্যালভিওলাইয়ে সুষম স্বচ্ছতা দেখা যায় না কিন্তু অধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে সুষম স্বচ্ছতা দেখা যায়। তাছাড়া ধূমপায়ীদের ফুসফুসে অধূমপায়ীর চেয়ে কম সংখ্যক অ্যালভিওলাই দেখা যায়। কারণ ধূমপানের ফলে অ্যালভিওলাই নষ্ট হয়ে যায়, কালচে বর্ণ ধারণ করে, কখনওই এগুলোর পূনর্জন্ম হয় না।

৪. **সিলিয়া :** ফুসফুসের অন্তঃপ্রাচীর জুড়ে চুলের মতো সিলিয়া (cilia) থাকে। ধূমপায়ীদের সিলিয়া অবশ হয়ে পড়ে, ফলে ধূলি ও কণা ভিতরে জমা হয়। অধূমপায়ীর ক্ষেত্রে এটি ঘটে না তাই ফুসফুস ধূলি-কণা মুক্ত থাকে। এক্স-রে তে এটিও ধরা পড়ে।

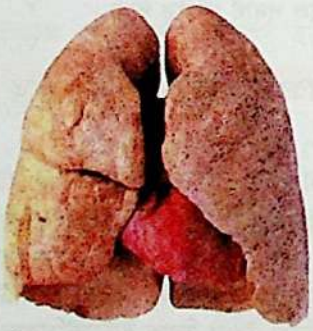
চিত্র ৫.১২ : স্বাভাবিক ফুসফুস

চিত্র ৫.১৩ : ধূমপায়ীর ফুসফুস

৫. **প্রাচীর :** এক্স-রে ফিল্মে ধূমপায়ীর ফুসফুস ও অ্যালভিওলাসের প্রাচীর পাতলা ও দুর্বল দেখায়। কিন্তু অধুমপায়ীর এদুটি অংশের প্রাচীর স্বাভাবিক পুরু এবং সবল।

৬. **এমফাইসেমা :** সিগারেটের ধোঁয়ায় অ্যালভিওলাসের প্রাচীরে যে ক্ষতি হয় তার ফলে অ্যালভিওলাস আয়তনে বেড়ে যায় এবং কোনো কোনো স্থান ফেটে ফুসফুসে ফাঁকা স্থান সৃষ্টি করে। এগুলোকে **এমফাইসেমা** (emphysema) বলে। ধূমপায়ীদের এক্স-রে ফিল্মে এমফাইসেমার চিহ্ন দেখা যায় যা অধূমপায়ীদের এক্স-রে ফিল্মে অনুপস্থিত।

৭. **ব্রঙ্কিওল :** ধূমপায়ীর এক্স-রে ফিল্মে ব্রঙ্কিওলের মিউকাস গ্রন্থিগুলোতে বর্ধিত স্ফীতি দেখা যায়। অধূমপায়ীর এক্স-রে ফিল্মে গ্রন্থিগুলোর গঠন স্বাভাবিক দেখায়।

৮. **টিউমার :** ধূমপায়ীদের ফুসফুসের এক্স-রে ফিল্মে অনেক সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিউমার উপবৃদ্ধির চিহ্ন দেখা যায় যা অধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

৯. **ক্যান্সার কোষ :** ধূমপায়ীদের ফুসফুসের এক্স-রে ফিল্মে অনেক সময় ক্যান্সার সৃষ্টিকারী কোষের চিহ্ন দেখা যায় অর্থাৎ কোথাও কোথাও সাদা ঘন জায়গা পরিলক্ষিত হয়। অধূমপায়ীদের এক্স-রে ফিল্মে সাধারণত ক্যান্সার সৃষ্টিকারী কোনো ধরনের কোষের চিহ্ন দেখা যায় না।

কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস (Artificial Respiration)

কোনো কারণে কারও শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে এমন জরুরী পরিস্থিতিতে সে ব্যক্তির মুখ বা নাক দিয়ে যান্ত্রিক বা কায়িক ছন্দময় প্রক্রিয়ায় বাতাস অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে বা বের করে দিয়ে পুনরায় শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগে সক্ষম করে তুলে ভুক্তভোগি ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে তোলাই হচ্ছে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের উদ্দেশ্য। বিপদ-আপদ বলে কয়ে আসে না, তাই কিছু প্রাথমিক চিকিৎসা সবারই জেনে রাখা ভাল। কোনো দুঃসময় বা দুর্গমস্থানে কারও শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে

www.Educationblog24.Com

হাসপাতাল, অ্যাম্বুলেন্স বা এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে খবর দিলেও আক্রান্ত ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে তোলা অসাধ্য হতে পারে। কিন্তু ঐ সময় যদি সঙ্গী-সাথি কারও কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা জানা থাকে তাহলে খুব কম সময়ের মধ্যে সে একটি অমূল্য প্রাণ রক্ষা করতে পারে। তবে এ কাজটি করতে হবে একজন প্রশিক্ষিত ব্যক্তিকে এবং কাজ শুরুর আগে কাউকে বলে রাখতে হবে ডাক্তার বা অ্যাম্বুলেন্সকে খবর দিয়ে রাখতে। এভাবে, জীবন রক্ষায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা হিসেবে মুখ থেকে মুখের সাহায্যে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের গুরুত্ব অপরিসীম।

মুখ হতে মুখের সাহায্যে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস (Mouth to Mouth Artificial Respiration)

সময়মত সাহায্য পেলে কিভাবে একটি জীবন বেঁচে যেতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মুখ হতে মুখের সাহায্যে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যবস্থা গ্রহণ। পানিতে ডুবে, কোনো কারণে অক্সিজেনের অভাব, বৈদ্যুতিক শক, বিষপান বা গ্যাস গ্রহণ প্রভৃতি নানা কারণে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে। যে কারণেই হোক শিশু বা কিশোরকে (কিংবা পূর্ণবয়স্ককে) বাঁচাতে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে দ্রুত মুখ থেকে মুখে শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার সঙ্গে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধকে গুলিয়ে ফেললে হবে না। এ কারণে প্রথমেই দেখতে হবে বুকের উঠানামা বা কফের লক্ষণ আছে কিনা। না থাকলে ধাপে ধাপে মুখ-মুখে শ্বাসপ্রশ্বাস কার্যক্রম চালু করতে হবে।

চিত্র–১

ধাপ–১ : চিৎকার করে কাউকে অ্যাম্বুলেন্স বা ডাক্তার ডাকার অনুরোধ করতে হবে।

ধাপ–২ : শিশুর জিভ সামনের দিকে টেনে দেখতে হবে মুখ-তালু-গলায় কিছু আটকে আছে কিনা, থাকলে আস্তে উপুড় করে আঙ্গুলের সাহায্যে বের করে আনতে হবে।

ধাপ–৩ : শিশুকে শক্ত খাট, টেবিল বা মাটিতে চিৎ করে এমনভাবে শুইয়ে দিতে হবে যাতে নাক সোজা ছাদের দিকে বা আকাশের দিকে থাকে। এবার যতখানি খোলা যায় মুখ হা করতে হবে। এতে শ্বাসনালির ভিতর বাতাস ঢুকে সহসা শ্বাসপ্রশ্বাস শুরু হয়ে যেতে পারে।

চিত্র–২

ধাপ–৪ : শ্বাসপ্রশ্বাসের লক্ষণ দেখা না গেলে মুখ-মুখে শ্বসনের ব্যবস্থা নিতে হবে। এ কাজের শুরুতে গভীর শ্বাস নিতে হবে। ছোট শিশু হলে তার নাক-মুখ ঢেকে নিজের মুখ চেপে ধরতে হবে (সামান্য বাতাসও যেন বেরোতে না পারে; চিত্র–১)। এরপর আস্তে আস্তে ফুঁ দিতে হবে, লক্ষ রাখতে হবে যেন রোগীর বুক সামান্য ফুলে উঠে। জোরে ফুঁ দেওয়া যাবে না, তাহলে শিশুর ফুসফুসের কোথাও ছিঁড়ে যেতে পারে।

একটু বয়স্ক শিশুর ক্ষেত্রে, একহাতে ওর নাক চেপে ধরে মুখের উপরে মুখ স্থাপন করতে হবে (চিত্র–২)। তখন সজোরে ফুঁ দিয়ে শিশুর বুক উঁচু হয় তা নিশ্চিত হতে হবে। এভাবে দুবার ফুঁ দিতে হবে। বুক যদি উঠা-নামা না করে তাহলে ধাপ-২ আবার প্রয়োগ করতে হবে।

চিত্র–৩

ধাপ–৫ : ধাপ ৪ চলাকালীন কখনওবা রোগীর হৃৎস্পন্দন থেমে যেতে পারে। এমন অবস্থায় দুবার প্রশ্বাস দেয়ার পর রোগীর নাড়ি চেপে দেখতে হবে। কনুইয়ের সামনে দু-আঙ্গুলে হালকা চাপ দিয়ে নাড়ির অবস্থা বুঝতে হবে। সামান্য বয়স্কশিশুর ক্ষেত্রে ঘাড়ে শ্বাসনালির পাশে আঙ্গুলের চাপে নাড়ির স্পন্দন একেবারেই না পাওয়া গেলে বুকের মাঝখানে উরঃফলকে চাপ দিয়ে মালিশ করতে হবে।

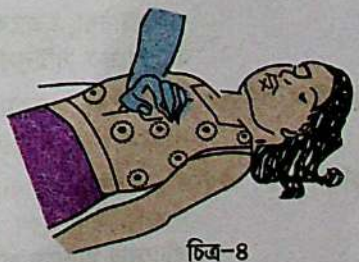
চিত্র–৪

ধাপ–৬ : ঘটনাস্থলে একাধিক ব্যক্তি থাকলে একজন বুক মালিশ করবে, আরেকজন মুখ-মুখে শ্বাস চালিয়ে যেতে হবে। কম বয়সি শিশুর ক্ষেত্রে ৩ আঙ্গুল দিয়ে নিপলের ঠিক নিচে চাপ দিয়ে মালিশ করতে হবে (চিত্র–৩)। ঘরে যদি আর

www.Educationblog24.Com

কেউ না থাকে তাহলে একবার মুখ-মুখে একবার শ্বাস দিয়ে ৫ বার মালিশ করতে হবে। আরেকটু বয়স্ক শিশুর ক্ষেত্রে বেশি চাপের প্রয়োজন হতে পারে, তখন হাতের তালুর গোড়া (palm of hand) ব্যবহার করা যেতে পারে (চিত্র–৪)। মালিশের সময় বুক প্রায় দেড় ইঞ্চি পর্যন্ত চেপে নিচে নামিয়ে দিতে হতে পারে। নাড়ির স্পন্দন না পাওয়া পর্যন্ত কিংবা মৃত্যু নিশ্চিত না জানা পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে।

বিশেষ মুখ-মুখে শ্বাস প্রশ্বাস : অনেক সময় শিশু-কিশোর-যুবক বয়সি লোক পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করে। যে কোনো কারণেই হোক ডুবন্ত ব্যক্তিকে টেনে এনে উদ্ধারকারী ব্যক্তি কূলের কাছে এসে একটু দাঁড়ানোর জায়গা পেলে সঙ্গে সঙ্গে মুখ-থেকে মুখে শ্বাসপ্রশ্বাস প্রক্রিয়া শুরু করে দিতে হবে (চিত্র–৫)।

চিত্র–৫

চিত্র ৫.১৪ : কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস প্রক্রিয়া

প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

নাসাগলবিল : নরম প্যালেটের উপরে গলবিলের অংশ বিশেষ।

কার্বামিনো যৌগ : কার্বন ডাইঅক্সাইড ও প্রোটিনের সংগে যুক্ত অ্যামিনো গ্রুপের সংযুক্তিতে যে যৌগ উৎপন্ন হয়।

প্লিউরা : যে সূক্ষ্ম পর্দা দিয়ে ফুসফুস আবৃত থাকে।

DPT : Diptheria Pertuisis Tetani।

হিমোগ্লোবিন : লোহিত কণিকায় অবস্থিত শ্বাসরঞ্জক হিসেবে কাজ করে।

মায়োগ্লোবিন : একটি পেশিনিহিত প্রোটিন বা পেশির বর্ণের জন্য যেমন দায়ী তেমনি অক্সিজেন সঞ্চয় স্থান হিসেবে প্রধানত কাজ করে।

ব্রঙ্কাইটিস : দূষিত ধূলিকণা আর্দ্র বাতাসের সাথে শ্বাসনালিতে প্রবেশ করে শব্দসহ কাশি ও ক্লেশদায়ক কষ্ট সৃষ্টি করে।

এমফাইসেমা : শ্বাসনালি সরু ও ফুসফুসে অতি স্ফীতি সৃষ্টিজনিত অস্বাভাবিকতা এবং প্রদাহ।

হাঁপানি : শ্বাসনালিতে অ্যালার্জি সৃষ্টিকারী বস্তু প্রবেশের ফলে সৃষ্ট কষ্টদায়ক শ্বাসগ্রহণ ও তারও অধিক কষ্টদায়ক শ্বাসত্যাগ।

COPD : এর পূর্ণরূপ Chronic Obstructive Pulmonary Disease। দীর্ঘস্থায়ী ধূমপায়ীদের ফুসফুসে এ রোগ সৃষ্টি হয়। এতে শ্লেষ্মা নিঃসরণকারী গ্রন্থিগুলো বড় হয়ে বেশি বেশি শ্লেষ্মা তৈরি করে এ কাশি হয়।

অ্যালভিওলাস : ফুসফুসের গঠনগত ও কার্যগত একক হল অ্যালভিওলাস। এটি ক্ষুদ্র বুদবুদ সদৃশ বায়ুকুঠুরি বিশেষ।

সারফেকটেন্ট : অ্যালভিওলাসের প্রাচীরে বিশেষ ধরনের কোষ থাকে যার প্রাচীরের ভিতরের দিকে সারফেকটেন্ট নামক ডিটারজেন্ট জাতীয় পদার্থ ক্ষরণ করে। এ পদার্থ অ্যালভিওলাসের স্ফীতি অবস্থা বজায় রেখে গ্যাস বিনিময় সহজ করে। এছাড়াও এটি অ্যালভিওলাসে আগত রোগজীবাণু ধ্বংস করে।

ক্লোরাইড শিফট বিক্রিয়া : লোহিত কণিকা থেকে যতটি HCO_3^- প্লাজমায় আসে ততটি Cl^- প্লাজমা থেকে লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে। একে ক্লোরাইড শিফট বিক্রিয়া বা **হ্যামবার্গার বিক্রিয়া** বলে। লোহিত কণিকা থেকে বাইকার্বোনেট আয়ন (HCO_3^-) প্লাজমায় প্রবেশ করার ফলে ঋণাত্মক আয়নের যে ঘাটতি হয় প্লাজমার ক্লোরাইড আয়ন (Cl^-) লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে সে ঘাটতি পূরণ করে। এর ফলে রক্তের অম্ল-ক্ষার ($pH = ৭.৪$) সমতা বজায় থাকে।

সাইনুসাইটিস : মুখমন্ডলের নাকের আশপাশে অবস্থিত চারজোড়া বায়ুপূর্ণ বিশেষ গহ্বরকে সাইনাস বলে। ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাকের সংক্রমণে বা এলার্জিজনিত কারণে সাইনাসের মিউকাস পর্দায় যে প্রদাহের সৃষ্টি হয় তাকেই সাইনুসাইটিস বলে।

ওটিটিস মিডিয়া : মধ্যকর্ণের সংক্রমণজনিত প্রদাহকে ওটিটিস মিডিয়া বলে। ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া কিংবা ছত্রাকের সংক্রমণে এ রোগ হয়।

কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস : পানিতে ডোবা, বৈদ্যুতিক আঘাত, কার্বন মনোক্সাইডের বিষক্রিয়া ইত্যাদি কারণে শ্বাসক্রিয়ার ব্যাঘাত সৃষ্টি হলে যে বিশেষ কৌশলে কৃত্রিমভাবে ফুসফুসে বাতাস সরবরাহ করে গ্যাস বিনিময় ঘটানোর মাধ্যমে শ্বসন প্রক্রিয়া চালু রাখা হয় তাকে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস বলে।

www.Educationblog24.Com

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সাইনাসের প্রদাহকে কী বলে ?
ক) ওটিটিস মিডিয়া খ) সাইনুসাইটিস
গ) এলার্জি ঘ) এমফাইসেমা

২. পেরিট্রিম আবরণ কিসের অংশ ?
ক) স্পাইরাকল খ) ট্রাকিয়া
গ) ট্রাকিওল কোষ ঘ) ট্রাকিওল

৩. বাম ফুসফুস কয়টি লোবিওলে বিভক্ত ?
ক) ২ খ) ৩ গ) ১০ ঘ) ৮

৪. অক্সিজেন পরিবহনে সহায়তাকারী রক্ত কণিকার নাম কী ?
ক) লিম্ফোসাইট খ) মনোসাইট
গ) এরিথ্রোসাইট ঘ) থ্রোম্বোসাইট

৫. নিচের কোন প্রবাহ চিত্রটি সঠিক ?
ক) ট্রাকিয়া→ব্রঙ্কাই→ব্রঙ্কিওল→অ্যালভিওলার নালি →অ্যালভিওলরা থলি→ অ্যালভিওলাই
খ) ব্রঙ্কাই→ট্রাকিয়া→ব্রঙ্কিওল→অ্যালভিওলার নালি →অ্যালভিওলার থলি→অ্যালভিওলাই
গ) ট্রাকিয়া→অ্যালভিওলির থলি→ব্রঙ্কাই অ্যালভিওলার নালি→অ্যালভিওলার থলি → অ্যালভিওলাই
ঘ) ট্রাকিয়া→অ্যালভিওলার থলি→ব্রঙ্কাই→ব্রঙ্কিওল →অ্যালভিওলার নালি→অ্যালভিওলাই

৬. নবজাতক শিশুর ফুসে কত মিলিয়ন অ্যালভিলাই থাকে ? [য.বো.১৭]
ক) ২০ খ) ৩০
গ) ৪০ ঘ) ৫০

৭. ডান ফুসফুস কয়টি লোবিওলে বিভক্ত ? [সি.বো. ১৫]
ক) ২ খ) ৩
গ) ১০ ঘ) ৮

৯. শ্বসনতন্ত্রের কোন অংশে এপিগ্লটিস অবস্থিত ? [য.বো. ১৫]
ক) শ্বাসনালি খ) স্বরযন্ত্র
গ) গলবিল ঘ) ভেস্টিবিউল

১০. উপরের চিত্রের অঙ্গটির কাজ কী ?
ক) রোগ প্রতিরোধ খ) গ্যাসীয় পদার্থের বিনিময়
গ) ভারসাম্য রক্ষা ঘ) হরমোন নিঃসরণ

১১. শ্বসনতন্ত্রের কোন অংশে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড বিনিময় হয় ? [রা.বো., দি.বো., কু.বো., চ.বো., সি.বো., য.বো., ব.বো. ১৮]
ক) ট্রাকিওল খ) ট্রাকিয়া
গ) ব্রঙ্কাস ঘ) অ্যালভিওলাস

১২. মানব ভ্রূণে কত সপ্তাহ বয়স থেকে সারফেকটেন্ট ক্ষরণ শুরু হয় ? [ঢা.বো.১৮]
ক) ২১ খ) ২২
গ) ২৩ ঘ) ২৪

১৩. অ্যালভিওলাসে কোন ধরনের গ্যাসের বিনিময় ঘটে ?
ক) O_2 এবং CO_2 খ) O_2 এবং NO_2
গ) CO_2 এবং N_2 ঘ) O_2 এবং CO

১৪. মধ্যচ্ছদা নিচের দিকে নেমে আসলে কী ঘটে ?
ক) বক্ষ গহ্বরের ব্যাস হ্রাস পায়
খ) ফুসফুসের মধ্যকার বায়ুচাপ বৃদ্ধি পায়
গ) অরীয় পেশি সংকুচিত হয়
ঘ) ফুসফুস হতে বায়ু বের হয়ে যায়

১৫. ফুসফুসের প্রদাহকে কী বলা হয় ? [চ.বো. ১৫]
ক) ওটিটিস মিডিয়া খ) সাইনুসাইটিস
গ) এলার্জি ঘ) এমফাইসেমা

১৬. ওটিটিস মিডিয়া রোগের সংক্রমণ কোথায় ঘটে ?
ক) ফুসফুসে খ) পাকস্থলিতে
গ) মধ্যকর্ণে ঘ) বৃক্কে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

১৭. রক্তে CO_2 এর পরিমাণ বেড়ে গেলে– [কু.বো.১৭]
(i) কেমোরিসেপ্টর উদ্দীপ্ত হয়
(ii) প্রশ্বাসের হার কমে যায়
(iii) দেহের এনজাইম ও প্রোটিন ধ্বংস হয়
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৮. অ্যালভিওলাস– [য.বো. ১৭]
(i) ফুসফুসের গঠন ও কার্যের একক
(ii) প্রাচীরে কোলাজেন তন্তু থাকে
(iii) জীবাণু ধ্বংস করে
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৯. প্রশ্বাস কার্যক্রমে উত্তোলিত হয় [কু.বো. ১৭]
(i) ডায়াফ্রাম
(ii) স্টার্নাম
(iii) পর্শুকার শ্যাফট
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii